কবিতা সমগ্র
৩

কবিতাসমগ্র

৩

বিষ্ণু দে

৫৭/২ডি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫

সংবাদ
৫৭/২ডি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

অক্ষর সংস্থাপন
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৪/১ই বিডন রো
কলকাতা-৭০০০০৬

সম্পাদকীয় নিবেদন

এই খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে বিষ্ণু দে-র কবিতাসমগ্র-র প্রকাশ সম্পূর্ণ হল। এই খণ্ডে ছটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়া সংযোজন অংশে এমন দুটি কবিতা যুক্ত হয়েছে, যা এ-দেশে ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর কোনও কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়নি।

পূর্বের দুটি খণ্ডের মতো এই খণ্ডেও প্রচলিত সংস্করণগুলির কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমাদের বিবেচনা অনুসারে, সংশোধন করেছি। একই নামের কবিতা দুই গ্রন্থে যুক্ত হওয়ায় শেষের গ্রন্থ-অংশ থেকে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি কবিতার পাঠান্তরও নির্দেশ করা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে যথাস্থানে তা এমনভাবে চিহ্নিত হল, পাঠক যাতে দুটি পাঠ মিলিয়ে নিতে পারেন।

বিশিষ্টার্থবাচক শব্দ ও তথ্যপঞ্জি অংশটি শ্রীশঙ্খ ঘোষ অনুগ্রহ করে সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রীশোভন বসুর পর্যবেক্ষণ ছাড়া, পূর্বের দুটি খণ্ডের মতো, এই খণ্ডটিও যাথাসাধ্য নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

যদি দেখা যায় যে, এই তিনখণ্ডের বাইরেও তাঁর দুটি-একটি কবিতা রয়ে গেছে, তা হলে সন্ধান পাওয়ামাত্র তা ভবিষ্যতে পরিশিষ্ট অংশে অন্তর্ভুক্ত হবে।

গ্র ন্থ সূ চি

কবিতাসমগ্র
৩

সূচিপত্র

নির্জলা ভূলোক

কোথায় সে ঝাঁকে ঝাঁকে হরিয়াল, কোথায় সে রাখাল ছেলেরা,
ঘাটের সে উজ্জ্বল মেয়েরা ?
কোন্ তেপান্তর বিশ্বে বাস করি, কী যে করি পান !
চারিদিকে কাঁটাঝোপ, মরেও না। শুধু বনতুলসীতে ঘেরা
দুপুরের পোড়া রৌদ্রে, ঝাপসা হাওয়ায় ম্রিয়মাণ

কী যে পান করি বালি-খরা স্রোতস্বিনীর ধারায় !
ভাষাহীন অশ্বত্থেরা, অপুষ্পক মাঠ, মেঘ চালু,
পান কি করব শুকনো খরমুজাই এ ঘর ছাড়ার
একমাত্র সুখে ? ঘন সোনালি কোথায় সেই ধান ?
এক ফোঁটা ঘাস নেই, ফুটিফাটা নদীর দু' ঢালু।

শেষটা কপালে বুঝি বনবাস বাধ্যতামূলক ?
সঙ্গী হবে 'শের' আর 'কা' আর 'বালু' ?
ভারতবর্ষের বানপ্রস্থে কবে এত দুঃখশোক ?
এত গ্লানি এত লজ্জা এও সয়ে যাবে বুঝি বৃদ্ধ দেশি প্রাণ ?
পলাতক ! অনর্থক খুঁজি ফিরি জল। জল ?
নরকে যে আমাদের নির্জলা ভূলোক ॥

১৯৪৭

নিসর্গের গান

এক সমালোচনাগ্রন্থ পড়ে

প্রকাশ্যে প্রচ্ছন্নে শুনি একটি আরতি গান : সকলেই বাঁচো, ভালো বাঁচো।
মহান্ নিসর্গ গায় একই গান সূর্যে চন্দ্রে আঁধারে তারায়
বনে উপবনে আর আকাশে পাহাড়ে শোনো একই গান,
তার অষ্টপ্রহরের রাগমালা মাঠে খেতে চলে ক্লান্তিহীন।
মর্মে মর্মে প্রকৃতিই দেবতা যে, আর মানুষই প্রকৃতি তাই।
আশে পাশে গ্রাম ও শহর, শহর ও গ্রাম পাড়ায় পাড়ায়
যার মাঝে মাঠ, পথ, চষা খেত, গোচারণ আর রাত্রিদিন
নিশ্বাসে নিশ্বাসে পাই স্বচ্ছ সুস্থ অন্তরঙ্গ হাওয়া,
আর নদী। গান কাব্য ছবি। মহিমায় প্রাবল্যের স্থপতি বিস্তারে
পৃথিবীর মাতা যেন, কিংবা আদি-দেবীই, পার্বতী
প্রাণের শিরায় পুণ্য সর্বজীবনের শিবতরায় চ

পরাক্রান্ত শব্দময় মুক্তবেণী জপ করে নাম
জীবনের, আনন্দের ; মানবিক দুঃখে সুখে অতিক্রান্ত করে ক্ষয়ক্ষতি,
দীপান্বিত ঘরে ঘরে রন্ধন জোগায়, পথে জলসত্র ছায়া।
সেই নদী গ্রন্থে বন্দি। মিথ্যা হল প্রাণের পুরাণ,
চৈতন্যের মহাকাব্য, মানব মনের দীর্ঘ জীবন গঠন।
বাঁধ সেতু কেল্লা গড়ে অন্ধ এ কে পাণ্ডিত্যের প্রলুব্ধ নির্দেশে ?
বিশ্বের ভূগোল ভুলে, জলের আবেগশাস্ত্র ভুলে
মরুভূমি ডেকে আনে সেতুতে মড়কে দেশে দেশে
সিমেন্টে কংক্রিটে স্তম্ভে অজ্ঞ মূর্খ লোহায় লক্কড়ে
ধ্বংস করে সৃষ্টিময় প্রকৃতির নীতি আর বিজ্ঞানের পঠনপাঠন।

এই কথা মনে হল পণ্ডিতম্মন্যের দুই-মনি বই পড়ে,
কারণ কবিতা নদী অথবা সমুদ্র, বলা যায়
আকাশপৃথিবী আর কবির মনন নদনদী।
সে গতি কে রুদ্ধ করে কালির আঁচড়ে ?

৮ নভেম্বর, ১৯৫৫

আজকে জানি আনাড়ি যৌবন

জরার পাক যতই মাথা জড়ায়,
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু টানে
আকাশজোড়া আবেগ মায়া ছড়ায়,
পৃথিবীব্যেপে প্রাণের রঙ কুড়ায়
অস্তিমের অশেষ অনুমানে।

বৃথাই এই দেখাও সন্ত্রাস,
মরজীবনে কোথায় অবসাদ ?
গণি না তাই পরলোকের প্রমাদ,
ভবিষ্যৎ সাধে না তাই বাদ,
আমরণ এ জীবনে মেটে আশ।

আজকে জানি আনাড়ি যৌবন
নিতান্তই বাচাল চঞ্চল,
বৃথা দোলায় হাওয়া না অঞ্চল।

স্মৃতি পাহাড় না হলে বোঝে মন
সাগরে নামে কিসের লাল জল ?
১৩ ফেব্রুআরি, ১৯৫৮

রূপনারায়ণপুর

এডোআর্ড টমাসের সম্মানে

হ্যাঁ, মনে রয়েছে রূপনারায়ণপুর,
নামটাই, কারণ গরম এক দুপুরবেলায়
এক্‌স্‌প্রেস্‌ ট্রেন থেমে গেল সেইখানে
আচম্বিতে। তখন বৈশাখ শেষপ্রায়।

বাষ্প ফুঁসে ওঠে। কেউ গলা খাঁকরায়।
কোনো যাত্রী নামে না বা ওঠে না বিরল
জনহীন প্ল্যাটফর্মে। দেখলুম শুধু
রূপনারায়ণপুর—নামটা কেবল।

এবং গুলঞ্চ লালকরবী আর ঘাস
ঘেঁটুফুল আর শুকনো খড়ের ডম্বর,
আকাশের উঁচু উঁচু মেঘেরই মতন
নিস্তব্ধ নিশ্চল আর নিঃসঙ্গ সুন্দর।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই এক শ্যামা
গান করে ওঠে নিকটেই এবং দোহার
গেয়ে ওঠে যত পাখি লীয়মান সুরে
বর্ধমান আর সাঁওতাল পরগনার ॥
১৯৫৮

স্টেশনের দৃশ্য

লামুর জন্য

দৃশ্যটা দুর্লভ নয়, ধরো গেছি আমরাও, হাওড়া স্টেশনে।
বম্বে কিংবা দিল্লি মেলে, ওরই মধ্যে, কিছু ধুমধাম,
কুলপিকামরা আর খানার ব্যবস্থা অন্তত কিছুটা ছিমছাম।

গণ্যমান্য লোক যান রাজধানী গরিব চাকুরে যায় নিজ কর্মস্থানে
—দৃশ্যটা দুর্লভ নয়, রাজন্য বা ধনপতি অথবা কেরানি
ছুটির মেয়াদ অন্তে চলেছে দপ্তরে কেউ লোকসভা কেউবা কংগ্রেসে,
সুস্থ বা অসুস্থ দেহে কিংবা-বা-এবং মনে, সর্বভারতীয় নানাবেশে
কেউ হিমে কেউ ঘামে নানান শ্রেণীতে, সকলেই জানি
একই ট্রেনে সকলেই দিল্লি চলে, বহুভাষী হিন্দির সাগরে
সবাই বিচ্ছিন্ন স্বীয় দ্বীপে দ্বীপে, ভিন্ন আর দূর।
দৃশ্যটা করুণ লাগে, হয়তো বা বাঙালি ছাপোষা, ছেলেমেয়ে হাত ধরে,
বিচ্ছেদব্যথায় ভাবে প্রবাসীর স্বাস্থ্যের উদ্বেগে, ভাবে ঘরে
স্বস্তি ভালো, ঘনিষ্ঠের নিশ্চিতিতে ভাবে বেকসুর
কী হবে এ উন্নয়নে, তাই চোখমুখ লাল, ভাবে এ কী গেরো !
বাতের ব্যথায় থাকে পাদানি-তে প্ল্যাটফর্মে দরজাটা ঘিরে
অনেকেরই ছেলেমেয়ে, গণ্যমান্য বা সামান্য লোকেরও,
যারাই দিল্লির যাত্রী নানান্ শ্রেণীতে নানা আদর্শে, ফিকিরে—
করুণ বিদায়, তবু দৃশ্যটা দুর্লভ নয়, প্রায় নিত্য দেশের বিদায়
—গরিবের চাকুরের নির্বিত্তের নেতাদের দেশ প্রায় রেলপাতা প্রতীক যেখানে,
গৃহ্ আর গন্তব্যের লক্ষ্য আর উপলক্ষে বিচ্ছিন্ন ব্যথায়।

তাই কি দেশের ছেলেমেয়ে থাকে উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে এই ফিন্‌ল্যান্ড স্টেশনে ॥
৭ অগাস্ট, ১৯৫৯

জাতীয় সংরক্ষণ

শ্রীমান ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর জন্য

মনে পড়ে সর্বদাই অন্ধকারে নির্ভীক প্রাণের
অগ্নিময় চোখগুলি, হরিণের, চিতার, বাঘের।

শিকারের শখ নেই, শুধু শিকারি বন্ধুর সঙ্গ
আর মোটরের কল্যাণে ছুটিটা এদিকে ওদিকে
মাঝে মাঝে কাটে বেশ। একাধিক জাতীয় জঙ্গলে
বহু কষ্টে জিয়ানো কত না হৃষ্টপুষ্ট পশুপাখি
ক'বার দেখেছি, আর বন্য বাংলোয় ভোজ
উপভোগ করা গেছে প্রাকৃতিক সকালে সন্ধ্যায়।

আশ্চর্য ভারতবর্ষ ! বহুকাল বিস্তৃত দুর্ভোগে
এখনও কত না জন্তু বেঁচে আছে ! সরকারি উদ্যমে
বাঁচানোও চলছে বেশ, এই কাজিরঙ্গা এই লাতেহার
হাজারিবাগের জঙ্গলে জঙ্গলে বেঁচে আছে কত—
আহা বাঁচুক বাছারা ! মুক্ত জন্তু দেখতেও ভালো ।
আরেক ছুটিতে বন্ধু নিয়ে গেল গির্‌নারের রক্ষিত কাননে ।
সে বড় রোমাঞ্চ, স্পষ্ট দেখি দেশি স্বাধীন সিংহকে ।
শুনলুম মন্দ্রিত ডাক । সে সময়ে পথসঙ্গী এক
কর্মচারী, মনে আছে, সদালাপী বিনীত মানুষ,
বললেন একটু হেসে, সরকারি সংকল্পে ভারতের
জাতীয় জন্তুরা মন্দ নেই, অবশ্য ত্রুটিও ঢের ।
বললেন গম্ভীর মুখে, জাতীয় এ রক্ষণাবেক্ষণে
মানুষকে রাখলে কি মন্দ, গোটা দেশের মানুষ ?
শহরে জঙ্গলে বনে গ্রামে গ্রামে দগ্ধ শুষ্ক দেশে ?

হঠাৎ গম্ভীর মুখে কথা কিনা, তাই মনে আছে ॥
১১ জুন, ১৯৬১

কর্তার ভূত

কেন এ ভূতের ভয় ? কর্তার ভূত-কে
বলো না সাবেক সুরে : ভূত মোর পুত্‌ ।
কী হবে হরদম এই রামনাম ব'লে ?
যদিই কর্তা আজও লাফ দেন পুঁটকে
অথবা ফচ্‌কে ঘাড়ে, বলো তো তাহলে
সমুদ্রপারের কোন্‌ সাহেব অদ্ভুত
আংরেজি মন্তরে আজ নামাবে ভূতকে ?

সে কবে মিশেছে তার শ্মশানের ছাই
সারাটা দেশের সারা বিশ্বের মাটিতে ।
ফুঁ দিলেই উড়ে যায়, এত ঘটা করে
কাকে যে তাড়াও তুমি তাড়িয়াল ভাই রে
হাওয়াকে তড়পে তুমি যন্তরমন্তরে
ভাবো কি গলিয়ে নেবে গলির ভাঁটিতে ?
রাম বা লক্ষ্মণ কবে খুঁটে খায় ছাই ?

ছাড়ো এ ভূতের খেলা, ঘাটে বা কবরে
কর্তার টিকিও নেই, গোরস্তান তুলে
ভূতকে পাবে না, ভূত ছেড়ে বলো কানে :
রামনাম সৎ হায়, সততার জোরে
দেখবে ভূতের ভয় সোজা যাবে ভুলে
কারণ ভূতের মাথা তোমারই গর্দানে।
ভূত কি থাকে রে বোকা, শ্মশানে কবরে ?

ক্ষেমাঘেন্না ছেড়ে দিয়ে বলো সোজাসুজি :
চাও সুখ চাও স্বস্তি সচ্ছল আরাম।
তবেই দেখবে কর্তা নিজেই কবরে
পাশ ফিরে নিরুদ্দেশ, এবং যা বুঝি,
দুনিয়ার সব লোক তোমার জবরে
নিশ্চয় ফেলবে হাঁফ—আরে রাম রাম !
আমরাও ওরে দাদা সুখ স্বস্তি খুঁজি।
৭ ডিসেম্বর, ১৯৬১

দেখেছি জলের রাগ

দেখেছি জলের রাগ, বেগের আগুন মাটিলেপা!
মাথা কোটে, পাথরে বালিতে তোড়ে সে যে কী না করে !
ঘোঁট করে, ফোঁসে, ফোলে, নিজের ধর্মেই ভোলে খ্যাপা,
কাদা ছাইভস্ম মাখে, নুড়ি ভাঙে ফুৎকারে শীকরে।

জলের অদ্ভুত রাগ, গদা হানে লৌহ ভীমসেন
আর হিড়িম্বানন্দন যেন ভাঙে অন্ধকার বনে
উরু বা গর্দান ! কিংবা যেন মল্ল কেউ একাই খোঁজেন
ছায়ায় আপন শত্রু, যত ছায়া সরে তত মনে
রাগ গর্জে, দুস্থ চৈতন্যের রাগ, যেমন বারুণী হাঁকে
হিরোশিমা সাহারায়—কিংবা আরো মোটা মেগাটনে
আর কোথাও জুজুমানা বোমা ছোঁড়ে।
কোয়েলের খরস্রোতে ক্ষিপ্র বাঁকে
ঘূর্ণির উলঙ্গ শক্তি, আপন শক্তির ঘোলা লোভে
দেখেছি নদীর প্রাণ স্রোতের প্রতীকই বুঝি ডোবে॥
ডিসেম্বর, ১৯৬১

অন্য অঙ্ক

আমার অঙ্কই অন্য, দুয়ে একে তিন
এই ন্যায়তত্ত্ব সত্য ছিল কি একদা ?
এখন সকলে দেখ সমভুজ তেরঙে রঙিন
অথচ ত্রিকোণ নেই ! নির্বিশেষ তাই তো বরদা।

একমাত্র সত্য মানি স্থানকালে ইতর-বিশেষ,
আগে কিংবা পরে, আর এখানে বা হয়তো ওখানে
অতএব, নিরপেক্ষ নয় কেন প্রেমের উদ্দেশ ?
চতুর্মুখে মিশিয়েছি, প্রিয়া ! ভূত-ভাবী-বর্তমানে।
ফেব্রুআরি, ১৯৬২

অন্যদের আছে বারোমাস

জল-কন্যা নয়, তবু অনন্ত অগাধ
অতলান্ত সমুদ্রেই আমি করি বাস।
বর্ষা শুধু বর্ষে বর্ষে আমারই সম্বল,
অন্যদের আছে বারোমাস।

না, তা নয়, দায়ী নয় কোনো অপরাধ,
আমার বা আর কারো দোষ।
তাকে জানি—এই সত্য একান্ত সরল।
আশ্চর্য যা, তা হল যে নেই আফশোস।
৮ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

এরা সব বিশ্বের পাণ্ডব

কোনো যুক্তি নেই। তবে যুক্তিতে কে বাঁচে
যুক্তির সেই তো মহাত্রুটি।
সেকেলে ভাগ্যের মতো যুক্তিরও ভ্রূকুটি।
যুক্তির প্রসাদ কেবা পুথি ঘেঁটে যাচে !

হয়তো বা যুক্তি নেই, শক্তি খুবই কাঁচা,
ইওরোপীয় নয় সত্য, হয়তো জান্তব—

তবু বাঁচে ! বস্তিতে বা ফুটপাথেই অজ্ঞাত কী বাঁচা
এক হিসাবে মনে হয় এরা সব বিশ্বের পাণ্ডব ॥
৮ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

সান্ত্বনা

প্রাণের ভয়ে তুমিই দিলে চাঁদা,
এখন চাও বৃথাই সান্ত্বনা ।
পাড়ায় শত পুজোয় কান বাঁধা,
শস্তাগানে মাইকে যন্ত্রণা !

বৃথা প্রয়াস, ভাবছ যদুপতি
মনসা যাবে বৃন্দাবনে চলে,
নদীর স্রোতে কোমল ছায়াতলে
বাঁশরি শুনে ভুলবে দুর্গতি ।

কোথায় নদী পল্লবিত ছায়া
পাহাড় কোথা ? বধির সেই রাধা ।
এখন শুধু সিনেমাগান সাধা,
স্নায়ুর মরা নাকি সুরের মায়া ।

প্রাণের ভয়ে হয়েছে চাঁদা দিতে ?
প্রায়শ্চিত্তে অসাড় কল্পনা ।
ভারতে আজ এ শক্থেরাপিতে
দেশের জ্ঞান পাওয়াই সান্ত্বনা ॥
১১ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

পোলিং স্টেশনে

লোকটি অদ্ভুত বটে, (কী জানি ! হয়তো অদ্ভুত অন্যেরা ?)
প্রত্যহ সে চিঠি লেখে, দূরের প্রেয়সী নাকি স্ত্রীকে, গ্রামে,
মাঝে মাঝে উত্তরও সে পায় বৈকি, কখনো দেরিতে কখনো বা পরপর,
চিঠি লেখে যত্ন করে, ধৈর্য ধরে, খামে ।

আজ প্রায় সকালেই তার দেখা, নির্বাচনী অর্থাৎ পোলিং স্টেশনে,
লাজুক মেঘলা ব্যক্তি, বলি : কী ব্যাপার, তুমি যে এখানে ?
এই গণ্ডগোলে আজ পণ্ড করে দিলে তো তোমার রববারের ধ্যান ?
প্রায় মুখে না তাকিয়ে গানের গলায় বললে : তার মানে ?

পাঁচটি বছর বাদে একদিন ভোট দিই এইখানে এসে,
আর প্রত্যহ পালন করি নির্বাচন দিন সেই নামে।
তুমিও তো তাই, নয় ?—গলাটা নিচুই, কাছ ঘেঁষে
বলেই হঠাৎ দুই চোখ মেলে চায়, রৌদ্র জ্বালে বৃষ্টি হাওয়া ধোওয়া
শ্বেত পাথরের থামে

চুপ করে থাকি, জানি পটলডাঙায় তার মেসে মাঝে মাঝে
চিঠি আসে, আর সেও প্রতিদিন চিঠি লেখে, যত্ন করে, খামে।
২৫ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

আমরা

দৈনিকে বা সাপ্তাহিকে কোথা উৎকর্ষের গরিমা ?
আমি চাই তুমি দাও রচনাবলির সমগ্রতা
নিরবধি গর্বে বাঁধো বিপুল পৃথ্বীর শেষ সীমা,
আপাত চটকে তুচ্ছ চাটুকারে কেন ভোল দৃপ্ত মহার্ঘতা ?

পয়ার যমকে নয়, তুমি বাঁধো শতাব্দীর পঞ্চাঙ্ক নাট্যের
দীর্ঘলয়ে দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ বন্ধুর ছন্দের দুর্গে সহিষ্ণু জীবন।
সেই তো প্রেমের শত্রু মৃত্যুর বা সংসারী শাঠ্যের
উপযুক্ত প্রত্যুত্তর, আমরা তো নই সাধারণ ॥
২৩ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

দুই কর্মীর এক দাদার জন্য তর্ক

অনেক বছর পরে কয়েক সপ্তাহ কাটে গ্রামে গ্রামান্তরে,
ছুটি নয়, প্রচারে সফরে নির্বাচনে।
ভালো লাগে রৌদ্রময় বিস্তীর্ণ আকাশ, নানা পাখিদের ডাক,
থেকে থেকে যাই-যাই পশ্চিমের হাওয়া।

শিমুলের গায়ে আজও রক্ত নেই।
আর রোগা আমড়া ফ্যাকাশে আর সজনের ফুল

সবে ফুটবে ভাবছে আর উত্তরের ডাঙার পলাশে
এখন ধূমল রোগ।

অবশ্য দক্ষিণের পঞ্চাশটা কলমের আমে বউল ধরেছে।
শুধু বর্ণাঢ্যবিলাসে বুগেনভিলিয়াগুলি চার রঙে হেসে ওঠে,
আমাদের আস্তানায় বাগানবাড়িতে থামে থামে
গোলাপের জের এখনও রয়েছে কিছু।
তবে এরই মধ্যে টিলার তলায় সর্বহারা জ্যামিতিতে
পত্রহীন গোলোকচাঁপার গান ওঠে অপরাজিতের।
আর ঝোপে ঝাড়ে তারই পিছু পিছু
হাওয়ার হিল্লোলে দোলে রক্ত শ্বেত করবী আবার
গ্রাম্য বন্য পর্যাপ্তিতে।

বহু ব্যাপ্ত দাদার এলাকা।
জিপে আর পায়দলে এ গ্রামে সে গ্রামে
বক্তৃতায় আর বাড়ি বাড়ি আলাপে-সালাপে ক্লান্ত যে সে কথা মানি।
তাছাড়া মনটাও ভার, জানি মাঠে খেতে আর
—অবশ্য এখন মাঠে ধান নেই, রবিশস্য
এ অঞ্চলে ফলেনি বিশেষ—
গোরু মোষ বলদের ছাগলের পাল ছেড়ে দিলে একালে চলে না।
তাই জিপে পায়দলে ঘুরে ঘুরে বলি
প্রতিপক্ষ যে কথা বলে না।

তুমি বল ব্যাপারটা এলে-বেলে, হয়তো বা তাই,
আমিও তা ভাবি ক্লান্ত যখন ঘুমোতে ক্যাম্পে ফিরি,
এত বড় দেশে যে সাইকেলে হেসে খেলে
ধান কাটা ধান তোলা খালি হাতে সম্ভব না, খালি শীষ চেলে,
দাদাও তা বোঝে না কি ?
তাই গদি ফেলে কাস্তের প্রশংসা করে আলে উঠে,
কারণ সম্প্রতি স্বতন্ত্র নামটাও আর অসম্ভব।

বেশ হাসো, তবে ব্যাপারটা অত সোজা নয়,
শুধু কার্যসিদ্ধি নয়, অবশ্য দাদার আছে স্বাভাবিক দ্বিধা, ভয়,
তাছাড়া তো কাস্তের গৌরব এখনও বিস্তৃতভাবে
এবং গভীরভাবে তোমরাও বোঝ না, বা বুঝলেও
শ্রমসাধ্য একঘেয়ে মেটে মাঠো ধৈর্য ধরে

প্রমাণ করনি সর্বত্র সমানভাবে সকলের মনে।
তাই তুমি আমি ঘুরি গ্রামে গ্রামে আবাদে জঙ্গলে
জিপে পায়দলে দাদার পয়সায় সাইকেলের পিঠে বসে।

গ্রামে বনে বসন্তের প্রভাব হৃদয়ে স্নায়ুতে গোপনে
কাজ করে চলে, লক্ষ করেছ কি তুমি ?
বসন্তবাউরির গানে তোমার কেন্দ্রীয়-মার্কা-মন
অন্তত একটা সপ্তাহ যদি গলে, গেয়ো কাফি দেশজ ইমনে,
তাহলে খুশিই হব অনুগত পরিশ্রমী সংযুক্ত সদ্ভাবে।
এখন কোথায় যাবে, চা-টা খাও। খেয়ে তবে যেয়ো॥
২৬ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

মাঝরাতে বাপ ফেরে

মাঝরাতে বাপ ফেরে। কলকাতার রাস্তায় যখন
ক্লান্ত ফাঁকা হাহাকার হঠাৎ হঠাৎ মোটরের চকিত চিৎকারে
দম পায়, তখন বাপটি ফেরে, না শ্মশান না, অন্য আড্ডা থেকে,
তখন সে বিছানায় জানলার দিক থেকে ফেরে, যেন নিজেকে গোপন
করে দেয়ালের রঙে, চুপচাপ চোখ মেলে কিংবা চোখ ঢেকে
অস্পষ্ট আবেগে ভাবে, ভাবে কী যে ভাববে এবারে।

মা তখন ঘুমে কিংবা ঘুমের ওষুধে অসাড় বালিসে
ওই ঘরে কী যে ভাবে, আপন শিশুর মনে ভাবে তা ছেলেটি,
মা যে কেন অবিশ্রাম কাজে যায়, কোথা যায়, সে কোন্ আপিসে
ঘুরে ঘুরে নিজেকে যে কালি করে, সে যখন দুপুরে বাড়িতে
শুয়ে থাকে কথামতো, পাশে মা আসে না, না, মা খুব ভালবাসে, ইলিশের পেটি
নিজে বেছে তাকে দেয়, নিজে গাদা কাঁটা খায়, বলে জিভ চাপিস মাড়িতে
দেখবি ইঁদুর দাঁত ফেরত দেবে না। মা-ই বলে, উত্তরাধিকারী
সেই নাকি, বাবাও চেঁচায়। কলকাতার রাস্তায় যখন অনেক ভিখারি
ঘুমোয় অনেক লোক, মড়া যায় শ্মশানের দিকে হঠাৎ চিৎকারে
তখন যে চুপচাপ, ভাবে কাল ভোরে আর ইস্কুলে যাবেই না সে,
মা তাকে ভালোই বাসে, বাবাও হয়তো তাদের ভালোই বাসে,
সে আর বোন নাকি মা বাবাকে বন্দি রাখে, সেই উত্তরাধিকারে
উত্তর দেবেই না আন্টি-দিদিমণিদের, বরং সে আর তার বোন

চলে যাবে, শ্মশানে না, বহুদূরে, লেনার জঙ্গলে, দুজনেই ভল্লুক শিকারি।
কিংবা মোড়ে, ভোটের মিটিঙে, দুজনের দুহাতেই ছবি-আঁকা ফ্ল্যাগ ভারি ভারি॥
৭ মার্চ, ১৯৬২

হে দিনের সূর্য

হে দিনের সূর্য! ছিলে প্রতিদিন এক অদ্বিতীয়,
তোমার নয়ন তাই অন্ধকারে নিত্য
অগণন চোখ দিয়ে প্রতিরাত্রে নভোনীল চিত্ত
জ্বেলে দিত, হে সূর্য, হে নির্বিত্তের প্রিয়।

আজ খুঁজি তোমার সে অযুত নক্ষত্র-জ্বালা রাত্রি,
অমাবস্যা আজ কেন মাত্র অন্ধকার?

তুমি কি একান্ত শূন্য বিবিক্তির মহাকাশে যাত্রী?
নাকি, সে আরেক বিশ্বে অন্য কোনও পূর্ণিমাকে পেয়েছে আবার?
৫ এপ্রিল, ১৯৬২

হে পৃথু সুন্দর

কথা শোনো, হাত ধরি, কথা রাখো কুটুম্ববন্ধুর,
তোমার কী ভয়? প্রতিদ্বন্দ্বীহীন তুমি বসুন্ধর।

গরজ দুস্থেরই জানি, তুমি সচ্ছল আকাশ,
তোমার আয়নবাষ্পে আণবিক দানবহুঙ্কার
হয়তো বা পৌঁছায় না; আমাদেরই পৃথিবীতে বাস!

সে পৃথিবী মাতা, বধূ, কন্যা, আহা সেবিকা মানবী,
মুখ চেয়ে আছে সে যে নিত্যকর্মে আনন্দভৈরবী!

তাকে তুমি আর কেন বঞ্চিত করেই চল, তবে
কেন মাল্যদান করেছিলে, কোন্ স্বপ্নের গৌরবে
কার সে বিজয়শঙ্খ, নহবৎ, অত ধুম কার,

গোধূলিতে এনেছিলে বলো কার ললাটে সিন্দূর ?

শুধু কি পশ্চিমা মন্ত্র, তুমি বীর, হে পৃথু সুন্দর !
৩ মে, ১৯৬২

তাহলে ধৈর্য ধরো

কবিবন্ধুর ভাষাতেই বলি, হে নিঃস্ব !
ভাঙা ডিমে আর তা দিয়ে বলো কী হবে ?
সে যদি চলেই যায় অন্যোৎসবে,
তুমি ছেড়ে যাবে আজন্ম-চেনা বিশ্ব ?
বন্য তো নও, কাকে দেবে প্রতিশোধ ?
সে যদি তোমায় ছেড়ে যায় কারো সঙ্গে
আজগুবি কোনো ক্লাবে বা কাফে-র রঙ্গে,
তাহলে সন্ধ্যা শ্মশান কি, নির্বোধ ?

শোনো, যদি হাতে থাকে বেশ কিছু আয়ু
তাহলে ধৈর্য ধরো হে দেশজ তরুণ,
নিজের গলায় ক্ষুর দিয়ো না বা নরুন !
বিষাদের রাশ টেনে রাখো উদ্বায়ু,
মনে মনে ভেবো হয়তো তোমার জীবনে
সব লাল হবে, তখনও কি বাবু-সাহেবের
জিত হবে, সোনা আর সুন্দরী গায়েবের
কারবারি দিনদুপুরে, সান্ধ্য স্ত্রীধনে ?

ওরা যে বেচারা, আবাল্য ছিল পরাধীন।
শিশুর মুক্তি, আবিষ্কর্তা কৈশোর
ওদের অজানা, উদ্দাম যৌবনঘোর
ওদের উধাও করেছে কি বলো কোনো দিন ?
ওরা কর্তার ভুতুড়ে কণ্ঠে বেসুরে
পুতুল নেচেছে দেশি ও বিলেতি কলে,
আজ যদি ওরা দুচার পেগের ছলে
খায় বা খাওয়ায়, বেড়ায় মোটরে ঘুরে—

আহা, ক্ষমা দাও হে তরুণ। করো ক্ষমা।
উন্নয়নের প্রথম আনাড়ি চাপে

সভ্যতা জেনো স্বতই দ্বিধায় কাঁপে।
কেটে যাবে এই নূতন নেশার অমা,
রাত্রি সহজ হবে দিন হবে স্বাধীন।
অবশ্য তুমি তখন হয়তো স্বর্গে,
তোমার দয়িতা যেতেও পারেন মর্গে।
মননে মরেছে সকল অবচীন॥
১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

তখন চৈতন্যে চাই

বন্ধু ছিল প্রতিবেশী, প্রাচ্য শান্তি মৈত্রীর একতা
ভাঙেনি, যদিও এক বায়ুভুক হিম বিতণ্ডায়
থেকে থেকে পেশি বেঁধে হেঁকেছে সে, প্রাচীন সভ্যতা
প্রাচ্যে-তাই নতশির, অবাচীন গণ্ডায় গণ্ডায়
ঘাড় তুলে তাই বুঝি সর্বত্রই আহ্লাদে উন্মাদ!
বস্তুত এ আশাভঙ্গ অপমান, বন্ধুর বঞ্চনা
মৃত্যুর ক্ষতির চেয়ে মর্মান্তিক, কেননা জল্লাদ
গুপ্ত অপহন্তা নয়, তার হাতে প্রকাশ্য যন্ত্রণা।

অবশ্য নূতন নয়, দেখেছি তো মণ্ডূকেরও কূপে
ছদ্মবেশী আসে, জল তোলে, দূরদেশে নিয়ে যায়;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে,
যায় ছিন্নভিন্ন করে। তবু কোন রুগণ তিক্ততায়
এবারে যন্ত্রণা পাওয়া! অন্ধকার মনের আকাশ,
সত্যাসত্য একাকার। শুধু লজ্জা, ক্ষোভ আর গ্লানি
সমস্ত পৌরুষ ঢাকে, ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধির আশ্বাস
পুড়ে খাক্ উদ্‌ভ্রান্তিতে, মোড়লে মোড়লে কানাকানি!

তবু যবে লুব্ধ তত্ত্ব মদমত্ত হুঙ্কারে ফিসফাসে
লালকালো অস্ত্র হানে, দগ্ধ করে প্রতিপরিবেশ,
তখন চৈতন্যে চাই নির্বিকার নিষ্কম্প নিশ্বাসে
প্রস্তুতিতে প্রতিশ্রুত দুস্থ কিন্তু স্থিতধী স্বদেশ॥
৬ ডিসেম্বর, ১৯৬২

সয় দেরি

সেও কি ভেবেছিল সয় না এত দেরি ?
তাই কি রুক্ষ সে শিমুলে পলাশে
খুঁজেছে আশ্বাস প্রাণের তরাসে
চৈতি কাফিতেই ভৈরবের ভেরি ?

ভেঙেছে ঘর, তাই চড়কে গাজনে
শূন্য খামারেই দেখেছে আশ্বিন,
ভেবেছে হাওয়াতেই বাঁধবে প্রতিদিন
ঘরামি ছাদ তার আষাঢ়ে শ্রাবণে ?

হায়রে প্রিয়তম ! তোমার হাতে হাত,
দিঘির বালুঘাটে তোমার কাছাকাছি
এখনও বলি, শোনো, কেন যে বেঁচে আছি।
তুমিই কোথা দূর কী দিন কী-বা রাত।

প্রাণ কি পথে পথে কখনো করে ফেরি ?
আমার সয় দেরি, সইবে বহু দেরি ॥
১৬ ফেব্রুআরি, ১৯৬৩

বহু সূর্য অস্তগত

বহু সূর্য অস্তগত, সে জন্যই, বা তবুও, হৃদয়ে
আরক্ত জীবনস্মৃতি, যৌবনের গোলাপবাগান
আজও তাই ঘরে ঘরে শাদা কালো খোদাই আধারে
পাণ্ডুর সৌরভে ধরি, সময়ের অর্জিত সম্ভারে
চৈতন্য সচ্ছল মুক্ত, রাবীন্দ্রিক সংগীতবিতান
যেমন বিজয়ী কীর্তি অশীতির ব্যর্থ পরাজয়ে।

বস্তুত বৃদ্ধই শিশু, আলো মুক্তি পায় যে আকাশে
সূর্যাস্তে সে প্রাজ্ঞ কিংবা সূর্যোদয়ে সদ্য স্বচ্ছ শুচি,
তারই আভা গন্ধরাজে, বেলি চামেলিতে কিংবা ঘাসে
মিলনে বিরহে প্রেমে দেহে মনে সেই বররুচি।

অতএব হাহাকার অবান্তর ; আশাভঙ্গ-আশা
সমস্তই পেয়ে যায় নবারুণ আলোর রঞ্জনা
সপ্তাশ্বের সমমূল্যে, এমন-কি রাত্রির ব্যঞ্জনা,
অরুন্ধতী ! জেনো দীর্ঘ রশ্মিময় একই ভালোবাসা ॥

আদি-অন্তে

কারণ যতই তাপ, অবচীন চঞ্চল যৌবন
কমে যায়, তত বাড়ে হৃদয়ের শৃঙ্খলা সংহতি ;
বয়স তো ক্ষতি নয়, বয়সেই স্নায়ুর সংহতি,
মনের বিশুদ্ধি ক্রিয়া, বলা যায় বিষঙ্গীকরণ ।

চড়াই না, সারসেই খুঁজে নিও ভোগীর উপমা
কিংবা আরো ভালো তুল্য দীর্ঘ-আয়ু ফিনিশীয় শ্যেনে
আরব্য মরুভূ যার অগ্নিবর্ণে জন্ম-মৃত্যু মেনে
জরায় জাতক বাঁধে, সহাবস্থ সূর্য-পরিক্রমা !

কারণ যতই স্নায়ু যতই না শরীর ও মন
প্রত্যক্ষের কালক্ষয়ে স্বচ্ছ, শুদ্ধ, সত্যবান হয়,
ততই চৈতন্যে অর্ধনারীশ্বর বিষয়ী-বিষয়,
ততই সাবিত্রীসত্তা করে যায় সন্ধ্যার আরতি,
হিরণ্ময় সূর্যঘটে আঁধারে সে চির আয়ুষ্মতী,
আদি-অন্তে ভোগ দেয় ছায়াতপে ভাস্বর যৌবন ॥
৯ মার্চ, ১৯৬৩

এই বুঝি পলায়ন ?

এই বুঝি পলায়ন ?
যদি নিওন-আলোর ভিড়
ছেড়ে যাও কোনো অমাবস্যার আকাশে,
হাত তোল হাত বাঁধ চোখে চোখে চেয়ে থাক
নিষ্কম্প নিবিড় নীলে তারায় তারায়,
নক্ষত্রসমাজে নিজেকে মেলাও চারপাশে,
সংবিতের ছন্দে পাও গ্রহনক্ষত্রের ঘনিষ্ঠ সায়ন ?

ধরমতলায় দুস্থ চৌরঙ্গিতে নেই বুঝি
মননের ভিড়ের উষ্ণতা ?
সঙ্গজীবী মন তাই আকাশে আকাশে আশ্লেষ কুড়ায়,
তাই, চাঁদের তলায় কিংবা নগ্ন সূর্যে মাঠে বা নদীর তীরে
টিলায়, চূড়ায়, সবুজ মর্মরে ব্যাকুলতা
খুঁজে পায় মানুষের ভিড়,
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রাত্যহিক পরিশ্রমে নেহাত-ই লাঙল তাঁতে
সামান্য চৈতন্য বিঁধে সমস্ত চৈতন্য চিরে সংলগ্ন নিয়মে
বহুর এককে, দূর ও নিকটে একাধারে নিস্পৃহ নিবিড় ?
এ কি পলায়ন, এ তো সূর্যে যাত্রা, যাত্রা সমে,
যে জনপদের পথে রৌদ্রে অন্ধকারে মিল,
শেষ মাত্রা যার আকাশেরই নীড়।

সেজন্য যখন ফের মাঝে মাঝে লালদিঘি বা ধরমতলায়
কিংবা চৌরঙ্গিতে দামি সরাইখানায়,
তখন সমস্ত মনে দৃশ্য শ্রাব্য স্পৃশ্য গ্রাহ্য
সব কিছু এককের মনীষায় গৈবি কাব্য গায়।
অন্ধকার আকাশে বা রৌদ্রের জ্বালায় দেশকালে
দেখ বুঝি দান্তের মতন আরেক নরক ?
কিন্তু দেখ আরেক ভঙ্গিতে, নিঃসঙ্গ, বিশুদ্ধ,
যে ভাস্কর্যে পলায়ন অথবা মজ্জন দুইই বাহ্য ॥
১২ মার্চ, ১৯৬৩

হৃদয়ে অভাগারও ফুল ধরে

অন্যায়ের অন্ত নেই ! আবার দক্ষিণ থেকে
সামুদ্রিক হাওয়া হু-হু আসে,
বীজময় বাংলার সমুদ্রের হাওয়া !
ঘন বসতিতে থাকে, যদিও দোতলা,
কাঠফাটা দুপুর বিকাল প্রতিদিন
ছাপিয়ে গলির ময়লা সন্ধ্যা উতলা !

সামান্য গাছেরও তেজ অজর অমর !
কাঠচাঁপা যদি ন্যাড়া বিশ্বের সংযোগে
ক্রান্তিতে অয়নে কিংবা রেখার বলয়ে

তাল রেখে প্রাণ ধরে গন্ধে গন্ধে পান করে
মাটির অভাবে হাওয়া জলের দুর্ভোগে,
তবে কেন পক্ষপাত মানুষের ঘরে !

হরপ্পার কাল থেকে তিলে তিলে পাওয়া
শরীরমনের সত্তা বুকে ধরে দৈনিক প্রলয়ে
ফাল্গুনেও দুস্থ পঙ্গু অস্থিসার রোগে
জানলা ভেজিয়ে দেয় দুরন্ত মলয়ে !
এ অন্যায় কার ভাবো ! অথচ হৃদয়ে
অভাগারও ফুল ধরে, বয় যদি সমুদ্রের হাওয়া ॥
১৩ মার্চ, ১৯৬৩

চতুর্মুখ

তোমার অশ্রুর প্রান্তে হাসে
মহাসমুদ্রের নীলে শান্ত তটরেখা,
ঘরপোড়া মানুষের ঝড়েভাঙা জাহাজের অন্তরিন নিশ্চিত আশ্রয়
তোমার চোখের ক্লান্ত রাত্রির আকাশে
দূর সূর্য থেকে দেখা পল্লবিত বনরাজিনীলা
জীবনের হেমন্তে তন্ময় !

তোমার চোখের উচ্চে প্রখর কৈলাসে,—
বহুদিন ছিল এক সাধ
বিশ্বজ্বালা বিরাট হিমের যজ্ঞে
পেতে রাখি সমস্ত হৃদয়
অগ্নিময় শতদলে,
তোমার বিস্মিত পক্ষ্মে, চোখের মণিতে
যেখানে দাহই শান্তি, অনন্ত আকাশে
নিত্যের যেখানে মুহূর্তের মরণেই জয় ।

তুমি দিলে হাতে তুলে দানের আপন লাস্যে
সেই পারিজাত,
তোমার সন্ত্রস্ত ধ্যানে একদা যে ফুলে
তোমাকে অভয় হেনে তুষারবিদারী হাস্যে
দেবদারু বনে চলে গেল ক্ষিপ্র পার্বত্য কিরাত ।
আবার তোমাকে সেই ফুল দিই,

এক ঝাঁক অরণ্যের অন্ধকার বাঁধো,
কবরীচূড়ায় বাঁধো পারিজাত, স্মিতহাস্যে বক্ষে বক্ষে দুলে।

বহুদিন মনে ছিল সাধ,
রাত্রিগুলি খুলে দিই অপার অগাধ
তরঙ্গিত নীলে নীলে, বিশ্বময় সমস্ত জাহাজ
স্বাধীন স্বপ্নের মতো অন্ধকারে স্বচ্ছন্দ, অবাধ।
আর, দিনগুলি সূর্যোদয়ে মেলাই বন্দরে,
শান্ত স্থির স্তব্ধ তটদেশে উদ্যানছায়ায়
মাল্লাদের প্রতীক্ষিত ঘরে।
তোমার দু'বাহু ঘিরে মনে হয় আজ
পূর্ণ হবে সাধ ॥
১৫ মার্চ, ১৯৬৩

ততঃ কিম্

প্রথমে সে চেয়েছিল প্রাণের উত্তাপ,
ওষ্ঠে ওষ্ঠ বক্ষে বক্ষ মেলে।
ভেবেছিল শুধু দেবে প্রত্যহের প্রবল প্রতাপ
সব দাবি, প্রেয়সীকে পেলে।
পারেনি, কেবল পেয়েছিল হিম সর্পিল সন্তাপ,
প্রেয়সী যে বৈশাখীকে বক্ষে নিল তার মাঘী পূর্ণিমাকে ফেলে।

বিস্ময়ে অবাক ফের চেয়েছিল সাহারায় বজ্র, বৃষ্টি, হিম,
মনে হয়েছিল দেবে মেঘমালা বুঝি আলিঙ্গন,
ছায়াশ্যাম ঘর পাবে ; পরন্তু নিঃসীম
মরুমৃত্যু প্রতিদ্বন্দ্বী, হেরেছে ভীষণ
দ্বৈরথসমরে সেই, জীবনের দ্বিতীয় চুম্বন
ভস্মে উড়ে গেল শূন্যে। তারপরে : কিম্ ? ততঃ কিম্ ?
২৯ মার্চ, ১৯৬৪

সুতরাং নৈঃসঙ্গ্যও নেই

উনতিরিশে ভেবেছিল নিঃসঙ্গের কোনও সঙ্গ নেই।
ফুলে সঙ্গী খুঁজেছিল, শিরীষ চাঁপায়,
গার্ডেনিয়া গন্ধরাজে, গন্ধহীন নানা রং—তাই সই—বহু রঙ্গনেই।

তারপর, গ্রীষ্ম বেড়ে চলে, ধুলো দৃষ্টিকে কাঁপায়।

তেষট্টিতে অর্জেছে প্রজ্ঞা, অন্তত অন্তরে তাই আশা।
বাগানে কোথায় সঙ্গী ? বিশ্বাসে মিলয়ে কী-বা ?
তর্কে কী-বা আশা ? তাই আশাভঙ্গ নেই।
শুধু আছে ক্ষিপ্রশ্বাসে শূন্যবাহু ধূ ধূ ভালোবাসা।
পাতা ঝরে হৃদয়ের হাওয়ার আহারে
নানান জাতের লাল আর শাদা করবীর শীতল বাহারে।
এখানে সঙ্গীও নেই, সুতরাং নৈঃসঙ্গ্যও নেই॥
২৬ মার্চ, ১৯৬৪

দেহকে সাধে মনে

প্রেমেরই জানা যুগলে বাঁধা মন,
আমরা শুধু চিনতে পারি শরীর।
মন দিয়ে কে করে আলিঙ্গন ?
অতনু কবে ছবি আঁকল রতির ?
হে প্রেম ! বলো মনের কথাটাই
বলো হে এর হৃদয়ে ওর কানে।

প্রেমেরই জানা স্নায়ুর কাঁটাবনে
কোথায় কে যে চিরঝুলন বাঁধে।
আমরা বৃথা শমীশাখায় খাটাই
শরীরমন মরণসন্ধানে,
কারণ প্রেমে জীবন পায়ে সাধে
মৃত্যুকেই, দেহকে সাধে মনে॥
১ এপ্রিল, ১৯৬৩

সে মুখ নিয়ত পালায়

আজও চেনা হল না নিজেকে,
অন্তরে যতই দেখি, তাকাই দর্পণে,
রৌদ্রে পুড়ে চাঁদিনীতে ভিজে
অনুশোচনার খর আষাঢ় তর্পণে
কিছুতে নিশ্চিত নই নিজে,
ভেবে চলি সর্বদা যে, এ কে ?

তাই কি ধূসর হয় সেই প্রিয়মুখ,
যে মুখে লাবণ্য আঁকি মর্মের সিঁদুরে,
স্নায়ুর রক্তিম সন্ধ্যা যে চোখে দুপুরে
অনন্তের চিতা হল, যার ওষ্ঠাধরে
চিররাত্রি, বিষঙ্গের সব দুঃখসুখ
যে তৌলে নন্দনের সব তত্ত্ব ধরে ?
আপন সত্তায় রঙে রেখায় সে মুখ
নিয়ত পালায় নীল শূন্যে স্বয়ম্বরে ॥

সেই পিপুল

দু'বার দেখেছি সেই বিরাট পিপুল।
বহুকাল আগে
দিন যখন সচ্ছল ছিল,
রাত্রিও সরল এবং শীতল,
আর বিপুল আশ্বাস ছিল দেশব্যাপী প্রাণে,
উৎসাহী সামর্থ্যে দেখি দেশ
বরেন্দ্র, বঙ্গজ, রাঢ়
গ্রাম থেকে গ্রাম এবং শহর।
তখন একদা বহু ক্রোশ হেঁটে হেঁটে
অগ্নিময় মাঠে হঠাৎ পেয়েছি তাকে,
ছায়াকম্প্র শান্তির আশ্রয় প্রকাণ্ড পিপুল,
ঘাস তলায় তখনও, এবং উপরে
অগণন হরিয়াল, সবুজ, কোমল, নির্ভয়, মুখর।

এখন আবার দেখি প্রায় রাত্রে বারবার
জগ্ধতৃণ পত্রহীন দগ্ধ সে পিপুল
সহস্র শাখায় প্রশাখায়,
প্রকাণ্ড দুর্ভিক্ষ যেন মূর্তিমান, যেন ভুলে ভুলে
দুঃশাসন দুশ্চরিত্র মরুভূমি কোনো রাজ্যে
লক্ষ কঙ্কালের শীর্ণ বাহু আর লক্ষ লক্ষ
দশটি আঙুলে অভিশাপে একটি নির্দেশ।
আর দেখি রাত্রে, আর আজকাল সারাদিন,
ঘরে ও বাইরে, চোখ ঢাকি কিংবা চোখ মেলি,

দৃষ্টিহীন লক্ষ জোড়া চোখের ফোকরে শত শত
অভিযোগ, অতল, অপার, নির্নিমেষ ॥
১০ এপ্রিল, ১৯৬৩

মৎসার্টের একটি রচনা* শুনে

গড়েছ মন নির্বিশেষ সুখে,
অনেক ছেঁটে অনেক কেটে কুটে
মর্মভেদী রূপ পেয়েছ, পাথর !
তবুও কেন কান্না লাগে কাতর
জ্যোৎস্না চিরে তোমার হিম মুখে ?
থমকে যায় বনের কানাকানি,
হরিণ আসে তোমার পাশে ছুটে ।

গেঁথেছ মন নির্বিকার ইঁটে
পোড়া মাটিতে দেবতাদের ঘর,
রূপে উদাস তাকিয়ে আছে মাঠে
যে নন্দনতত্ত্ব শত পাঠে
প্রাসাদ ভেঙে বাঁধলে গিঁটে গিঁটে,
কেন বা তাতে লাগায় টানাটানি

অভাগিনীর ডুকরে কাঁদা স্বর !
বাঁধলে চোখে কত না খেটে খুটে,
দুনিয়া ছেঁটে বাঁধলে কান এঁটে,
স্বাধীন হলে শুদ্ধ হলে, পাথর ।
তবুও কেন নীরব হল বাণী ?
ঘন দামিনী যখনই চায় চাঁচর
তখনই কেন ব্যথায় মাথা কুটে
সুরের ঘাটে পাথর, ওগো পাথর !
অশ্রুনিশা বহাও ক্লারিনেটে ॥
১১ এপ্রিল, ১৯৬৩

*ক্লারিনেট কনচের্তো

যার শিল্পে

যখন পাণ্ডব আর কৌরবকে চেনা হয় ভার,
যখন আশঙ্কা আশা সদসতে প্রায় বিশ্বরূপ,
তখন সে বলে নিজ হৃদয়কে : জ্বেলে ধরো ধূপ
দুর্বিষহ যন্ত্রণাকে, অন্ধকারে গোপন রাত্রিতে,
এবং পার তো, দিনে, সূর্যালোকে গন্ধের সম্ভার
নিঃসঙ্গ আরক্ত ভোরে, হয়তো বা একার সন্ধ্যার
গোধূলি বিষাদে কিংবা বর্ণাঢ্য মেঘলা মহাকাশে।

যখন তত্ত্বের ভূত তথ্যের মাথায় বসে ওঝা,
অথবা তথ্যের মুখে গদিয়ান মিথ্যার অধ্যাস,
শিশুতীর্থ ভেঙে দেয় কুরুক্ষেত্রে বিভিন্ন যাত্রীতে,
শ্বাসরুদ্ধ জীবনের কন্যা, বধূ, মাতা ; রুদ্ধদ্বার
যখন সমস্ত তীব্র বর্তমান কর্তা-ভজা বোঝা,
তখন ছড়ায় চোখ কান অতিক্রান্ত দূরে, আর
হৃদেয় মননে পায় যে অতীত আসন্নসম্ভবা
জনয়িত্রী যে অতীতে বিশ্বব্যাপী আয়ত বিন্যাস,
যার শিল্পে বর্তমান কৃষ্ণপক্ষে রাত্রি পুনর্ণবা ॥

৯ অগাস্ট, ১৯৬৩

চায়

মন নিয়ে সে করেনি বেচাকেনা,
চায় নি প্রতিযোগীর আহ্লাদ।
চায়, মিলুক সাধ্য আর সাধ,
মধ্যদিনে রাতের বরাভয়ে।
মুক্তি গড়ে যতই পড়ে বাঁধ,
শোষণে যত তোষণে বাড়ে দেনা,
নিজের মনে পরের গড়া বাধ।

চায় মিলুক এ কোলে ওই কূলে
মাটিতে আর স্রোতের কলরোলে,
স্থবির মাটি গতির লয়ে লয়ে
মিলনে যবে শরীর মনে ভোলে

মৌল ভেদ, তখনই বিরহে না
মাত্রা তার গমকে ভরে তোলে !

আজ হয়তো রাত্রি আর দিন
খণ্ড ক্ষণে আত্মপরে লীন,
আজকে তাই রৌদ্রে জ্বালা শিলার
দ্যুতিতে চায় মাটির চির ধৃতি,
কারণ, স্নায়ু মুহূর্তেই নীলার
আঁধার স্রোতে উড়িয়ে সব স্মৃতি
মিলতে পারে বহুতে এক, অগাধ ॥
১১ অগাস্ট, ১৯৬৩

এই রকমফের

কেউবা বাঁশি কেউবা দিলরুবা
বাজায় কেউ গুঞ্জরিত গানে,—
তিনটি জোড়া যুবতী আর যুবা,
ভালোলাগার যৌথ খুশি প্রাণে ।

এরা কি তবে সঠিক ভাবে তিন
হৃদয় দেবে তিনজনারই হাতে
আত্মদানে রাত্রি আর দিন
মেলাবে এক সম্পূর্ণতাতে ?

এরা কি বহু বছর বেয়ে শেষে,
প্রাত্যহিকে পৌঁছবে সে তীর,
যেখানে দুই পাড়ের অস্থির
দ্বৈত এক অতল নীল দেশে ?

বাজাক বাঁশি, বাজাক দিলরুবা,
কালের চালে এই রকমফের !

অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের
অনেক : প্রেম একাই, ও হে যুবা ॥
২৩ অগাস্ট, ১৯৬৩

একটি রাসে

অথচ তারা চেনে, জানেও, ভালোও বাসে বটে ;
তবুও দেখে আলিঙ্গনে ক্ষণে ক্ষণে পাহাড় ;
মুগ্ধ চোখ, মুখেই মুখ, হঠাৎ শোনে অপার
সমুদ্রের দূরত্বের পাতাল সংকটে
বিচ্ছেদের অতল নীল দীর্ণ নির্ঘোষ ।
তখন তারা দগ্ধ মরু নিরম্বু দুপাড় ;
তখন তারা শত্রুদেশ, প্রান্তে নেই আপোষ ।
ভুলেই যায় মানুষ দুটি, কী-ই বা কার আয়ু !

যখন তারা পরস্পর পরম সাধনায়
সর্বাঙ্গে কদম্বের বিধুর সৌরভে
অবচেতনে কীর্তনের দশায় দিশাহারা,
দুই চেতনা ছেয়ে যমুনা একটি বৈভবে,
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চদ্বারে উধাও চাঁদ-তারা,
তখন কেন হঠাৎ ভাবে : ও বুঝি রাধা নয়,
এ বুঝি আর প্রেমিক নেই ; হঠাৎ উদ্বায়ু
দুজনে গড়ে অতীতে ভুল, বর্তমানে ফাঁদে
ভূত অতীত, শমীর ডালে আগুনে চোখ ধাঁধে ;
দুটি মানুষ ভুলেই যায় প্রেম অথবা আয়ু
একটি রাসে পূর্ণ, আর অন্য সাধে নয় ॥
২৭ অগাস্ট, ১৯৬৩

ডানায়

কারণ ডানায় তার
ক্লান্তি নেই মেঘাক্ত আকাশে উদ্‌ভ্রান্ত হাওয়ায়
সবিতার বরেণ্য কান্তিতে
আপন ভ্রান্তিতে আর অন্য বিভ্রান্তিতে ক্ষান্তি নেই

গতির স্বধর্মে তার ডানার যুগলে
শ্রান্তি নেই উভচর শূন্যে শূন্যে দিনান্তের চাওয়ায়-পাওয়ায়
একমাত্র শান্তি তার শান্তি নেই অশান্তির
স্থির শান্তি আদিঅন্তে যেখানে বধির অন্ধ

যেখানে প্রভাতী হাহাকার বন্দি বন্ধ কূপে অন্ধকার
যেখানে হৃদয় মূক হৃদয়হীনের অনন্ত স্থবির ময়াল স্বস্তিতে

কারণ ডানায় তার ঘূর্ণির অধীর জিজ্ঞাসার ভার
কখনও বা মীমাংসার তীরের ফলার ধার
কারণ পিপুলে তার প্রাত্যহিক বাসায় মাংসল স্নায়ুতে অস্থিতে
আশার গঠন সর্বদাই দুরাশার
তাই তার দেহের মনের দিনে ও রাত্রিতে
গৃহের কোণের আর গ্রহগ্রহান্তরের স্বর্গের
ভেদ নেই সংসারীতে আকাশযাত্রীতে
মেঘে রৌদ্রে চাঁদিনীতে ক্রন্দসীর তনু কুয়াশার
প্রচণ্ড বেগের ব্যাপ্ত আবিশ্ব ভর্গের
শ্রুতির উধাও স্তব্ধ ক্ষিপ্রতার জয়গানে

জানে সে অক্লান্ত-ক্লান্ত
ওড়া আর ফেরা তার বাহির ও ঘর জন্মে ও মরণে
এক বেগে একসূত্র উভয়ত ডানার সন্ধানে ক্ষান্তিহীন
কারণ সে পাখসাটে পাখসাটে ঝাপটে ঝাপটে
কখনও বা স্বচ্ছন্দ সঞ্চারে মানে
স্থিতির জঙ্গম সত্য স্থির ভ্রান্তিহীন
আপন সঞ্চিত বেগে মুক্ত হাওয়ার আবেগে অকপট আত্মদানে
পরম দয়ায় দান্ত সর্বজীবে বিশ্বে ব্যাপ্ত
সমধর্মী বেগবান মৃত্যু ও জননে
কানায় কানায় দুবাহুতে টানে অনাদ্যন্ত ধ্যানে
যেমন সে উভয়ত পায় অতনু বায়ুতে
সোনালি ডানায় তার পরাজয়-জয় সম্পূরক জ্ঞানে
হিরণ্যগর্ভের জীবনের যমজ আয়ুতে ক্লান্তিহীন।
৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

একটি দৃশ্য

শুধু থাকে আশেপাশে পর-পর টিলা
আর রয়েছে ইঁদারা
আর উঁচুনিচু বাঁকা পথ
পুবে সূর্যোদয় ঐ ত্রিশূল পাহাড়ে
পশ্চিমে সূর্যাস্ত এই ঢিলাঢালা কোমল পাহাড়ে।

প্রায় এক আঁকা ছবি
কিংবা দুটি—চড়াইতে পুব থেকে টিলে চালে
পরপর যৌবনের উচ্ছ্রিত গরিমা—
উৎরাই-তে আরেক বাহারে
মনে হয় এরাই কি তারা ?

মধ্যে ছিল লালছাদ বাড়ি
আর সামনেই ইঁদারার বৃত্তকে তুলেছে ঊর্ধ্বে যমজ কাঁঠাল।
সেই সবুজ ও লাল তাল দিত গোটা নিসর্গের
যৌবন স্ফুটিত নৃত্যপরাদের আপন উল্লাসে।

গল্প ছিল : কবি
যাঁর ব্যক্তিস্বরূপের ব্যাপ্ত নীলাকাশে
সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সব চূড়া ঘুরে
চৈতন্যের রচিত স্বর্গের মধ্যে প্রতিদিন
সমতল মধ্যাহ্নে ভাস্বর,
কয়দিন এই দৃশ্যে দিয়েছিলেন পূর্ণতা—
প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত মানবিক আপন স্বাক্ষর।
গল্পটিই আছে, শুধু কবির পুরাণ !

গ্রামে বা শহরে যেখানেই বলো, শাজাহান
আমরাই, আমাদেরই কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন-ধনমান,
তাই নেই সেই গ্রাম্য কুঠি, সেই লাল
নেই সেই আশ্চর্য যমজ সবুজ কাঁঠাল।
শুধু পর-পর টিলাগুলি করে যায় গান
সূর্যের বিরাট দিন ধরে
আর ভরে তোলে পৃথিবীর অন্তর-বেদনা আর
আমাদের কল্পনার গৃহস্থ শূন্যতা ॥
১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

ভাদ্রসন্ধ্যা

ভাদ্রের শেষের সন্ধ্যা, আশ্বিনের আসন্ন বন্দরে।
দেখি, ভাবি নির্নিমেষ।
হে পৃথিবী !

হে স্বদেশ ! তোমাদের কিছুতে যায় না ভোলা ।

রূপেগুণে ভোর প্রাণ, মানবিক চোখ কান স্পন্দিত হৃদয়
ঢেউ তোলে অভিরাম, নন্দিত চৈতন্যে দোলে,
অবিশ্রাম ভাঙে পাড়, অভ্যাসে অপরাজিত,
যেন জীবনের সৌন্দর্য অমর । এবং মানুষ অলৌকিক
সৌন্দর্য যাদের অপেক্ষায় উদগ্রীব আপ্লুত
আকস্মিক অশ্রুস্নানে হাস্য স্মিত,

যেন সুভদ্রার তরঙ্গিত শরীরের নারীত্বের বিভা,
মুখের নিটোল, কটির ভাঙন, বক্ষের পাহাড়,
বাহুর নক্ষত্রবৃত্ত, চিরস্থায়ী পরিবর্তনের খোদাই আকাশে বদ্ধনীবি
অথচ আমরা চিরপরিবর্তনীয়—এখন এখানে দ্রুত,
মুহূর্তেই ওখানে নিঃঝুম ।

ভাদ্রের আলোয় স্নান, শরত আকাশে শরীরে উজাড় ।

মেঘ, ঢেউ, বালিয়াড়ি, উপলমুখর সূর্যের প্রতিভা,
আলোর তরঙ্গে দোলা ।

তারপরে ? ঘর, অনিদ্রা বা অন্ধকার নীলাকাশে আসমুদ্র ঘুম ॥
১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

বৈদেহী

আমার প্রদীপহীন নিত্যসন্ধ্যা তোমার তুলসীমঞ্চে নত,
হে বৈদেহী, অয়ি পতিব্রতা !
অশোককাননে নই রক্তময় ফুলখেলা-রত,
তোমার গণ্ডীতে জানি অবান্তর আমি আর আমার তীব্রতা ।

আমার আকাঙ্ক্ষা তাই তোমাকেই বন্দনায় ঘিরে,
তুমি পুণ্যভূমি দ্বীপ আমার সমুদ্রে,
সুন্দরী অপাপবিদ্ধা ! শুধু হৃদয়ের বালুতীরে
জলে জলে ঢেউ তুলি দিনে রাত্রে মেঘে আর রৌদ্রে ॥
১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

বন্দিনী না

বন্দিনী না, সেই বন্ধ করেছে দুয়ার,
দুর্লভ সে নিজ দেহলিতে।
জানি না কি ব্যথা কিংবা কি যে ব্রত তার !
সে আসে না আমজামে শীতল গলিতে।

তবু সে আপন, তার অন্তর অবাধ
সূর্যমুখী মেলে জানালাতে ;
তাকে দেখে জীবনের মিটে যায় সাধ,
তার চোখে রাত্রি চায় মধ্যাহ্নে পালাতে ॥
১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

তৃষ্ণার জল

ফাল্গুনের কলকণ্ঠে হাসি গান ক্ষিপ্র লঘু কথা
কানে ভাসে মাঘী হিমে। শুনি,
আবেগ স্মৃতিতে শুদ্ধ, চাঞ্চল্যে অযথা
কাউকে দিই না লজ্জা—চিত্রা, ভদ্রা, উলূপী, ফাল্গুনী।

সত্তার প্রথম সত্যে পরিপূর্ণ সূর্যাস্তে প্রতীক্ষা,
বিস্ময়ে একা শরশয্যাশায়ী মন।
শুধুই তৃষ্ণার জল যৌবনের হাতে চাই ভিক্ষা
দগ্ধ ইন্দ্রপ্রস্থে দুস্থ, হে বৈশম্পায়ন ॥
২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

দুর্বহ অদ্বৈতসিদ্ধি

অন্যোপরে অবশ্যই ব্যক্তি তুচ্ছ, নিজেও যে জানে অবান্তর

কিন্তু তার মধ্যাহ্নিক রৌদ্র ? তার নিদ্রাহীন নক্ষত্রবাহার ?
সবই কি সমুদ্রে মৌন আত্মভুক্ অনন্তের একক আহার ?

দুর্বহ অদ্বৈতসিদ্ধি, দ্বৈতের বন্ধনে যদি না হয় সান্তর,
যেমন সংগীতে স্বরব্রহ্ম উদ্ভাসিত হয় লয়ে,
যেমন আরণ্য অগ্নি বাহুবন্দী গ্রাম্যকন্যা তন্বঙ্গী স্বাহার।

মৌন আত্মজ্ঞান জেনো পুনর্বৃত্ত একমাত্র শব্দের অন্বয়ে।

আমি দীন, তুচ্ছ, দেবী,
পীন তোমার হৃদয়ে গৌণ, অবান্তর।
আমার সত্তার সত্য বাজে কিন্তু প্রসন্ন নির্ভয়ে,
তোমারও অজ্ঞাতে, উষ্ণ চন্দ্রহারে, বাজুবন্ধে, তোমারই বলয়ে॥
৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

একটি শিশুকে

তোমাকেই দিই আমার আর্ত স্বর,
তুমি তাতে তোলো স্বচ্ছ সুরের ব্যঞ্জনা।

অন্ধ আকাশে শূন্য আড়ম্বর
আমাদেরই গড়া চোখের জলের বঞ্চনা।
আমরা কেবল হারি আর বীরবেশে
ভাবি মন্দির প্রাসাদ বানাই বড়,
আমাদের হার তোমরাই করো জড়ো,
আমাদের ভাঙা কীর্তির হাট ঘেঁষে
তোমরা আরেক ডাক দাও আর যত
বালকবীরেরা খেলার সত্যে মাতে।

তোমরাই জানো গড়তে, সত্যব্রত,
খেলা জানো খেলা তন্ময় শিশুহাতে।

তোমাকেই দিই নষ্ট প্রদর্শনী,
ছিন্ন ভিন্ন উচ্চৈঃস্বর একালের,
যত ছবি গান তোমরা ছড়াও উদাসীন
বিকালে, তা দেখে ত্রিকাল বাজায় খঞ্জনি॥
৮ অক্টোবর, ১৯৬৩

ভিক্ষুক

অশ্রু তার শুকনো, ফোটে গায়ে,
কান্না নয় কখনও এত অতল।
খোঁড়াই বটে, কিন্তু কাটা পায়ে
চলন তার দিব্যি পায়দল।

তাইতো তাকে খেদায় দলপতি।
বাঁ চোখ নেই, মানবে না সে কানা।
আস্তানায় সাজে না দুর্মতি,
আয়ের ভাগে কে দেবে তাকে দানা ?

কখনও তাকে দেখি চৌমাথায়,
কোনওদিন বা গলির পচা মোড়ে,
যেখানে এঁটোকাঁটায় হাওয়া মাতায়,
দেশি কুকুরও ফোঁপায় করজোড়ে।

কান্না তার দু কান বেঁধে, চোখও—
যেন শুকনো বালিতে ছোটে কটাল,
যেন আকাল আকাশে গলে বিদ্যুৎ,
যেন মানব-আত্মা ভিজে পাথর।

এমনি তার দৈন্য ! তায় রোখ্ ও
এমনি, যেন পৃথিবীটাই পাতাল,
সারাটা দেশে মানুষই নেই, ভূত
কিংবা দানো, আর সে নিজে পাথর !

হঠাৎ ঘুমভাঙানো অবসাদে
কিংবা সব আলোক-খাওয়া অমায়,
হয়তো ফালি জটায় শাদা চাঁদে
তাকেই দেখি, তাকিয়ে আছে ক্ষমায়,

নাকি, আদিমতম বন্য ঘৃণায়
সে আত্মহা প্রাণীর নবপ্রতীক ?

জানি না, জমা কান্না ফোটে গায়ে,
দীর্ঘতম রাজপথে সে পথিক ॥

৮ অক্টোবর, ১৯৬৩

সংবাদ মূলত কাব্য

শ্রীমান অসীম রায়-কে

সাংবাদিক নয়, কিন্তু ভাবে নিজে সমস্ত বিশ্বের
নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনরাত করে যায় সত্যের সংগ্রহ
তথ্যে আর তত্ত্বে, দেশবিদেশের ধনীর নিঃস্বের
অক্ষম কষ্টের আর গদিয়ান শক্তির দুর্বহ
এপিঠ-ওপিঠ চিত্র তুলে ধরে ; কারণ সংবাদ,
সে বলে, মূলত কাব্য ; তাই সে কবিতা লিখে যায়।
অথবা সংবাদ যদি কাব্য হয় নিকষে নিখাদ,
তাহলে বাজার তার ডাস্টবিনে বা উদার হাওয়ায়।

বোদ্ধা তার আছে বটে, প্রতিদিন সকালে বিকালে
লিঅরের ভাঁড় বেশে, থলি পিঠে কৃশাঙ্গ যুবক
আসে আর কাব্য বাছে দশবিশপাতা ; আর হাসে
নিজস্ব সংবাদদাতা বারান্দায় সহাস্যে দাঁড়ালে।
জানি না কি চুক্তিপত্র, যুবকটি বুঝি সম্পাদক ?
অন্তত দুজনে দেখি নিত্য নত কবিতাসকাশে ॥

১০ অক্টোবর, ১৯৬৩

কারণ তুমিই

প্রান্তরে মাঠে এ চূড়া ও চূড়া গোটা পাহাড়ের গায়ে
রৌদ্র যখন দুহাত বুলায়, চারদিক ঘুরে দেখে,
কখনও আনত মুখ রাখে ঘাড়ে মেঘের মেদুর ছায়ে,
দেহবিস্তারে এখানে ওখানে চকিতে কবিতা লেখে

যাকে ভেবেছিলে পরমেশ্বর সেই দেখ পার্বতী,
কিংবা রৌদ্রে মেঘে কৌতুকে সাজল সে আজ রতি !
কে উজ্জীবিত অনঙ্গদেব, প্রকৃতির এ কী [illegible] !

প্রতি শেষরাতে পাণ্ডুর হাসি কী ভোরাই আশা লেখে ?
প্রতি গোধূলির পঞ্চমাঙ্ক অনঙ্গ জিজীবিষায় ।
সূর্যের প্রেম বড় নিয়মিত, পৃথিবী হরেক তৃষায়
প্রায়শই মাথা দুলিয়ে উধাও, হাজার মর্ত্য কাজে ।

ভুল হল বলা ? বেশ তবে তুমি পার্থিব নয়, চাঁদই ।
পূর্ণিমা যদি নাই হও, তবে অনন্ত অমাবস্যা ।
যতই সূর্যে তোমাকেই দেখে যতই না তাপে বাঁধি,
তুমি অদৃশ্য, শূন্য আকাশে হে অসূর্যম্পশ্যা !

পাঠ নাও সখী, প্রকৃতির কাছে আজন্ম প্রেমে সখ্যে,
মেঘে ও রৌদ্রে, সূর্যে মর্ত্যে অথবা শীতল চন্দ্রে
অতনু আলোতে নারীর শোভন লালিত্যে গড়া বক্ষে
ঊষর দিনের হালকা হাওয়ায় স্নিগ্ধ মেঘের মন্দ্রে
পাহাড়ের গায়ে প্রত্যহ উপলক্ষ্যে ।

কারণ তুমিই প্রকৃতি, নিদেন প্রকৃতির সহচরী !
আমার হৃদয় অভিজ্ঞানের—অন্তত অনসূয়া
তাই তো প্রহরে প্রহরে তোমাকে দুহাতে হৃদয়ে ভরি ॥
২৬ অক্টোবর, ১৯৬৩

জাতক

এ দৃশ্যে বৃদ্ধেরও জাগে সম্ভ্রম, বিনয় :
অন্তর্দর্শী দুই চোখ উদাস, মন্ময়,
জয়পরাজয়হীন, কিবা মৃত্যু কিবা জন্ম—এত অসহায়,
দুহাতে প্রাজ্ঞের ধৈর্যে আবদ্ধ বিস্ময়,—
জীবনমৃত্যুর দ্বৈতে ঘরে এক সদ্যোজাত শিশু ।

সে কি জানে তার ভাবীকাল ?
অনিশ্চিতি, অনটন, অপঘাত সকালবিকাল,
দেহের মনের গ্লানি, হত্যা, যুদ্ধ, বিষ, উন্মাদ হাওয়ায় ;
কুৎসিতের, নির্বোধের, নিষ্ঠুরের রসাতলে পালায় ত্রিকাল-
জানে বুঝি দিনগত পাপক্ষয়ে সদ্যোজাত শিশু ?

অথচ সে নৈর্ব্যক্তিক স্বার্থে একা, বিশ্বাসী, নির্ভয় ;
না, বরং, জীবনে তন্ময়,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আর উত্তপ্ত আশায়, কাছে মানুষ চাওয়ায়,
যেন প্রাণের ভূস্বর্গে তার নেই কোনো দৈনিক প্রলয় ।

তাই কাঁদে-হাসে এক অন্য সুরে সদ্যোজাত শিশু ।
মনে হয় শিশুরাই জীবনমৃত্যুর ঘরে ছদ্মবেশী চিরন্তন যিশু ॥
২৯ নভেম্বর, ১৯৬৩

অনিশ্চিত

বরাবর সাধ : হৃদয় বাঁধবে ইস্পাতে,
যেমন সেকালে সৈন্য কিংবা আদিবাসীরা
অনেক ধনুকে টান দিত তীর ধীর হাতে,
যেমন নব্য জ্যামিতি বানায় ভাস্করে
কিংবা যেমন পাথরের বিঘা চাষ করে,
বিঘত ফলায় দেশজ রৌদ্রে চাষিরা ।

হয়তো বেঁধেছ, হয়তো শুদ্ধ তদ্গত
হৃদয় তোমার পঁচিশে না হোক পঞ্চাশে,
শিল্প যেখানে শিল্পীতে হয় সংহত
তখন স্বপ্নে প্রত্যহ হবে দ্বিধাহীন,
আকাঙ্ক্ষা হবে দুর্বার দুই বাহু-লীন,
শরীর হৃদয়ে একাকার হবে উল্লাসে ।

কিংবা হয়তো হবে না, বুঝিবা ইস্পাতে
রূপায়িত খালি স্বপ্নের গড়া বিন্যাসে
বৈদেহী ছাড়া কেউই হবে না নন্দিত ।
জনকধনুর আততির নীল সন্ন্যাসে
কাউকে কখনও করবে না প্রেমে মণ্ডিত,
নিঃস্ব হৃদয় মাটি পাবে শেষ নিশ্বাসে ॥
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৩

নব্য উন্মাদনে

একালে স্বপ্নও ভিন্ন ভিন্‌দেশীর রোমাঞ্চে আফিমে
এখন কিছুতে ভোলা যায় না যে নিরুদ্দেশ ক্লান্তি,
অচিনের অভিসারে আদিমের আকর্ষণে ভ্রান্তি
অনেক যাত্রায় শেখা, বিচ্ছিন্নের চৈতন্যের হিমে
স্নায়ুর আগুনে লুপ্তি খোঁজা বৃথা অলীকে অসীমে।
আজ প্রতিবাদী তীব্র স্বপ্নে দেখে প্রতিবেশী কান্তি ;
ভ্রমণে না, শ্রমে তার রাত্রি অবচেতনের শান্তি,
ককেনে না, নয় মস্কো নিউইঅর্ক লন্ডন পিকিঙে।

দুর্জ্ঞেয় ঘরেই আজ, উৎকট উদ্ভট দেয় ডাক
সভ্যতার অভিসারে প্রত্যেকের রুগ্‌ণ পরিবেশে,
অপূর্ণ দুর্জয় আজ মননকে দুঃসাধ্যসাধনে
নতুন রোমাঞ্চে হানে প্রত্যেকের দুর্গম স্বদেশে,
সমুদ্র বিজ্ঞান আজ, উভচর জাহাজের হাঁক
নিজেরই সত্তার দ্বীপে দ্বীপে শুনি নব্য উন্মাদনে ॥
২৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৩

ধৈর্য

দেখি তার প্রতি অঙ্গে প্রতি অবয়বে
অলৌকিক যে লাবণ্যে সৌন্দর্যলহরী,
অলৌকিক, তবু দ্বৈত দেহময় স্তবে
কেন অষ্টপ্রহর যে উন্মুখর করি,
সে তত্ত্ব জানে না জানি স্বয়ং সুন্দরী।
আমি জানি কেন কম্প্র দিন সে সৌষ্ঠবে
জীবনমৃত্যুতে কেন প্রদীপ্ত শর্বরী
এই রূপে ক্রমান্বয়ে পালিত উৎসবে
চৈতন্যে বিনিদ্র রাখে প্রাকৃত ঈশ্বরী।
রাখবেও, যতদিন প্রাণ আছে শবে।
তারপরে হয়তো বা নিঃস্পন্দ গৌরবে
অর্ধ হবে পূর্ণ, দেবে চুম্বিত বৈভবে
আমাকে অশ্রুর স্নান। আমি ধৈর্য ধরি ॥
২৫ জানুআরি, ১৯৬৪

রক্তে মাঘ

রক্তে মাঘ, তবু স্নায়ু বসন্তবাহারে বিচলিত,
ভাদ্রের সজল ব্যথা বিজ্ঞাপিত অস্থিতে পেশিতে ;
অথচ মনের ক্ষিপ্র কৌতূহল বুভুক্ষু, তৃষিত ;
কামনাও অন্তহীন, যেন বা ফাল্গুন কাঁপে শীতে ।
মৃতে, অর্ধমৃতে এল যৌবন বেদনা-রসে ভোলা
একাগ্র ইন্দ্রিয়মগ্ন সন্ন্যাসীর মতো, কিংবা বলো
কৈশোর-উদ্‌বেল ঘোরে ; কখনও বা শিশুর উতলা
অর্থাৎ সম্পূর্ণ এক মানসিক মুক্তিতে—টলোমলো
খেলার বাস্তবে ধ্যানে অভিন্ন কল্পনা রাত্রিদিন ।

তবু রক্তে হিম হাওয়া ঝরে, বালি ওড়ে, ওঠে চর,
বর্তমান চতুর্দিকে পেশিতে গ্রন্থিতে শিথিলতা,—
শিশুর কৌতুক-সঙ্গী, যৌবনের করুণার পাত্র,
যদিচ বিশুদ্ধ তীব্র জিজ্ঞাসায় মগ্ন আবিলতা
নেই, নেই আত্মময় লোভ আর ক্লান্তি । একমাত্র
বলা যায়, নিজেই নিজের কাছে প্রায় হাস্যকর !

অথচ এও তো সত্য বৃদ্ধ রক্তে হৃদয় স্বাধীন ॥
৩১ জানুআরি, ১৯৬৪

তাই বলে যাওয়া

বস্তুত স্বরাট্‌ মনেপ্রাণে,
তাই কোনও অনুশোচনাই আজ আর
রাত্রিকে অস্থির কিংবা দিনকে বেকার
করে না, এখনও কোনও অনুতাপই, সামাজিক অথবা নৈতিক
সন্ধ্যার অনন্ত বুকে বিষাদে চাপে না ।

বরঞ্চ হয়তো ভাবে কেন মূর্খ রক্ত-কে স্নায়ু-কে
হৃদয়-কে মনন-কে মায়া-মমতায় কিংবা সৌজন্যে-লজ্জায়
বঞ্চিত করেছে এতদিন বহু ঘৃণা বহু প্রেম থেকে,
অভ্যস্ত অচেনা বহু তৃপ্তি থেকে, তথ্যে তত্ত্বে একাত্মতা থেকে
নিজেকে অন্যকে,
ভুলেছে যে যেহেতু জীবনে মৃত্যু সত্য মৃত্যুতে জীবন,

যেমন শরীরে মন মনেই শরীর, আপনাতে পর
আর অন্যেই আপন, যেমন চিন্তাই ক্রিয়া কর্মই মনন,

তাই নৈমিত্তিক নতি দেওয়া পাঞ্চজন্য
আলিঙ্গনে পুনরালিঙ্গনে খণ্ডিত আয়ুকে
চৈতন্যের উভচর মানবিক স্বাধীন সন্তোষে।
তাই আজ আত্মদানে প্রত্যহের অন্তিমশয্যায়, হে বসন্ত-সেনা,

প্রতিদিন জন্মের উৎসবে ডেকে ডেকে বলে যাওয়া
যারা যে যে সদসৎ তাকে
দীর্ঘস্থায়ী স্থিত দিঘি অথবা হঠাৎ খরস্রোতা
উদ্‌বেলিত দিয়ে গেছে তার সমগ্র বা ক্ষণিক সত্তাকে
বিস্তার, ক্ষিপ্রতা ; সেই সব সহচর, বন্ধুদের, নবীন, প্রবীণ
চেনা, আধচেনা, সহচরী, বিস্তৃত, বাস্তব,
পাঞ্চালী, উলূপী আর তুমি, পতিব্রতা ॥
১৩ ফেব্রুআরি, ১৯৬৪

একটি প্রাচীন কবিতাংশ

তুমি তবে ফুল ? একটি গাছেরই ডালে একবাশ ফুল ?
মুগ্ধ তোমার বাহারে
এরা প্রতিদিন ঘোরে ফেরে, ভাবে আহা রে !
যদি ঝরে এক, দুই বা তিনটি কলি —
অমরাবতীর সে কোন্ দেবীর দুল !
প্রতিদিন দেখি ঘুরি ফিরি রূপে চোখ ঝুরে মনপ্রাণ-ভোর।

তবু কি বলবে ললনাললিত আশ্লেষ-আশা ভুল ?

এরা অনেকেই করেছিল বলাবলি,
ভেবেছিল ঘরে স্নিগ্ধছায়ায় সতর্ক প্রেমডোর
তোমাকে বাঁচাবে তুষার রৌদ্র থেকে কবোষ্ণ প্রাণে,
কারণ তুমিই দেবী ঘরে, তুমি ঘরেই অমর ফুল।

ভুল হয়েছিল। আজ সেই ভুল

সংশোধন কি সম্ভব মালী ডেকে ?
শুকনো ডাল কি পাতা পাবে কালো বাগানে ?
১৩ ফেব্রুআরি, ১৯৬৪

শুদ্ধ নীল গান

বিদায়ের লগ্ন জেনো সর্বদাই,
প্রাক্তনের পায়ে কেন লাজাঞ্জলি দাও ?
কানে যার কৃষ্ণপক্ষ রথের উধাও
চক্রের আসন্ন ধ্বনি, যে দিকে পালাই অন্ধকারে আকণ্ঠ ধুলায়,
তাকে কেন মাল্যদান ?

নাকি ঠিক সেই হেতু ?
কারণ, সময় যার ঊর্ধ্বশ্বাস সূর্যাস্তে নিঃশেষ,
যে মাত্র অস্তিত্ব আর নাস্তিক্যের সেতু,
তারই চোখে, চাও, জ্বলে সাত্ত্বিক আবেশ
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে রাসে যমুনার শুদ্ধ নীল গান ?
১৬ ফেব্রুআরি, ১৯৬৪

গেরস্ত শখ

তাকায়, দুচোখে ত্রস্ত পদ্মরাগ,
কান কাঁপে, ঠোঁট থরথর যেন বিদ্যুতে,
অনন্ত ক্ষুধা আর বুভুক্ষু কৌতূহল,
কমিক ক্যাঙারু পায়ে হরিণের বেগ,
এই স্থির এই ত্বরিত অসন্তোষ !

জোড়া ছিল, আজ বিরাট একটি দল,
অনিয়ন্ত্রিত প্রজননে সচ্ছল !

কিন্তু পোষাকি আমাদের পোষা খরগোশ,
যেমন বাঘাটা কারণে নিষ্কারণে
চেঁচায় গড়ায় তোষামোদে পায়ে পায়ে,
মোটেই হিংস্র কুশ্রী নেকড়ে নয় ।
অথচ ছোটেনা নেকড়ে-তাড়ানো দায়ে

প্রায় আমাদেরই মতো আপিসের মানুষ,
গলার দাঙ্গাবাজিটা মৌল ভয়,
কখনও যাবে না গহন মনের বনে !

ভালো লাগে খুবই কুকুর এবং খরগোশ,
খুবই ভালো লাগে মুরগি, মোরগ, বাচ্ছা,
ঘর করে, খায়, প্রহরে প্রহরে হাঁকে,
ডিম দেয়,—আর কালিয়াও দেয় বটে,
বংশবৃদ্ধি শোধ করে দেয় খোরপোশ।
তার চেয়ে বড় কথা, দেয় রোজ আশ্বাস,
ডাক দিয়ে বলে : কেঁদো না, আচ্ছা, আচ্ছা,
তুমিও দাদারে বন্য পশু বা পক্ষীই
কিন্তু কলেজে পড়েছ, সেজেছ লক্ষ্মী,
আমরা যেমন তোমাদের শখে ক্রীতদাস।

মূর্খ, বোঝে না আমাদের কোন্ সংকটে
শৌখিন সাধে বুনো বাবুয়ানা ডাকে।
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪

শৌখিন শিকারি

স্তব্ধ নিথর পাহাড়ে লাফায় খরগোশ,
চোখের চুনিতে কানের বিষাণ-যন্ত্রে
সামান্যতম শব্দেই হৃৎকম্প।
অথচ মানুষ, বন্যই নও, লম্ফ
যতই করো না, কোনোই প্রাকৃত মন্ত্রে
কপালের ঘাম বিনা জুটবে না খোরপোশ।

স্তব্ধ গোপন বনের ছায়ায় হৃদয়ের
প্রহর জানায় বানপ্রস্থে মুরগি।
তুমি শোনো ঘুমে, তাঁবু ঘিরে জ্বালা অভয়ের
দীপ্তিতে খোঁজো বুলবুলিদের আরাধ্য
আরতির ধ্বনি, ভাঙুক ঘন্টা বর্গি।
বনের খাজনা বুনো পাখি খাসা খাদ্য।

তার চেয়ে দেখ কুকুরের পাল, বন্য,
জিপ থেকে দেখো, নেকড়ের দল পলাতক,
নেকড়েরই জ্ঞাতি, নেকড়ে-শিকারি, হিংস্র,
দুরন্তগতি। কিন্তু তোমার অন্য
জাতক, শিকারি-জন্তুই নও, হে ঘাতক,
জিপটা ছোটাও, ছোটে শতাব্দী বিংশ ॥

বহু মুখ

বহু মুখ, কারো বা শরীর, আর মন-ও
—মৃতের, অধরা কিন্তু স্পষ্টতর, কেউ চেনা,
কেউ বা অচিন প্রায় ; খেলার সঙ্গীরা,
বালকের সখাসাথি ; যুবার বয়স্য,
বয়স্যাও, স্মৃতিদীপ্ত, বস্তুছায়াহীন,
প্রাণের তীব্রতা পায় স্বচ্ছ চেতনায় ;
বন্ধু, সহকর্মী কেউ মর্মসখী, চেনা
কেউ বেশি কেউ কম কোথা কোন্
বিকালের মাঠে কিংবা গঙ্গার দুপুরে,
পাহাড়ের ভোরে কিংবা অসূর্যম্পশ্য
অলিগলি কলকাতায় সকলেই চলে,

হয়তো বা, ঠায় দাঁড়িয়ে ভাবনা করে,
গালে হাত রেখে বসে, আর সে-ভাবনা
আজ অন্তহীন, নদীর স্রোতের মতো
চরে চরে, কিংবা দূর শিখরের ঢলে
সচল অথচ স্থির ; দেখি অবিরত
চেনা মুখ, আধ-চেনা শরীর বা মনও,
শরীর ও মন, সচেতন নিঃসঙ্গের ঘরে
অদৃশ্য গলায় বলে : যাব না, যাব না।

অথচ সে-দেশ নেই, এই কালান্তরে
কলকাতা অচেনা, অপহৃত, অপসৃত,
সে-পৃথিবী চলে গেছে, রয়েছি আধৃত
আমরা কয়েকজনা শুভ্র শূন্য চরে,
দুপাশে ফেনিল ঢেউ, রৌদ্রাক্ত আদরে।
২৩ ফেব্রুআরি, ১৯৬৪

তিনটি কাঠবেড়ালি

অনেক দিনের অনেক যত্নে কমিয়েছি সন্ত্রাস।

এদিকে আমার ছুটি শেষ হল প্রায়,

আজ তিনটিতে গাছ থেকে নেমে বসেছিল জানলায়।
এত ভীরু এত বিনীত কেন যে! এরাই তো ছিল খাস
সমুদ্র-জয়ী সীতা-সন্ধানী সেতুবন্ধের সঙ্গী;
দীন সজ্জন সাহসী উৎসাহিত
মজুরেরই মতো ভঙ্গি।

এরা কেন ভয়ে ডালে ডালে ঘোরে আজ?
এরা কোনোকালে করে নি তো লাফঝাঁপ
রামরাজত্বে সরকারি রামদাস!
যদিচ এদেরই কোমল অঙ্গে পাঁচ-আঙুলের ছাপ।

অনেক যত্নে নামিয়েছি আজ গাছ থেকে জানালায়
ভাবছি এখন কী করে বাঁচাব এদের এ বিশ্বাস?
হোটেল ছাড়ার সময় হয়েছে প্রায়॥

২৭ ফেব্রুআরি, ১৯৬৪

মৃত্যুর বিশ্রাম চাই

...there on Avon, or any other stream...

E. A. Robinson

আমিও চূড়ান্ত ক্লান্ত, মুমূর্ষায় আমার তিক্ততাও
ডুবে যায় টাইমনের লবণাক্ত ফেনিল ঘৃণায়,
অন্ধ মূক চতুর্দিকে লিঅরের অন্তিম রিক্ততাও,
কেবা চোর কে খুনে কে দন্ডধর সে জ্ঞান বিনাই
হ্যামলেটেরা অপঘাতে রোজ মরে, এ সংকটে কোথা
মরণের বীজকম্প্র মাটি—কোথা ভস্ম প্রাণময়?
নির্মনন লুব্ধ মত্ত বিকারে কে কার যজ্ঞে হোতা,
জীবনের দাহে কার হবি? এ তো মরণেরও নয়।

পথে ঘাটে জমিহীন জন্-রিচার্ডেরা ভিড় করে
নব্য নব্য কিন্তু নিত্য চতুর ইতর আবিষ্কারে।
তিক্ততাও পরাজিত, নিষ্প্রাণ নৈরাশ্যে রুদ্ধস্বরে
মৃত্যুও মরেছে জানি জীবন্মৃত দাঙ্গার ধিক্কারে!

লুপ্ত আজ স্বর্গমর্ত্য, নরকে আমারও নেই বাসা।
অথচ দেশের নদীস্রোতে চির মিরাণ্ডার আশা।
৯ এপ্রিল, ১৯৬৪

অভিজ্ঞ চুক্তিতে

পাহাড়ে পাহাড়ে চোখ, মনের নন্দন
দিগন্তের ভূতাত্ত্বিক তরঙ্গ-বিস্তারে—
একথা আজন্ম সত্য। কিন্তু অসীমের
এ কী নেতি পাহাড় গড়েছে! মহাকাশ
দিনরাত্রি দৃষ্টিহীন, খাড়া একেবারে
সামনেই উঠেছে শিলা, বেঁধেছে বাতাস
কখনও গরম কিংবা কখনও হিমের
অন্ধকার চাপা ভারে। নিঃশব্দ চিৎকারে
চৈতন্যে পাথর গড়ে পাহাড়ি বন্ধন।

অথচ সফেন ক্ষিপ্র সর্বদা মুখর
সমুদ্রের শূন্য থেকে চেয়েছি রেহাই।
এসেছি ঐতিহ্য ঘুরে হরিতে উর্বর
ঊষরে শ্যামল দ্বন্দ্বে মনের নন্দন,
সীমার অসীম চেয়ে। বেসেছি যে ভালো
নীলের স্বরাজ, সে কি অরণ্যে রোদন
মাত্র, হে প্রকৃতি, বলো? হৃদয়স্পন্দন
তুলি নিজেরই হৃদয়ে, স্পন্দিত পাথর।

ক্রন্দসী, জীবন দাও আরেক মুক্তিতে,
আরেক বন্ধনে প্রাণ। অভিজ্ঞ চুক্তিতে
এবারে সর্বস্ব দিই। মাটি দাও, আলো,
খেত মাঠ টিলা দিঘি নদী, লাল-কালো
মাটি দাও। বিস্তারেই শোনাব তেহাই॥
২৭ জুন, ১৯৬৪

স্বর্গ-নরক

স্বর্গ নেই, নরক আছে শুধু ?
পৃথিবী নেই ? আছে মানব জীবন ?
স্বর্গ নেই, তবুও কেন নরক
চতুর্দিকে সত্য দিনে রাতে ?

স্বাধীন দিন মারীতে কেন ধুধু,
কাজের ভিড়ে অভাব কেন মড়ক ?
সঙ্ঘ যারা গড়েছে সংঘাতে
তারাও কেন চোরার ভয় ধরে ?

মন কি শুধু আধি, যেহেতু ঘরে
আড়াল থেকে কালদূতেরা চরে ?
মরুস্বর্গ কাদের কল্পনা ?
সবিতার কি অন্ধকার খড়্গ ?

সবাই জানি, সবাই আধুনিক,
স্বর্গ নেই, বেশ, তাহলে নরক
চেপেছে কেন কয়েক কোটি ঘাড়ে ?
অথচ, বলো কয়জনা বা বণিক ?

কয়জনা বা তখ্‌ত্ তাউসে চড়ে ?
কয়জনা বা বাজারে গাজে চড়ক ?
স্বর্গ নেই ? স্বর্গ আজ লুনিক,
মর্ত্য আজ মুঠি না হোক জ্ঞানে,

স্বর্গ গড়ে মানব মনে-মনে।
তবুও কেন কয়েক কোটি জনের
আজকে বাঁচা কাদায় দিন-গোনা ?
নরকই বুঝি সত্য, কোথা স্বর্গ ?
স্বর্গ বিনা নরক মানব না
স্বর্গ আজ বুকের গোনা হাড়ে।
২ জুলাই, ১৯৬৪

ধলেশ্বরী

এখনও শানাই শুনি, সন্ধ্যার সিঁদুর
গোধূলির বিধুর ললাটে জ্বলে।
আমারও হৃদয়ে আভা,
শুধু দুই চোখে অন্ধকার কালো মুমূর্ষু পাহাড়
নীল ঢাকে, লাল ঢাকে।
চোখের শিকলে আকাশবাতাস স্নায়ু বন্দি
এবং মধুর পূরবীও যেন ক্রীতদাসী, ঘরবাড়ি নেই।

গর্তের দপ্তর থেকে খেতের ইঁদুর দিগ্বিজয়ী রোঁদে ঘোরে,
পাথরের গদি থেকে খামারের হুক্কাদের ডাক আসে।
হৃদয়ে না, চোখে কানে স্নায়ুতে কলুষ লাগে,
অশুচি অসুস্থ ব্যাপ্ত অস্থির বিকৃতি।

তবুও শানাই শুনি, গোধূলিলগনে যথারীতি
এখনও সিঁদুর শূন্যে জ্ব'লে জ্ব'লে ঝ'রে গ'লে পড়ে।
অথচ নীলিমা বন্দি কালো মরা পাথুরে পাহাড়ে।
এবং মাড়বা মালকোশ এরা রাজন্যের ক্রীতদাসী-ক্রীতদাস।

অঙ্ক. খুঁজি চেনা মুখ যার পরনে ঢাকাই শাড়ি,
কপালে সিঁদুর, ধলেশ্বরী।
কোথায় সে শুকতারা অন্তরঙ্গ সেই আশাবরী ?
৩ জুলাই, ১৯৬৪

যদি উদ্ভিদে মানুষ হওয়া যায়

অথচ অদৃষ্ট ভোলা দায়।

পোড়ো বাড়ি। গাছ নই, তবে
মৃত্যু কেন জীবনে বিভোর ?
চতুর্দিকে কালো ছায়া ঘেঁষে
মৃত্যু যেন বহু ছদ্মবেশে।
অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি ঘোর,
মাটি পচা, শবদগ্ধ দেশে

চেরাপুঞ্জি সাহারায় মেশে।
এ দুঃখে সাধুও বুঝি চোর!

এ দুঃখের জট খোলা দায়।
তবু বীজে শিকড়ে পল্লবে
মৃত্যু নেই অশ্বিষ্টের বটে
অথবা অশ্বত্থে, এদের যে
ব্যাপ্তি চলে জীবন্তের স্তরে।
ভাঙা বাড়ি, তবুও কী ধৈর্যে
বৃক্ষ স্তব্ধ গম্ভীর সংকটে
পচা ইঁটে ছাদের পাঁচিলে।
সাময়িক আঁস্তাকুড়ে মাঠে
প্রকাশ্যে প্রচ্ছন্ন নিম্নমানে
বেড়ে চলে উদ্ভিজ্জ মিছিলে।

নিজের শতাব্দী বট জানে
সে মরে না পঞ্চাশে বা ষাটে,
যতই না পাতা পুড়ে খাক্
ডালপালা গলে কুম্ভীপাক,
শিকড়ের অভিযান ইঁটে—
জীবনের আত্মবহা দায়ে,—
মাথা কুটে পাঁচিলে দেয়ালে,
কপালে হাজার কালশিটে,—
যদি কোনো সহায় শৈবালে
উদ্ভিদে মানুষ হওয়া যায়॥
১৪ জুলাই, ১৯৬৪

ধূসর আভা

অন্তত শ্রাবণ আছে দেশে.
আজও বৃষ্টিতে অঝোর কান্নাই ; তারপরে
নীল, শুচি, উত্তীর্ণ আকাশ আসে ঘরে ;
এবং সূর্যাস্ত তার সাতরঙে অভিরাম ঐক্যের আশ্লেষে
আস্তিক সৌহার্দ্য লেখে দৃষ্টিতে চৈতন্যে আঁকে

দিনের অক্ষয় গান : ইতি, এই ইতি,
আদিগন্ত অস্তিত্বের দীপ্ত ইতিহাস।

দেখেছি মেঘের ভিড়ে রৌদ্রে অন্ধকারে এই রুদ্ধ বেগ,
আর ক্ষিপ্র সচল সঘন ব্যাপ্তি, পশ্চিম বিষাদে দেখি
বিরাট ভাস্কর্যে নীলের ধূসর সত্তা, মর্মভেদী আভা,
সংহত ভাস্বর, বিস্তৃত অথচ তীব্র
আবেগে জঙ্গম কিন্তু একাগ্র গম্ভীর
—একাধারে আকাশে আবৃত গৌরীশৃঙ্গ বঙ্গোপসাগর,

স্পন্দিত উজ্জ্বল ধূসরিমা !

অন্তত এখনও আছে কলকাতায় মৃত্যুঞ্জয় শ্রাবণ আকাশ,
এখনও চৈতন্যে আছে আবিশ্ব আকাশে ঘনঘটা, স্বদেশী শ্রাবণ ;
আর এই ধূসর আভার তীব্র ঐশ্বর্যের মৌলিক মহিমা,
মানবদৃষ্টির স্বীয় বর্ণালির স্বাধীনতা, স্বাধীন মনন,
আর ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত দীপ্র প্রতিভাস ॥
১৫ অগাস্ট, ১৯৬৪

অভ্রংলিহ এক বিদ্যায়তনে চিন্তা

এখানে হাওড়ার হাট ।
ভুল হল ? শোনপুরের মেলা । গোরু মোষ হাজারে হাজারে ।
ভুল হল ? তাহলে বিদ্যার ঘাট, গঞ্জ, জ্ঞানের প্রাসাদ
অথবা আশ্রম ! বহু বৃদ্ধ তপস্বীরা লেনদেন বেচেন-কেনেন
খানদানি মার্জার বাজারে ।
হৃষ্টপুষ্ট কণ্ঠস্বরে ফুটি-ফাটা কংক্রিটের ছাদ—
ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস্,

তবু জল পড়ে, তাই বৃষ্টিজল, আকাশের সন্তপ্ত অশ্রুর ।
জল পড়ে । পাতা নড়ে । আর তারপরে ?
তারপরে গোপালের ভাঙা ঘরে বর্ণপরিচয় করে
প্রবল সহাস সূর্য, দমকে দমকে ধরে
স্বয়ং সূর্যের হাসি—আমাদের আনত বন্ধুর !

রাখালেরা সরব এখানে,
আর ভুবনের বউ নাকি চেয়েছে ডিভোর্স !
১০ ডিসেম্বর, ১৯৬৪

কোনো যুক্তি নেই

তাই বুঝি ? কোনো যুক্তি নেই ?
প্রেম তবে অন্ধের এবং
বধিরের অপ্রকৃতিস্থতা ?
বাস্তবিক যা নেই, বা যে নেই,—
যারা নেই—অবিরাম তাই
ভেবে যাওয়া চাওয়াও তাকেই
মানবিক ইচ্ছার রিক্ততা,
যেমন কিছুতে মুক্তি নেই
যাবজ্জীবন দণ্ডিত
গদিয়ান মান্য আসামির ।

অথবা বলবে কি, বরং
ঈশ্বরের স্বর্গময় দেশে
ভাগ্যবান সাযুজ্যকামীর
অন্তহীন ঈপ্সার ব্যথাই
এই ক্ষেত্রে তুলনায় মেশে
আলিঙ্গনে, যে সদাবঞ্চিত
সে হারায় দৈনিক বিজ্ঞতা
বৃথা করে নীতিকথা রপ্ত ।

অথচ এখনও চেয়ে চেয়ে
রাত্রি যার সূর্যোদয়ে ভোর,
সদ্য সুস্থ স্বর্ণাভ রক্তিম ।
দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা
প্রতি স্বচ্ছ সূর্যোদয়ে তপ্ত,
আবার যাত্রায় মাতে ধেয়ে
একই লক্ষ্যে, জরিষ্ণু কিশোর,
একই অঙ্গে আগুন ও হিম ।

তুমি বলো কোনো যুক্তি নেই ?
অথচ দিনের সঙ্গী রাত্রি
উষ্ণ হৃৎস্পন্দে, চিরতৃষ্ণ
অন্তে আদি মৃত্যুময় দ্বন্দ্বে
প্রাণ পায় ! কেন মুক্তি নেই
পৃথিবীর আকাশের বন্ধে ?
প্রতিটি সকাল বরযাত্রী
যে তীর্থে প্রত্যহ্ মরে রাত্রি ।
প্রৌঢ়ত্বের অম্বুবাচী ছন্দে
নীলাচলে ডোবে কেন কৃষ্ণ ?
মার্চ, ১৯৬৫

তবে কেন

দেখি সমতলে একাকার,
তৃণাদপি সুনীচেন অভিন্নহৃদয় ।
নিরাকারে সবই বুঝি বাস্তব সাকার ?
ভাবি হৃদ্যতায় হল সর্বজীবে ত্রিকালবিজয় ।

তবে কেন, অভ্যাসের প্রত্যন্তপ্রান্তরে এই, কার হাহাকার ?

দীর্ঘ অনুষঙ্গে গড়া বিষঙ্গের ক্ষয়,
যে গঠনে লাভ আর ক্ষতি
ওষ্ঠ ও অধর, কিংবা দুহাতের অভিন্ন বলয়,
এক আর একে দুই এক আত্মরতি
মনে হয় সম্মিলিত দ্বিজের সংহতি ।

মুক্ত সমতল মনে আচম্বিতে কেন রক্তে বেঁধে কাঁটাতার ?
৩ মে, ১৯৬৫

ত্রিবেণী সঙ্গমে

যখনই তাকাই তার মুখে, দেখি ভুল ক্লান্তি ভ্রান্তির শোচনা !
অথচ তাকেই দেখা সমস্তজীবন ; দেখি—হার মানে, হার মানি,
কার কাছে কিসে হার, তার ? না আমার ? বদ্ধপাণি
জীবনের কাছে ভুল ? কতশত হেত্বাভাস জানে গোরোচনা !

অথচ কোথায় হার ? হারজিতেই এক জ্যৈষ্ঠে শীতে জয়পরাজয় হয় সূর্যে-খাঁটি ;
কারণ নির্মাণ দৃপ্ত লুকসরে বা মহেনজোদারোয় কিংবা ফতেপুরে,
দীন ইলাহিতে যদি ভাবো, তবেই স্থাপত্য বাঁধে স্বপ্নে ঘাঁটি :
না ভাবলে কষ্টির বা বেলে-র জঞ্জাল ;
কালের ঝাড়নে শুধু ভুলের ভগ্নাংশ, ধুলা।
প্রেম বলো ঘৃণা বলো সর্ববিধ অশ্বত্থঅঙ্কুরে
লোভ ঈর্ষা অভিমান যাই বলো সমস্তই চলমান
আদি অন্তে অচেতন অহমের নিজস্ব কঙ্কাল।
হয়তো বা অসতর্ক কাব্য হল, তবে বলি—ত্রিবেণী-সঙ্গমে
ভেসে চলি প্রতিদিন ফুল, ধুলা, ছাই, মাটি ॥

৫ মে, ১৯৬৫

যখনই তোমার সত্তায় রৌদ্র লাগে

যখনই বাস্তবে দেখি তোমার সত্তায়
রৌদ্র লাগে, কণা-কণা সূর্য ওড়ে চোখের তারায়,
তখনই তোমাকে খুঁজি,
দূরে, আকাশের গায়ে, মনে, উন্মুখর গানে,
বইয়ের পাতায় খুঁজি দেখি ছবি, মূর্তিমতী ছবি,
পটে লিখা ছবি।

আর প্রশান্ত আকাশে চোখে মনে মুক্তির নিঃসীমে
বর্ষার আষাঢ় আর আশ্বিনের পরে শুচি হিমে
গ্রহতারারবি গান করে হেমন্তিকা তোমার সত্তার
যথার্থ আখর।

তোমার প্রতিমা পাই তিলেতিলে, বক্ষে বক্ষ, অকপট
চোখে চোখ আলেখ্য-র বিশুদ্ধ নৈকট্যে সত্যে যোগাযোগে,
আর পাই দূরায়িত বিরাটের পটে আধৃত আকৃতি,
গুণে ভাগে আর বিয়োগেও,
তোমার প্রাকৃতে নিত্য আনন্দের সত্তার ভৈরবী
মানবিক প্রকৃতির। —যেমনটি সম্প্রীতির রীতি ॥
৫ মে, ১৯৬৫

ঈপ্সা

Our roles are always future: Sartre: The Problem of Method.

তন্বী চপলা বা পূর্ণ নারীতে
দয়িত চিরকালই ঈপ্সা-দীপ্র,
রঙিন ডুরে আর কস্তা শাড়িতে
হৃদয় চিরকাল পরিতৃপ্য।

এবং পৃথিবীতে—যে দেশ সবাকার—
আনত চোখ রাখি তৃষায় ক্ষিপ্র।
এবং শেষ চোখে আপন বিধবার
শুভ্র বেশে এ কী গরিমা তীব্র!

৫ মে, ১৯৬৫

বাছা কতটুকু জানে

তন্বী সে যে! আহা বাছা কতটুকু জানে!
মোহিনীর প্রচ্ছন্ন পাহাড়
হৃদয়ে মন্থিত শিলা। যদি পঞ্চশর তাকে হানে
তাহলে অতনু ভস্ম, চূর্ণ চূর্ণ হাড়
পথের হাওয়ায় উড়বে কিংবা ভিজবে নিজেরই উঠানে।

বৃদ্ধেরা কীই-বা জানি নিজেদের?
তন্বী আহা! কীই-বা সে জানে?
অসাড় সত্তার ক্ষমতার দুরন্ত পাহাড়
হৃদয়ে ঘুমন্ত তার, সে যে ভাবে রূপের বিজ্ঞানে
তার মায়া বিশ্বজয়ী, সে যে ঘোরে আগ্নেয় জিদের
স্বপ্নঘোরে, আজও তার ব্যক্তির স্বরূপ আহা ভেঙে গড়ে হাড়॥

৫ মে, ১৯৬৫

একটি অসম্পূর্ণ কবিতা

পঙ্গু অকর্মণ্য ভালো, সোজাসুজি অসৎ পীড়িত—সেও ভালো,
এই কথা ভারতের একমাত্র জীবন্ত সাহসী দল বলে,
সেদিন রাত্রি-টা যবে আমরা কয়েকজনা কাটাই জঙ্গলে
আগুন নিভিয়ে, শুধু জ্বেলে লক্ষ গৃহহীন নক্ষত্রের আলো।

হালুমেরা বলে : তারা হিট্‌লরের শিষ্য নয় অথবা মুসোর,
ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলে : ফুটোফাটা আছে, থাক পাঁচিলে দেয়ালে,
সেই ফাঁকে মুক্তি পাই আজও তাই—পায় বটে শকুনে শেয়ালে,
মালুম ওদের দৌড়—চুপি চুপি কাটা মড়া ঘাঁটা বড় জোর ॥
৬ মে, ১৯৬৫

হ্যাঁ মন আর দেহ

হ্যাঁ মন, মনেই থাকে পাহাড়পর্বত, হিমবাহ, উৎরাই-খাড়াই, সোজা
মৃত্যুর শিখর ।
আর দেহ, দেহ গঙ্গা, সাতনদী, বস্তুত সমুদ্রও,
অনেক সমুদ্র, মহাসমুদ্রই, প্রশান্ত, কখনও বা অতল অস্থির, ঝড়ে নীলকণ্ঠ রুদ্রও,
উদ্দাম উত্তাল সর্বনাশা, কখনও বা মলয়ের লবণাক্ত সফেদ শীকর
সফেন শীতল খুশি ছড়ায় সর্বাঙ্গে, মনে প্রসাদ বিছায় মোহিনী
বা হৈমবতী পার্বতীর বাহুবন্ধ স্বেদ.
আরাম, আনন্দ, শান্তি । সর্বাঙ্গে মনন আনে, যে বিশ্রামে দেহ
আর মন এক মূর্তি
খোদাই আশ্লিষ্ট ছন্দে, যে লাবণ্য মুক্তাটিকে, দুহাতে, ঝিনুক শুক্তি
ফোটায়, তেমনি । কিন্তু তুমি কেন থাকো মধ্যপ্রদেশের কোনও
অগস্ত্যপ্রান্তরে, ধুলার মরুতে দগ্ধ অমরকন্টকে
সমুদ্রপর্বতে তাই হাহাকার, ভূলোক দ্যুলোকে দেখ মৃত্যুহীন অনন্তের খেদ ॥
২২ জুন, ১৯৬৫

স্বপ্নেই আরোগ্য আজ

স্বপ্নেই আরোগ্য আজ
আরাম, আনন্দ, শান্তি ।
তাই উত্তীর্ণ জ্যোৎস্নায় স্থির ধীর নীলিমায়
পূর্ণ হেমন্ত হাওয়ায় ক্লান্তিলগ্ন হৃদয়েরা চায়
স্বপ্নের স্ববশ যুক্তি
মানসের মুক্ত এক সাংগীতিক কড়িকোমলের নব্য ন্যায়ে
কবন্ধ কুবের বাস্তবের অতিকায় রূপান্তরে
পুনর্নির্মাণের স্বাধীন বিন্যাসে সংযোজনে স্বকীয় সীমায় ।

খেদ শুধু এই : জীবনমরণ-মানা স্বপ্নের অভ্যাসে
থেকে থেকে আসে দুঃস্বপ্ন এবং

ঘুম ভেঙে যায় প্রায় বুকে-চাপা মৃত্যুতে অসাড় ;
সমস্ত শরীর নীল-রং এমনকী স্বয়ং চৈতন্যও রুদ্ধশ্বাস
না-জীবন-না মরণ অন্ধ
শূন্যের ময়াল নাগপাশে ॥
২৬ জুলাই, ১৯৬৫

বিবিক্তি

বরং এই ভালো, এ বিবিক্ততা ।
মুখর বসতির প্রতিটি ক্ষণে
গায়ে গা লাগে, তবে অসাড় মনে ।
অথবা কালো কাদা মাটির বাটে
ধানের শীষ দেখা হিজলবনে
কিংবা শ্যাওলার গন্ধময় ঘাটে ।
হৃদয়ে পুড়ে যাক অঝোর তিক্ততা ।
এখানে লাল মাটি পাথর ধসা,
কাঁকরে চাল কোথা ? শণে বা পাটে
দুস্থ শ্বাস নয়, বিবিক্তিতে
উষ্ণ শুচিতায় শুকনো হাটে ।
এখানে পৃথিবীই নিত্যব্রতা
নিরম্বু প্রায়োপবেশনে ফাটে ।
অশ্রুহীন ডাঙা অজেয় মনে ?
আমার ভালো লাগে, একই যে দশা ॥

স্রোত চলে সূর্য জ্বলে

ফুল নেই, কিবা রক্ত কিবা শ্বেতকরবীর ঝাড়ে ।

তবুও চোখের পাড়ে বহু মুখ যায় আসে যায় ।
কারও মুখ স্রোতে ক্ষিপ্র অবয়বে নানান্ আকার,
সূর্যের ধারালো রশ্মি কারো কারো অষ্টধাতু মুখে
ঠিকরায় মুহূর্তের প্রান্তরে সাকার ।
স্রোতস্বিনী স্বচ্ছ তীব্র গতির শুদ্ধিতে
সারা ইন্দ্রিয়ে বুদ্ধিতে আমাকে আকণ্ঠ ধরে স্মৃতির ধারায় ।
ত্বরিত সাগ্নিক সূর্য আমাতেই মগ্ন, একাকার ।
তাই দীর্ঘায়ু সংবিৎ ব্যাপ্ত পৃথিবীর পাড়ায় পাড়ায়,

শত মুহূর্তের এক শুচি লগ্ন অস্তিত্বের শোচনাবিহীন
নিঃসংকোচে ভেঙে চলে পরিখাপ্রাকার।
যেমনটি স্রোত চলে, সূর্য জ্বলে।

ঘুমভাঙানিয়া ওগো দুখ-সুখ-জাগানিয়া বলো
কে কার? কী কার?

অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

সাবেক মেঘের গান

এখনও মেঘলা হাওয়ায় উধাও প্রাণ
শমীপ্রান্তরে ঘন কদম্ববনে,
ভাদ্রমাসের ভরা বাদলের গান
যমুনার চির ভারতীয় শ্যাম তৃণে
তৃণময় আহা প্রাণময় মরকতে।
অথচ এ যুগে আমরা দগ্ধ দীর্ণ।

এখনও ইন্দ্রনীলের মেদুর মন্দ্রে
মনের মুক্তি মর অলকার শহরে।
উর্বশীদের ক্ষণিকের ভোলা ছন্দে
উন্মনা এক মেঘমদনের প্রহারে
হৃদয় নাচে রে মল্লারে বাঁধা গতে।
অথচ আজকে রাজধানী শতছিন্ন।

মেঘের সাবেক ময়ূরের বেগে নামুরে
হৃদয় পালায়; নাকি মিথিলায়, লছিমা?
কিংবা নানান রঙে ঘনীভূত অম্বরে
কৈলাসেই কি হৃদয়ের নীল উপমা,
পার্বতীপরমেশ্বর সেই পর্বতে?
অথচ এখানে জীবন শীর্ণ জীর্ণ।

আজকে ভালোর-মন্দের বুঝি ভেদ নেই,
মেঘমালাদেরও কণ্ঠে উড়েছে ধুলা।
আজকে কি কারো শত গ্লানিতেও খেদ নেই?
নদী পঙ্কিল, বজ্র ও দিক ভোলা,

গৌড়জনেরা বুভুক্ষু রাজপথে।
প্রেমের প্রজ্ঞা তবু মেঘে উত্তীর্ণ॥
২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

এই দেশে শীতেও সবুজ বাঁচে

এই দেশে শীতেও সবুজ বাঁচে।
চেয়ে থাকি মাঠে,—এই দেশ!
ঘাসে লেগেছে পীতের পাকা জ্বলা কড়া রং,
খেতের সবুজে জেগেছে সোনার চড়া রেশ
মরা সোনা খাদ সোনা।
দেখে যাই চোখের স্বস্তিতে
জানাশোনা দেশ, চেনা রং।
চেয়ে থাকা মনেরও আরাম।

স্তরে স্তরে বৈকালী উষ্ণতা কমে,
হিমের ইশারা নামে,
ঘাসে নামে ধানছড়া কোমলতা,
বাগানের বন্যকরবীতে লাল, আর
চালদার চিকন চুনটে এই আলো এই ছায়া,
বাগানে গোলাপ নেই, চাঁপা গেছে,
বৃদ্ধ বেলগাছে নিস্তব্ধতা যেন কারো হাতে গড়া থামে

হিমেল আরামে রঙিন বিহ্বল পথে
সৌন্দর্যের পাণ্ডুর হাতছানি।
টিলার ঢালুতে দেখি উজ্জ্বল পাটল,
জ্বলজ্বলে চার চোখে, লেজফোলা
দু-ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বুভুক্ষার কৌতূহলে
নিষ্পলক একজোড়া অস্থির শেয়াল,
তারপরে মুহূর্তে পালায় খাদের তলায় প্রচ্ছন্ন বাসায়

আর টিলার চূড়ায় দেখি সূর্যের সপ্তাশ্ব ছোটে
পশ্চিমের দিকে,
অভীপ্সার মরমিয়া সন্ধ্যা রাত্রি বেয়ে ছোটে,—
কোথায় সকাল!

আর মাঠে মাঠে, অড়র কুলথি সর্ষে খেতে খেতে
পাহাড়ে পাথরে ফুটে ওঠে

সবুজের সন্ধ্যাহ্নিকে আকাঙ্ক্ষার আশা
অশ্বত্থে পলাশে বটে—এবং স্থানীয় মহুয়ায়
ঝাঁকে ঝাঁকে হরিয়াল স্তব্ধ রুদ্ধ কানে
অস্পষ্ট অদৃশ্য পাতায় পাতায় শোনে তার ভাষা—
এই দেশে কী করে জীবন বাঁচে কী করে বেঁচেছে এতকাল,
উঠে আসে সন্ধ্যাতারা, একটি তারকা, যে ভালোই জানে।
৬ নভেম্বর, ১৯৬৫

মহাসুখে আছে নীলাকাশ

ভাবো বুঝি, আকাশে নিশ্চিত স্বস্তি, নির্বিরোধ
অশ্বত্থ নিস্তব্ধ শান্তি, স্থির ব্যাপ্তির স্বাচ্ছন্দ্য ?
ভাবো, মহাসুখে আছে নীলাকাশ
স্বায়ত্ত শীতল শূন্যে ?
ভেদাভেদ, দলাদলি, ঘরে পথে ঠেলাঠেলি নেই ?
প্রতিযোগী উষ্ণ স্বেদ হৃদয়ে লাগে না, ভাবো ?
ভাবো, আকাশই আনন্দ ?
তোমার মতোই আমিও ভাবতুম তাই। ভেবেছি সেদিনও।

আকাশে অসংখ্য সূর্য, মহাসূর্য, তারা, নীহারিকাপুঞ্জ,
হয়তো বা অনেক ব্রহ্মাণ্ড, দৃশ্যে আর অদৃশ্যেও
যা হৃদয়ঙ্গম করাও কঠিন সম্পূর্ণ মৃত্যুর মতো
অথবা জীবন।
গণনার অতীত জ্যোতিষ্ক,
অগ্নিপিণ্ড অনায়ত্ত অচিন্ত্য প্রবল,
সচল, সক্রিয় একা-একা আর পরস্পরে,
জন্মমৃত্যু নিয়ন্ত্রণহীন,
অমানুষিক আবেগে বর্বর নির্মম আত্মদাহী বিশ্বগ্রাহী।

তোমার মতোই আমিও ভেবেছি অবিরত
স্তব্ধ বৃক্ষ
যদিও বা উর্ধ্বমূল নীলাকাশে স্থির সনাতন।
কিন্তু বিনিদ্র আগ্নেয় মহাশূন্য এ হৃদয়,

পার্থিব শরীর।
গণিতের অগম্য জঙ্গম-হৃদয়ের আকাশই উপমা,
শতচ্ছিন্ন অশ্রুময় সহস্র শিকড় অস্থির আমার
এ হৃদয় ইতি-নেতি উদ্দাম উধাও অগ্নিবাষ্পময়
শূন্যে শূন্যে।
১৩ নভেম্বর, ১৯৬৫

জলচল পাথর

এ কি শুধু মুক্তির উল্লাস?
দৈনিক সংবাদ থেকে দুর্লভ দুর্মূল্য থেকে
মিথ্যা ও ইতর থেকে পলাতক দিনের উল্লাস:
এখানে পৃথিবী ভিন্ন, স্বতন্ত্র আকাশ,
কে পৃথিবী কে আকাশ একে অন্যে দুই একাকার!
যেমন, কখনও কখনও মুহূর্তে শিশু ও জরিষ্ণু মেলে
গঙ্গাযাত্রী একটি যৌবনে।

এখানে বলাকা শাদা ঝাঁকে খরগোশের মাঠে ধীরস্থির,
পলাশে পলাশে ছোটে মুখর তিতির,
সর্ষের চকিত সোনা জ্বেলে দেয় বিস্তৃত হরিৎ।
আর, সূর্য কি তরল হল জলে?
শীতল রৌদ্রের স্নানে সুখময়
নাতিশীত জলধারা অঘ্রানের গরম পাথরে।

কিন্তু পাথর কোথায় আর জলই বা কোথায়?
পাথর কি বিগলিত শিশুর মতন
অথবা কি যুবার মতন দেহসর্বস্ব চঞ্চল?
মনের আদরে সোহাগী চঞ্চল জলও কি পাথর?
আমরাও কি একাকার পরস্পর এবং প্রত্যেকে
পাথর; পাথর আর জলে জলচল?
১৭ নভেম্বর, ১৯৬৫

কী বিশ্বাসে পেল এ নিশ্চিতি

এদের দেখি ও ভাবি,
জানি না কোথায় শেষ।
এসেছে নদীর নীড় ছেড়ে দুইজনে।

অতীত নোঙরহীন, বর্তমান
শুধু ভবিষ্যতে বুঝি চারহাত ভরে।
যখন জোয়ার ওঠে মোহানায় তখন এরাও
টলোমলো করে, আর নৌকা তালে তালে রঙ্গে দোলে
কানায় কানায়, আর একমনে এরা মাছ ধরে
যেন মাছে জীবন বা জীবিকাই।
দুঃসাহসী দুজনকে দেখি আর প্রশ্নে ভাবি
নদী ছেড়ে আঁকাবাঁকা খালে কী বিশ্বাসে পেল এ নিশ্চিতি
আমাদের গঙ্গাই পঙ্কিল ক্ষীণ মুমূর্ষায়।

আর এখানে কি দুপাড়ের সম্বন্ধ-সম্প্রীতি নিকট স্পর্শের
স্থায়িত্বের প্রসাদের দাবি সম্পূর্ণ মেটাবে ?
কী দ্বৈতে কী দ্বৈতাদ্বৈতে সবই সংলগ্নতা চায়
এই নদীমাতৃক বাংলায়, আমাদের নাটমঞ্চে সহস্রের
মেলায় বা সহস্রের রাসে।

২৪ নভেম্বর, ১৯৬৫

এ নদীকে চেন তুমি

এ নদীকে চেন তুমি। ফুলে ফুলে প্রচণ্ড আবেগে
বিধ্বস্ত পাথর ভেঙে ছোটে দুই কূল ভেঙে
গেরি জল মাটি জল ঘন জল,
পাতালগভীর, অদৃশ্য অতল, যেন জেগে ওঠে কোনো
দামিনীর উদ্দাম শরীর।
ছায়াগাঢ় সজল আকাশে যেন
যন্ত্রণায় স্তব্ধ স্থির ভেজে কোনো শ্রীবিলাস।

আর আজ নদীকে দেখেছ ?
অঘ্রানের অপরূপ প্রখর আকাশে
স্বচ্ছ নদী, উপরে ও তলেতলে প্রায় এক,

সোনাখচা বালিদেখা সূর্যের মতন
স্রোতে স্রোতে মাছ খেলে, সারসেরা মন্থর উৎসাহে ।
আজকে সে যৌবনের বন্যা এক বিশুদ্ধ হৃদয় ।
এবং স্মারক মন রিক্ত অভিলাষে স্বচ্ছ
নিসর্গে সমাজে রৌদ্রে হিমে মননের আতসি-তে আবিশ্ববিস্তৃত ॥
২৩ নভেম্বর, ১৯৬৫

দৃশ্য একই

সেই পরিচিত দৃশ্য ।
রাবীন্দ্রিক কবিত্বের মত যৌবন প্রবল সফেন মন্দ্রিত
অস্থির সমুদ্র, নীল, ফিরোজা, সবুজ ।
আর রৌদ্রজ্বলা পীত বালি, রাশিরাশি, ভঙ্গুর, উড়ন্ত,
ত্রিকালের অশেষ তৃষ্ণায় ঝুরুঝুরু ।
আর, নাহলে স্বেদাক্ত মসৃণ কাঠিন্যে আধৃত ।
আর, দূরে নিরক্ষীয় উষ্ণ ঝাউবন ছায়ায় মুখর,
আর, ভিজাভিজা হাওয়া
আর এরা, অবুঝ তরুণ দুইজন ।

দৃশ্য সেই একই আজও ।
তবে ভাস্কর্যে না, ভারতীয় চিত্রকলা, জলে-জলে ধোওয়া ।
সূর্যের মন্দির আজ যবক্ষার, শুধু রৌদ্র
সমুদ্রের অবিরাম নীল আর্তনাদে নিঃস্ব দুর্নিবার ।
আর, নিরম্বু বালির ভূতপত্রী তেপান্তর ।
আর, দূরে সেই বাণিজ্যকাতর বৃদ্ধ প্রাচ্য ঝাউবন ।
শুধু, বালিয়াড়ি নিরুদ্দেশ, ঝড়ে ঝড়ে সমতল ।
আর, সমুদ্রের নয়, এক অন্তর্দেশী জঙ্গলের
গ্রামগ্রামান্তের কিংবা পূতিগন্ধ শহরের মফস্বল হাওয়া ।
আর উত্তরায়ণের সূর্য ।
আর একা একজন ॥
২৩ নভেম্বর, ১৯৬৫

বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ

হাওয়ার স্রোতে আলোর ঢেউয়ে
হঠাৎ ভেসে আসে,
আলোয় আর হাওয়ায় ঘর দোলে।
কথায় ঝরে ক্ষণে ক্ষণে
শিউলি জানলায়।
অভিজ্ঞতা নেই তা নয় অপর পক্ষের,
তবুও মন ভোলে,
মগ্ন হয় কৈশোরকে, চিরন্তনে বানায়
মুহূর্তের বর্তমান।
চোখের দুটি চাওয়ায়
জানায় কেন শরৎ মেঘ হালকা হাসি ছড়ায় হিল্লোলে।

হঠাৎ যায়।
মেঘের স্বাদ চারিয়ে যায় হাওয়ায়।
গাছতলায় জমাট বাসি শিউলি রাশিরাশি।
দুই দিকের দরজা খোলা, কোথায় গেল চলে
অন্দরে না দেউড়িপারে?

আলোও দেখি পালায়॥
২৫ নভেম্বর, ১৯৬৫

তাই কি সেকালে

এ পক্ষের জুগুপ্সা প্রবল ;
ভাবে ওই প্রতিপক্ষ নিতান্তই পথের কুক্কুর।
অবশ্য সম্প্রতি সে কয়েকজন ছাড়া সারা মনুষ্যসমাজে
প্রায়শই দেখে থাকে কুকুর বিড়াল,
ইতর, সর্বদালুব্ধ, সততা বা ষত্বণত্বহীন,
ভ্রষ্ট, নষ্ট, মানবিক সুতরাং ভয়ানক জানোয়ার,

হন্যে দিয়ে ঘোরে যত্রতত্র সকালবিকাল।

ধর্ম নয়, মোক্ষ নয়, এমন কি অনেকেই এরা
অর্থও না, শুধু রতিকুবেরের অনর্থক দাহ চায়—আমৃত্যু গোঁয়ার।

বড় জোর কল্পনার যৌবনবেদনা-রসে ভাবে সে সন্ন্যাসী
পার্বতীর মহেশ্বর ! অর্ধনারীশ্বর ! যার
মস্তির সময় ত্রিকালে অসীম, অনন্তের কামনাবিধুর ।

এ পক্ষের মৃত্যুর চিন্তাও
মুরলীমধুর নীল যমুনার যুগল-নূপুরে নয়,
ছদ্মবেশে চৈতন্যে ছড়ায় রিক্তের প্রতীক হিমালয়,
তাপের অত্যন্তাভাবে, দগ্ধদৃষ্টি, শুধু শ্বেত শূন্যময় হিম,
আত্মদানহীন ।

তাই কি সেকালে সেই ধর্মপুত্ররাও শেষদিনে
পেয়েছিল একমাত্র সহচর ধর্মের কুকুর ?
দ্বারকা না, মথুরা না, বৃন্দাবনও নয়,
নিরুদ্দেশ, মৃত্যুভজা হিম নেতি খুঁজেছিল
জীবনের সুদূর প্রত্যন্ত দেশে, যুঝেছিল বুঝেছিল
পরস্পর শুনেছিল একমাত্র ধর্ম-অধর্মের একই ফেউ ॥
২ ডিসেম্বর, ১৯৬৫

অস্তিত্বে মগ্ন

অস্তিত্বের সরোবরে আমস্তক মগ্ন,
প্রায় সর্বদাই শোনে অবগাহী চেতনার সংগীতসাধনা ।
তাই বুঝি তার চোখের একাগ্র নিস্তব্ধ শান্তিতে
যন্ত্রণা ও মাধুরীর অমোঘ আনন্দে সজীব উর্বর
সদ্য শষ্পরাশি ।

তুমি যদি সে সংগীত নাই শোনো ভগ্নজানু নীরন্ধ্র বধির,
যদি তোমার মননে থাকে ইন্দ্রিয়েরা বিচ্ছিন্ন অস্থির,
প্রতিদিন ভেঙে যায় জীবনের নিত্যশুভলগ্ন,
যদি জ্বালা আর মাধুর্যের বোধ থাকে স্বতন্ত্র অধীর,
যদি রাত্রির নিশ্চল ধ্যান আর মধ্যাহ্নের রথের ঘর্ঘর
নাই মেলে গোধূলিতে, যদি তাকে ভালোবাসো
আর হও জিজ্ঞাসাজর্জর : কেন ভালোবাসি ?

তাহলে চেন না তাকে, আকাঙ্ক্ষার সমগ্রকে
অস্তিত্বের খণ্ডে খণ্ডে যদি করো একক মননে,

এই ভেদ এই একপ্রকার মিলনে
নানা শর্তের পাট্টায় হিসাবি পুলকে,
তাহলে নশ্বর এই অবিনশ্বর ভূলোকে
চৈতন্যের শ্যামতটে তোমার সমস্ত ফুলফল তৃণরাশি
জগ্ধ দগ্ধ মরণপিয়াসী মাত্র,
এমন কি তোমার স্বপ্নের পুলিনে জ্যোৎস্না কর্মিষ্ঠের দিন
জীবনের অধীশ্বর নিয়মের প্রচণ্ড ঠাট্টায়
ছিঁড়ে ফেলা, ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, ম্লেনো,
গন্ধহীন, একেবারে বাসি ॥
৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৫

ভালেরির অজগর

সেকালে এরাই ছিল অর্ধনারীশ্বরের প্রতিমা।
তারপরে, দেখা গেল
ভালেরি তোমারই প্রজ্ঞা বুঝেছিল ঠিক।
ফরাসিস্ মনীষারই জয়!
অভিন্নহৃদয়দেহ যুগলের দ্বন্দ্বে দেখি তোমারই প্রতীক।

নির্লজ্জ নির্দয় অহমের নেই কোনও সীমা।
বাঘ বা কুমির যেন মনের সমস্ত দাঁত মেলে
খাবার নখরে হিংস্র স্বার্থে
এদের দাম্পত্যে মাতে। কিন্তু কোন্ জন্তু বলো এত অবহেলে
এমন ঘৃণায় যুদ্ধ করে?

অথচ সন্দেহ নেই সিংহে ও সিংহীতে
মগ্ন হয় এবম্বিধ দ্বৈরথসমরে। কিন্তু সে তো অপত্যার্থে!
বোধহয় একমাত্র ভালেরির খ্যাতনামা দ্বৈতাদ্বৈতে সভ্য অজগরে
উপমা মিলতে পারে, আত্মভুক্ বিচ্ছিন্ন সংবিতে
দুই মুখ এক-দেহ অদ্বৈতের ভোজ যদি সারে পরস্পরে ॥
২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৫

এ কী গান ভাসে

এ কী গান ভাসে দুর্মর এক ঝলকে !
পথঘাট ফাঁকা, সন্ধ্যায় রাত নিশুতি,
ট্রামবাস নেই, স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নেই
যেন বা ধরেছে শহরের গোটা লাশটা !
রূপকথা বুঝি এইভাবে ইতিহাসটাই
পালটিয়ে দেয় অদৃশ্য কয় পলকে ।

আহা এ কী গান, সংগীত হল শরীরী
বালকের প্রাণে, বাঁচার চরম বিভূতি,
পথের ছেলেই দুর্যোগ-জেতা পুলকে
অবহেলে গায়, যেন মার-শোক-তাপ নেই,
ক্ষুধা নেই, যেন প্রাণধারণের দৈনিক
লাখো লাঞ্ছনা হাজার রকম অভাব নেই !

বাজারের ধূধূ প্রান্তরে এ কী করে গান !
প্রকৃতির মুখে শুনেছি এমনি সুরধুনীর
অবাধ ঝরনা, অরণ্য শোনে আকাশে
বহু কান পেতে শ্যামার ইমনকল্যাণ ।
নিষাদেও বান ফেলে দেয় ভাঙে তূণীর তার !
এ যে শহরের নৈঃশব্দ্যের হাহাকারে
শুদ্ধ বাতাসে ভাঙা বস্তির বিচ্ছিরি
রোগা ছেলেটার আপন মনের প্রবল গান,
পাখি নয়, নয় অপ্সর, এক বালকবীর,
মানবপুত্র ! ফৈয়জ গায় রাস্তায় ॥

১৯৬৫-৬৬ ?

সূচিপত্র

এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ

(সুনীল চট্টরাজের জন্য)

যৌবনে সে কারো মুখে, কারো কারো দেহের বিন্যাসে,
কারো বা মনের লাস্যে,
শিশুদের প্রাণের কৌতুকে,
কখনও বা আকাশে মাটিতে রৌদ্রে মেঘে
গেঁথেছিল দিনরাত্রি হৃদয়ের মুক্তামালা
বহু ভিন্ন গজমোতি একসূত্রে বেঁধে।

এখনও লাবণ্য চায়, নির্বিকার বিস্তারে লাবণ্য
আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে ইন্দ্রিয়ের গোলাপবাগানে
পরাগে পরাগে, হৃদয়ের বিভোর সম্ভোগে,
অনুরাগে, প্রত্যহের অক্ষয় সংরাগে
এবং হয়তো বিরাগেও যা চিরবসন্তেরও স্মিতহাস্যে
থেকে থেকে জাগে ক্ষণিক দুর্যোগে,
আর আনন্দের স্থায়ী পর্দা দ্বন্দ্বোত্তর বাজে তীব্র তীক্ষ্ণ।

শুনেছি, যৌবনে সেও নাকি বহু বিঘ্ন, বহু বন্য ঘোড়া,
মননের, গহন বনের, এনেছিল বশে!
সেও নাকি দেখেছিল দেবদেবী রাজন্যেরা কী অমানুষিক
স্বত্বাধিকারের ক্রূর অহঙ্কারে!
দেখেছিল ধিক্ ধিক্! নিরালম্ব রূপের প্রতীক
কী অমানুষিক নৃশংসতায়, আর হয়তো বা, ন্যায্যতায়—
চলে যায় হাত থেকে হাতে রাজন্যের পণ্যস্ত্রী বা
সৌন্দর্যের জৈবিক প্রতিমা, রূপের রভসে আবেগবিহীন।
অথচ লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ চতুর্দিকে আবেগেরই
সমাশ্লিষ্ট দীপ্যমান হৃদয়ের স্পন্দে স্পন্দে।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে ধন্য আজ তাই,
সে চিরবসন্ত সমাগমে মনে মনে লাবণ্য কুড়ায়
হৃদয়ের আরণ্যক কেলাসিত মুক্তাফলে,
ব্যক্তিক বাস্তবে আর ব্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিকে রৌদ্রে জলে
স্বসংগঠিত মৌলিক আনন্দে একান্তই মানবিক ॥

৫ জানুআরি, ১৯৬৬

অকাল মেঘে সূর্যাস্ত

যদিচ শীতের সূর্য, তবু অকালের মেঘের বাহারে
অস্তগীতিনাট্যে নামে চূড়ান্ত সুন্দর ;
কিংবা যেন প্রাজ্ঞ কোনো নৃত্যগুরু ভারতীয় নায়িকার মাথুরে শৃঙ্গারে
স্থিতধী গম্ভীর সমে ম্লান দিগম্বর ভরে
আলারিপ্‌পু শেষ করে অনন্তবর্ণমে ।
অথবা হয়তো কোনো চিরচিত্রাঙ্গদা, পৌরুষে রূপসী
কিন্তু সপ্তবর্ণে মহানৃত্যপটীয়সী,
বয়স বা অভ্যস্ততা যার ভঙ্গে নিত্য নতশির ।

কলকাতার বাড়িতে বাড়িতে ছাদে ছাদে,
আকস্মিক দু'চারটি শান্ত স্তব্ধ গাছে,
গোধূলির শহুরে বিষাদে অথচ একটি
দীপ্ত বিজয়ের অভ্রংলিহ্‌ তীব্রতায়
ক্ষিপ্র বর্ণগঙ্গা ছায় সাবিত্রী ক্রন্দসী ।

এবং স্মৃতিও ছায় উন্মোচিত বিস্মৃত আকাশে
শহরে, শহর ছেড়ে অন্তহীন উদার নিসর্গে,
সমুদ্রে বা পাহাড়ে প্রান্তরে ।
সমস্ত স্মৃতির এক ব্যাপ্ত প্রতিভাসে,
উদাত্ত করুণ ভর্গে অন্তরঙ্গ, তীক্ষ্ণ, স্তব্ধ, স্বর্গ-নরকের চেয়ে
অনেক উজ্জ্বল, সূর্যাস্তের মতোই আপন, ঘনিষ্ঠ ও বরেণ্য,
অসামান্য সাধারণ্যে আমাদের মৃত্যুহীন
জননীরই মতো গরীয়সী ॥
১৩ জানুআরি, ১৯৬৬

রিক্ততাই আমাদের বর্তমানে সাজে

রিক্ততাই বর্তমানে আমাদের সাজে,
রিক্ততারই অঙ্গীকার ।

কচুরিপানার জলা নেই এইখানে ।
চতুর্দিকে মরুডাঙা, ভাঙা মাঠ, পাথরগলানো মাটি
বৃষ্টিতে বিস্মৃত, ধসে ধুয়ে যায় পলাতক প্রত্যেক বছর

সবুজের অকারণ বাঙালি প্রাচুর্য নেই,
ফলে সঙ্কল্পের ছলাকলা নেই।

শতাব্দীর শতবঞ্চনায় আকাল এখানে
নিসর্গের নিত্য সহচর।
আদিগন্ত প্রকৃতির নগ্ন কঠিন সৌন্দর্য
ছড়ায় হৃদয়ে তূর্য দেশের কালের বিধুর প্রতীক।
তাই এইখানে অন্ধকার অন্ধকারই আর সূর্য
নির্ভীক সাগ্নিক।

তাই সংবেদনের দুরন্ত আবেগ ঢালুতে পাহাড়ে
মাঘের পাণ্ডুর আকাশে এবং বন্ধুর পৃথিবী ব্যেপে
চোখে চোখে চেয়ে থাকে বিশৃঙ্খল শত শত্রুতায় ধীর
তেজস্বী রক্তিম পরিপাটি
এক সার রক্তকরবীর ঝাড়ে,

যেন সেই রাবীন্দ্রিক সংকল্পের রক্তের বাহারে,
হাওয়ার লঘিমা আনে শরীরের ভারে,
বিবিক্তির হালকা হাওয়ায় হিম হৃদয়ের
কান্না হয় অন্য এক মধুরের সুর,
অজেয়ের, শতায়ুর ॥
২১ জানুআরি, ১৯৬৬

হৃদয় দাহ্য অতঃপর

হৃদয়েরা ভোলে প্রায়ই নিজের ভাষা,
শিশুরা যেমন অনেকমনস্কতায়
অনেক আবেগে মায়ের চোখের মায়ায়
কিংবা হরেক খেলনা কুড়িয়ে ছড়িয়ে
বিহ্বল থাকে, লুপ্ত আত্মপর।

অথবা তা নয়। যখন বয়সী আশা
অনেক ঈপ্সা-চর্চার শেষে কথায়
আস্থা হারায়, তখন শূন্য ছায়ায়

শুধু ভাবে পাছে হিমখদে পড়ে গড়িয়ে,
শুধু শোনে বহু কুরুক্ষেত্রী স্বর,
চোখ বুজলেই দেখে, খেলে কোথা পাশা-
ধর্মই জানে, ওরফে যম বা পূষন !

সময় বিশেষে স্মৃতিই সর্বনাশা ।
আমি, অর্থাৎ আমরাই, তাই ভাষা
হৃদয়ে নিংড়ে ভেজাই বাহির ঘর,
যেহেতু আন্তরিকতাই বিদূষণ ।

শুকনো হৃদয় দাহ্য অতঃপর ॥
২৫ জানুআরি, ১৯৬৬

ডী কুনশ্‌ট্‌ ডের্‌ ফুগে

যেহেতু স্মৃতির মাঠে কোনোদিন গুচ্ছে গুচ্ছে সোনা
তুলি নি, ভরি নি বক্ষ ঐশ্বর্যের গার্হস্থ্যে পাণ্ডুর ।
তাই তো খামারে নেই চতুষ্পদ লুব্ধ আনাগোনা,
তাই তো হৃদয় পূর্ণ অদ্যাবধি আদিগন্ত দূর

হরিৎ অথবা কৃষ্ণ রক্তিম বিস্তারে, নীলিমায়
শরীরের স্বস্তি পাই মননের দীর্ঘ স্বাধীনতা—
যতটা সঙ্গত মর্ত্য নির্বিকার জৈবিক সীমায়,
এবং সেখানে মুক্তিস্রোত পায় সত্তার দীনতা ।

সুতরাং যে ভাবেই ক্ষান্তি হোক্, মাস বা বৎসর
দীর্ঘসূত্র সময়ের হাসপাতালে ভুগে বা না ভুগে
—জানি তাও তুচ্ছ, বিশ্বে সত্য শুধু সৌন্দর্য দুস্তর
এবং রচনা করা মহানদী—ডী কুনশ্‌ট্‌ ডের্‌ ফুগে ॥
৬ ফেব্রুআরি, ১৯৬৬
(ডী কুনশ্‌ট্‌ ডের্‌ ফুগে—বাখের বিখ্যাত প্রবল কীর্তি . ফুগের শিল্পকর্ম ।)

হৃদয় আর হাড়

মরুর ভার যতই জ্বালে ক্লান্তি,
ব্যক্তিগত সত্তা—তত হিম
গর্ব ঢালে হৃদয়ে আর স্নায়ুতে,
ততই গড়ে পাথর-কাটা কান্তি
কঠিন জলে তুষার-তনু বায়ুতে।

অপরিসীম অভাব, কানে ভাসে
যত জমাট হত্যা, হাহাকার,
ঘন হতাশা, নিরেট মরা ক্লান্তি,
ততই তার নিয়ত গান সাধা,—
কারণ তার মান মানে না বাধা।

মানী মানুষ, সত্তা দুর্জেয়,
তাই সে হারজিতের ছেঁড়া পটে
সমানে এঁকে চলে যা তার প্রেয়—
সুখী সমাজ, প্রকৃতির যা শ্রেয় ;—
সৌন্দর্য, দিনের সংকটে।

তার মানব-দেমাকে আমি বাঁচি,
ডোবাই তাতে দীর্ঘায়ুর শ্রান্তি।
দেশকালের চড়কে নাচানাচি
দেখি এবং বৃদ্ধ হেসে বাছি
গাঁ-শহর কে করে কোথা উজাড়।

এদিকে নীল সামুদ্রিক শান্তি
মানসে গায় মাটি, বন ও পাহাড়,
এদিকে রংরেখায় মোছে ভ্রান্তি.
মূর্তি পায় হৃদয় আর হাড় ॥

২ মে, ১৯৬৬

জীবনের চেয়ে শিল্পে

বিরোধ সংগীতে মাত্র সংগত সার্থক উত্তীর্ণ সুষমা,
স্বরে মেলে প্রতিস্বর মাধুর্যের বলবান ঋকে,
মৃত্যুঞ্জয় বীরত্বের মহীয়ান বৈপ্লবিক দেশে দিকে দিকে
ইফিজেনি ! আলসেস্ত । অরফেউস্ অয়রিডিসে ! তোমরা উপমা ।
আর তুমি ! মহীয়সী ভৈরবী অথবা তোড়ী তুমি নিরুপমা ।

চিত্র বা ভাস্কর্য পায় মসজিদ মন্দির
গির্জা বা কেল্লাও বুঝি গড়ে তোলে গঠনের মানব মহিমা !
নিকটে তো অনেকেই দেখেছি যামিনী রায় অগ্নিবাষ্পে অতৃপ্ত অস্থির
খুঁজে পান রূপে রঙে অর্জিত শান্তির শূন্যে সৌন্দর্যের সীমা ;—
যেমনটি তুমিও হৃদয়ে পাও ক্ষণে ক্ষণে রক্তাক্ত গরিমা ।

জীবনের চেয়ে শিল্পে বিরোধ কি তীব্র নয় ? বিজয়ীর ক্ষমা
সংগীতে জীবনে আনি, আনো আনো গ্লুক্, আনো বাখ্ ।
দেয়ালে মুখর হোক কঠিন পাথরে রূপে উত্তীর্ণ-সুষমা ।
সমস্ত মানুষে দেখি স্তব্ধ বৃক্ষ ফুলেফলে একাকার মূল নতশাখ ।
সমাজে সবাই জিতি কালবৈশাখীতে শুদ্ধ শান্তির উপমা ।

গানের বর্ষায় তুমি ভাস্বর ভাস্কর্যে স্থির নির্বিশেষ
সুদর্শনা তুমি সুরঙ্গমা ॥

২১ মে, ১৯৬৬

এ বড় বিচিত্র দেশ

এ বড় বিচিত্র দেশ, সেলুকাস, এ কালেও বড়ই বিচিত্র ।
কালবৈশাখীর বৃষ্টি আসে তবু রিমঝিম,
শুনি, পড়ি, আশেপাশে
আকাশে হাওয়ায় ;
ভাবে ক্ষ্যাপা কান্নার শিলায় ঝড়ে নামবে
আকালের হিমে ভেজা
ঘামে ভেজা পরশপাথুরে হিম ;
কিন্তু গোটা মাটিই যে ঝুরাঝারা,

ভূতপত্রীর বালি, উড়ু-উড়ু, ধূলিসার,
শুষ্ক. দগ্ধ, ছায়াশূন্য, ছিন্নমূল,
কোনোটি বা স্কন্ধকাটা, নিষ্পল্লব, যত খাল
কানানদী পচা হাজা শত শব, আর নদী নদীর কঙ্কাল ;
ফ্যাকাশে হাওয়ায়
অস্থিসার
এ মেঘমাশ্রিত সানু, অয়শ্চক্র সমুদ্রও হেরে যায়,
শ্মশানে বিরাট দাহে
পৃথিবীর মানদণ্ডহীন
যেমন গাঙ্গেয় গণ্ডূষে শান্তিজল বৃথা ঝরে,
যেখানে স্বয়ং জীবনই জঞ্জাল
কুড়ায় ও দেশে, দেশে ফেরি করে আর
দগ্ধপিত্ত হতাহত হিমশিম
অন্তহীন অন্ত্যেষ্টির অন্তে অবশেষে হৃদয়ের
প্রত্যন্তপ্রদেশে দূর রামধুনী
আশ্রমে পালায়,
বিরাট শ্মশান-রাজ্য, অগ্নির অশান্ত ভোজ !
এ খাণ্ডবে কেবা শত্রু কেবা মিত্র !
অথচ তাকাও, ওই ভীত্-নামে নামে
প্রাণের অশ্রান্ত বৃষ্টি মুক্তির জ্বালায়
বীরত্বের অলৌকিক প্রতিক্ষণে প্রাণদানে শ্মশান নেভায়, পাহাড়
কন্দর
মাঠ বাট ধানখেত তৃণাদপি
সুনীচেন দুর্জয় অশ্রুতে আহা মৃত্যুতে
মৃত্যুকে হেনে হেনে।
এখানে কোথায় বৃষ্টি, এখানে কেন বা বৃষ্টি আসবে !
এখানে শুধুই
সৃষ্টিছাড়া ভূতপ্রেত বেচে আর কেনে।
চাল নেই চুলো নেই ধান নেই মান নেই !
এ দেশ বিচিত্র দেশ
আর বিচিত্র এ রাজধানী, অলীক সুন্দর !

২ জুন, ১৯৬৬

কিবা গ্রিস কিবা ট্রয়

কাকে দোষ দেব ? কেউ দাসী কেউ দাস।
সচ্ছলতায় লুব্ধ ঢেকেছি বিজেতার কালো ঘরে
প্রেমের স্বচ্ছ রৌদ্রকে দ্বিধা বিনা, আর তারপরে
বিত্তবানের নহুষ দৃষ্টি খুলে দেয় দীন বাস।
মাঠে ঘাটে বনে পরিখা প্রাকারে ঝড়ের দীর্ঘশ্বাস।

কাকে দোষ দেব ? পিতৃব্যের জ্ঞান
পাকা পার্থিব, সে জানে কে হারে অথবা কে কোথা জেতে।
বৃথা শিউলির শুচি সাবিত্রী ধ্যান !
অর্থের আর অস্ত্রের কারবারে
হত্যাশিবিরে অন্ধকারের মহিষেরা ওঠে মেতে।

যেতে যদি হয়, চলে যাব ক্রীতদাসী,—
কেউবা বন্দী যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ খাজাঞ্চিখানায়,
জানি তা না হলে দুর্ভাগা দেশে থেকে যাব পরবাসী,—
যমের পিছনে দলে দলে পরবাসী, জীবনের প্রত্যাশী
জীবিকায় আর জীবিকারিক্ত শতায়ু ভিখারি যে যার পরগনায়।

আমার ভাগ্য একা বুঝি ? বাম গোটা সমাজেরই বিধি,
ইতিহাস আজ কানে ধরে ধরে জানায়
সোনায় বোমায় উচাটনে আর মারণেই জয় জয়।
বিশ্বব্যাপ্ত সেই লজ্জার আমি এক প্রতিনিধি,
ক্রেসিডাও আজ অভাগী প্রতীক দেশের দুঃখ বয় ;
কিবা গ্রিস কিবা ট্রয় ?

কাকে দোষ দেব ? প্যাণ্ডারস যে অনেক, অনেক দেশেই।
শিউলি মাড়িয়ে মাড়িয়ে সারাটা বিশ্বে যে তারা চরে।
দোষ অনেকেরই, মানবজন্মে সত্যাসত্যে দায় যে সর্বনেশে।
রজনীগন্ধা লণ্ডভণ্ড অন্য বৃন্তে ঝরে,
সোনার চূর্ণ শবাধারে শত দুর্গতি ঘরে ঘরে ॥

১৮ জুন, ১৯৬৬

কেবা নেয়, কে দেয় ভিক্ষা

কোথায় গেল প্রিয় সেই তিতিক্ষা ?
ফুলের ফসল ধুলাবৃষ্টিতে
নাই ফোটাও যদি মুহ্যমান
কিংবা অন্ধ রাগে কর্মনাশা
বাগান উপড়িয়ে অনাসৃষ্টিতে,
দীর্ঘ অর্জিত বিশ্ববীক্ষা
তুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে বক্ষ্যমাণ
মানব-ভাষাকেই হাতের পাশা
খেলাও নবতম বর্বরতায় !

মল্লিকার বনে, হে অন্তরঙ্গ,
কত না কলি ভাঙো, ছত্রভঙ্গ
বাংলা দেশ যেন জর্জরতায়,
লুকাবে বলো কোথা ? কোথা সে আশা ?
সে অবিনশ্বর প্রেমের দীক্ষা
ভাসায় যদি ঝড়ে বৃষ্টিতে,
নামায় মানবিক শ্রাবণ-বান ?
শাসনে শোষণে না, সে সমদৃষ্টিতে
প্লাবনে কেবা নেয়, কে দেয় ভিক্ষা ?
২৫ জুন, ১৯৬৬

ছিন্নসত্তা

দেহ, জানি, অতি মহাশয়
ব্যক্তি, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য।
তাই তার জ্বালাও বিস্তর,
ওষুধে বিসুধে গ্লানি বয়,
সয় নানা ব্যাধি, বীরভোগ্য
একমাত্র মানবজীবনে,
জানে একাকার দেহমনে,
কম-বেশি, বিশ্বে, পরস্পর,
বাংলায়, পাকিস্তানে, দূর

আফ্রিকায়, আর অলৌকিক
ভীত্‌-নামে যেখানে সুরাসুর
জীবনমৃত্যুতে চারদিক
ঢেকে দেয় মৃত্যুর অধিক
জীবনে জীবন বীরভোগ্য।

তাই কি গ্লানিও গুরুভার
মানবিক শরীরে চেতনে
হয়ে ওঠে নিত্য দুর্বিষহ ?
একা কোথা কুড়াবে আরোগ্য ?
শত ব্যাধি পোষো দেহে মনে
বিশ্বরূপ আধির কারণে।
রাত্রি তাই বোবা আর্তনাদ,
নিদ্রা চাও যতই দুর্বার।
দিন তাই দুঃস্বপ্নে বেঘোর,
চতুর্দিকে প্রচ্ছন্ন জল্লাদ !

ওরে বন্দী বৃদ্ধ ! সত্তা তোর
ছিন্নভিন্ন দেহ দক্ষজার।
বিশ্বে ধূলিসাৎ একাকার
ব্যক্তিত্বের মনস্বী প্রাকার ॥
জুলাই, ১৯৬৬

মাঝিরা মাল্লারা

যেদিকে চাই করাল কাল-প্রহর,
অথচ কানে নবজীবন গান !
ও কারা গায় ? মাঝিরা মাল্লারা ?
কোথায় যায় ? দূরের পাল্লায় ?
নাকি কাছের ? চোখের ওই পার ?

কালো ঘনায় গাঁয়ে, মিশায় শহর,
কুটিল ছায়া, চতুর্দিকে শ্মশান,
অন্ধ আলো আকাশে কাকে তাড়ায়

সন্ধ্যাতারা, চেনা সে লালতারা।
হৃদয়ে গান কাদের দুর্বার ?

অশ্রুনদী কাদের পাল্লায়
মুখর গানে, চোখের বাতিঘর
গড়ে হাজার, জ্বালায় মনপ্রাণ
লক্ষ চোখ, ভাঙল গড় কার ?
কাড়ল নিধিরামের ঢাল কারা ?
পারানি করে মাঝিরা মাল্লারা ॥
৮ জুলাই, ১৯৬৬

তাও কি হয়

রাতের ভোর নেই, তাও কি হয় ?
রাহুর গ্রাস কবে আমরণ ?
অথচ তাই শুনি জীবনময়,
অসহ তাই দেখি প্রতিটি দিন।
মরণ যদি সাজে অন্তহীন,
নানান্ ভোলে নানা আভরণ
নিলাজ পরে রোজ বিশ্বময়,

তা হলে, আর কবে, কবি, তোমার
বিভাসে ভরে দেবে পূরবীকে,
গাইবে রাঙা আলো পাহাড়পার
সাগরে রং হেনে শত দিকে
ঘুম ও জাগা এঁকে প্রতিটি দিন ?
বাংলা শ্রাবণের শূন্যে তন্ময়
উদয়-অস্তের একই সে কবিকে

একই সে জিজ্ঞাসা বারংবার,
প্রভাতে সন্ধ্যায় বিশ্বময়
একই সে জিজ্ঞাসা—বা হাহাকার ॥
২২ অগস্ট, ১৯৬৬

স্পষ্টকে চাই

দুর্বিষহ গরম গুমোট, স্বার্থপর, খেয়ালি, ইতর।

জানি না কতটা মন কতটা শরীর ;
মননে সন্দেহ হয় এঁরা দুইজনে অভিন্নহৃদয়
অর্থাৎ পাভ্‌লভী আর ফ্রয়েডীয় উভয়েই যাকে বলে
চেতনা বা স্নায়ু।
এবং শুধুই কি তা নিজের একার ?
আপিসের দপ্তরে বা স্বত্বময় ঘরে ?
মননের জয় মানে মানবিক এক জোটে আত্মদান,
প্রাজ্ঞেরা বলেন, স্বনিষ্ঠের পরাজয় আর রূপান্তর।
কার্ল মার্কসের পরে
তোমার বা আমার অথবা এর-ওর আয়ু
ছড়িয়েছে সন্ন্যাসীর মতো বিশ্বময় শত পঞ্চশরে।
তাই লোভ রাগ আশা প্রেম স্নেহ মৈত্রী
তাই হাহাকার একাকীর, আবার তা সমস্ত লোকের।
মানুষ আশ্চর্য জীব, গড়েছে নিজেই বিশ্বের মানুষ।

মেঘ জমে, প্রায় শৈশবের যৌবনের মতো ঘনঘটা।
কিন্তু কেন শুধু বাষ্প-গ্লানি, শুধু স্বেদাক্ত প্রদাহ ?
মেঘ ডাকে সেকালের স্বদেশী আওয়াজে
রাগে ঘৃণায় গম্ভীর। কিন্তু কেন এই লঘুক্রিয়া ?
সেকালের নিপীড়িত ইন্দ্রইন্দ্রাণীর শত্রু ছিল স্পষ্ট,
ভিন্ন, ভিন্নভাষী, ভিন্নদেশি, ভিন্নবেশী, আগন্তুক,
কোনও সম্বন্ধবন্ধনে গররাজি, অনাত্মীয়, বর্ণহীন, এমন কি কটা!
লোভের সুড়ঙ্গ ছিল সমুদ্রের পারে সরাসরি।

তাই বুঝি খুলে যেত রুদ্রজটা, ছড়াত প্রবাহ
বৃষ্টিতে পলিতে ঘোর বজ্রে বিদ্যুৎবর্শায়—
মহাশিল্পী বন্ধু যা বলেন স্বকীয় ভাষায়—
নেমে আসত বাংলায় পঞ্জাবে মহারাষ্ট্রে দেশে দেশে
বর্ষা।
আমজামপাকা খাঁটি গরমের পরে
ক্ষিতিসিঞ্চিত সৌরভে ভৈরবহরষে আসত সে বরষা।
আর গরম ? তা গরম বটে, আকাশের খেতের আগুন।

পুণ্যক্রোধ সন্ত্রাসে সন্ত্রাসে থরহরি
রাজা আর রাজার দালাল।
স্পষ্ট ছিল বৈশাখের তাপ, স্পষ্ট জ্যৈষ্ঠের রোদ্দুর,
স্পষ্ট মাঠে মাঠে নদীতে নদীতে সরস প্রাণের বন্যা।
সেই স্পষ্ট কাল গত, কোথা সেই ঘনিষ্ঠ পরশে
নিকটের সুদূরের পিয়াসী চঞ্চল মন,
কোথা সেই আকাশ বাতাস ?
আজ গোটা ইতিহাস ধুলা ধোঁয়া, তেপান্তর বন উপবন,
ঘর চালাকির অন্ধকূপ আর মাঠঘাট মরা খরা।
শুধু বিবর্ণ গুমোট অপ্রাকৃতিক গরম।

রুদ্র কি শুধুই শূন্য তাপ আর সেই
আমাদের শারদীয়া কন্যা সেই অপর্ণার—
তারও কোনো স্পষ্ট আশা নেই ?
২৩ অগাস্ট, ১৯৬৬

মৃত্যু সর্বদাই দুঃসংবাদ

মৃত্যু
সর্বদাই দুঃসংবাদ।

বিশেষত তার,
যে আপনজনের আর চেনার জানার
সকলের মনে গড়েছিল ঘনিষ্ঠ প্রতিমা,
কল্যাণীর লাবণ্যে যে এনেছিল চোখের দেখার
বা ঘণ্টা আধেক কথা নিবিষ্ট শোনার,
শুধু দুচার মিনিট তাকানোর অনন্ত প্রসাদ,
যার চোখে গঙ্গা পদ্মা খুঁজেছিল সীমা
আর ধলেশ্বরী দিয়েছিল ঢাকাই শাড়িতে
সৌন্দর্যের সংযত বাহার।

দশপ্রহরণধারিণীর আশ্বিনের আকাশই কি
এঁকেছিল তার ললাটের লালিত্যে সিঁদুর ?
ভিন্ন ভিন্ন তবু প্রতিমুহূর্তের ধরণধারণে তার

অসাধারণত্ব ছিল সহজে কঠিনে, সাধারণে ;
বাড়িতে, নিভৃতে, বারান্দার সংক্ষিপ্ত বাগানে,
অল্পস্বল্প বাইরের ডাকে, সামাজিকতায়, সমাজের কাজে,
সামাততে, মাঠের সভায় ।

মনে পড়ে প্রায় গৌণ কারণে, বা অকারণে স্বাভাবিক
স্মিত হাসি-মুখ, কিংবা কারণেই
প্রতিবাদী রাগে, উত্তেজিত দুঃখের বিদ্যুতে
হঠাৎ মেঘের রূপান্তর,
যেন প্রবল বর্ষায় মানবিক গন্ধরাজ ঝুঁকে পড়ে আরক্ত জবায় ।

আর তার অনুকম্পা,
যেন সকলেই তার ভাই চম্পা বিশ্বময়,
সহমর্মী ছিল সকলের ।
আজ নেই সে ঘরনী, নেই তার
ঘরের বাইরের প্রশান্ত সংহত দাক্ষিণ্যের হাওয়া ।
ইদানীং সে বলত সে কখনো-ই হবে না প্রবাসী—
প্রাণধারণের দুঃখে দেশের দশের বুভুক্ষিত তৃষ্ণাখিন্ন
অবসাদে হতাশায় যতই না হোক মর্মাহত ।

তাই বুঝি মৃত্যু ?
হয়তো বা যুক্তিযুক্ত, হয়তো বা বাংলায় প্রত্যাশিত ঘরে ঘরে ।

তবু দুঃসংবাদ ।
অন্তত চৈতন্যে আমাদের, যারা তাকে চিনেছিল ।
সেই বুঝি রেখে গেছে এই উত্তীর্ণ প্রতীক
দগ্ধ ছিন্ন শতশত প্রান্তরে প্রান্তরে
আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত জীবনে প্রত্যাশী বিষাদ ?

আঁকো তবে সে আলেখ্য উজ্জীবিত স্মৃতির সাহসে,
লক্ষ লক্ষ ॥

২৩ অগাস্ট, ১৯৬৬

স্বপ্নে দুঃস্বপ্নে

স্বাবলম্বন যে ভালো এই শাদা সত্য কথা
আমরা তো অনেকেই শুনেছি সেকালে।
পিতামহেরা বটেই, এমন কি পিতারাও
বলেছেন এই কথা, মেনেছেন তার তত্ত্ব,
একদিকে ভারতীয় পরমার্থে, অন্যদিকে
রানীমার ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যিক প্রয়োজন-সাধনার।

এমন কি যথাসাধ্য পেলেছেন, নিদেন তা চেয়েছেন।
রাজা রামমোহন ও বিদ্যার সাগর থেকে
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অনেকেই। তাই আমরাও কম-বেশি
প্রতিবাদী সে ঐতিহ্যে একালেও মনে মনে দেখি
স্বাবলম্বী জীবনকে, স্বনির্ভর মননকে,
স্বায়ত্তশাসিত মাতৃভাষা অর্থাৎ নিজেকে, দেশে
এবং অনেক বিদেশে অনেক মিতারা যা দেখেছেন,
কেউ পাকা কেউ কাঁচা মনে, আর জীবনেও, কম-বেশি।

কিন্তু কে এ? বলে শুনি কান কেটে ডেকে ডেকে,
স্বনির্ভর মানে নাকি নিজ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্বাস-প্রশ্বাসের
অভাবে নির্ভর আয়ু, আর স্বাবলম্বী মানে
ঝুলি, খুদবাটোয়ারা, মিথ্যা আর চোরাই চতুর চালে
অথবা বিশুদ্ধ অকর্মণ্যতায় অসামর্থ্যে
অসত্যেই শক্তি-সাধা দেশে দেশে গদিতে দপ্তরে।

আজকে সন্ধ্যাটা ভাবো এ বিষয়ে।
নিস্তব্ধ অথচ অস্পষ্ট উদ্বেগে শহরের
অসামান্য এই সন্ধ্যা, যে মেলায় আকাশপৃথিবী,
বর্ণময় বহুঅর্থে ব্যঞ্জনার রহস্যে প্রতীক।
তাই তো উদ্বায়ু
অস্বাভাবিক নীরব তিক্ত ক্লান্ত শহরেও
আজ নির্বিকার। সূর্যমুখাপেক্ষী ওরা কারা?
মুখের ঐশ্বর্য স্তব্ধ শিল্পমাত্র, বা শুধুই
প্রাকৃতিক। আমাদের কারো মুখে কেন তার

নিশিভোর প্রতিধ্বনি নেই ? নাকি আছে,
স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নে দিশাহারা ?
২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

বৈরূপ্যে বিধুর

চেয়ে থাকে তন্ময় বিধুর ।
বিলম্বিত সবুজ প্রত্যাশা স্নিগ্ধ মাঠে মাঠে তীব্র,
চেয়ে থাকে মেঘে সূর্যে হরধনুভঙ্গিল শোভায় ।
শুধু হৃদয় স্পন্দিত, প্রায় যেন স্তব্ধ কোনও
ভাষার অতীত বৈদেহীর প্রতীক্ষায়,
চেয়ে থাকে অপলক গোধূলি বা ভোরাই ললাটে
যেখানে বিজয়ী শ্যামে সর্বংসহা মাটির সিঁদুর ।

একাগ্র তন্ময়, চেয়ে থাকে,
যেন শ্বাসরুদ্ধ স্থির ঘনিষ্ঠ সংবিতে আত্মপরহীন
আবেগে সংবৃত, যে আবেগ অধরা বিস্তারে
হতে পারে রূপায়িত রাবীন্দ্রিক গানে,
কিংবা জর্জ্যোনের, কিংবা সেজানের, কিংবা
আধুনিক চিত্রে, কোণার্কের সুরসুন্দরীতে,
বহুরূপে রূপান্তরে এক
চিরচেনা কলকাতার স্তব্ধ শান্ত অহল্যা প্রহরে
নিরশ্রুর সংহত নিস্তারে
পাড়ায় পাড়ায় লক্ষ লক্ষ লোকে রূপকথার আত্মীয় প্রহরে ।

অথচ কেন যে তারই রূপ নেই !
মুখর, বিচিত্র, সুঠাম, স্বপ্নেও যে সুন্দর ! তারই
এ কী অপ্রাকৃত ভেদাভেদ !
শুধু ভিজা ভিজা মাঠ, আর শ্রাবণ-আশ্বিন,
আর আকাশবাতাস, মেঘ-সূর্য, সোঁদা গন্ধের সম্ভার,
আর হয়তো বা একান্ত একার ললাটের অক্ষয় সিঁদুরে
প্রাচীন দেশের সভ্যতার সমস্ত ভাষার পক্ষপাত !
সমস্ত রূপের একমাত্র এ কী অধিকার !

অসম্পূর্ণের যন্ত্রণা যাবে কোন্ কালে, সে কোন্ অভ্যাসে ?
দুর্বোধ একালে অমানুষিক বিচ্ছেদ এই একাত্মের, মানুষে মানুষে
শুধু চৈতন্য স্পন্দিত, রাত্রিদিন, ষোড়শ প্রহর,
বৈরূপ্যে বিধুর ॥
২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

ছড়া

মায়ের মতো সেই-তো ভালোবেসে
হৃদয় ঘেঁষে শিশুর মতো ঘেঁষে
সেই-তো এল বৃষ্টি !

হন্যে-হওয়া গরম অনাসৃষ্টি !
পথের ঘামে পিছল আল্‌কাত্‌রা,
পচা গুমোট, পঞ্চভূতের যাত্রা
জোগান্ দেয় সে যে সর্বনেশে !
হারল সবই ! মায়ের মতো হেসে
বৃষ্টি এল, আবহসংবাদ
ছিঁড়ল ছাটে দেশের নাটে বৃষ্টি।
ভাঙল ক্ষোভ অসহ্ যন্ত্রণা
উড়িয়ে ভুয়া ধুলার মন্ত্রণা,
করল শুচি বাংলা ঘাট মাঠ
কুঁড়ের চাল কোঠার চৌকাঠ।

বৃষ্টি এল, দুহাতে ভালোবেসে
মায়ের মতো, শিশুর মতো দেশে
সেই তো এল অভয়ধারা বৃষ্টি।

চোরাই অনাসৃষ্টি বরবাদ ॥
৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

ফুটে ওঠে গ্রহ-তারা

উদার উদাসী প্রেম ! আপন গরজে, সারা বিশ্বে একাই অস্থির,
ঝোড়ো ছিন্ন ভিন্ন হাওয়া ধরে শূন্যে দুহাতে চারহাতে ।
পাতা ওড়ে, ডাল পড়ে, পাতা ঝরে, স্কন্ধহীন শরীর চৌচির ।

হাওয়ায় হৃৎপিণ্ড ঘোরে নৈরাশ্যের নৈরাজ্যের বেগে,
নদী ডাঙা, ঝর্না বন্ধ জ্বালামুখ, প্রেম খোঁজে ভাঙা
মজা গ্রাম্য কুঁড়েঘরে, বসতির অন্ধকূপে, যদিবা ভাস্কর্য ওঠে জেগে ।

খুঁজে মরে মিলানোর বিলানোর দুর্মর গরজে
অস্থিব অশ্বত্থ, যদি হৃতশ্রী সূর্যের দাহে ময়লা মেঘের
জ্যোৎস্নার ঘোলাটে স্রোতে নীলে নীল মেলে পরিব্রজে ।

কিন্তু এ শূন্যের সীমা কোথাও পায় না সত্তা উদ্বায়ু হাওয়ায় ।
পূর্বরাগী যন্ত্রণায় বিচ্ছিন্নের কোথায় বিচ্ছেদ ?
পাওয়া কোন্ ছার, চাওয়া—তাও যে নীরক্ত দুষ্ট, উদভ্রান্ত ধাওয়ায়

চতুর শহরে গ্রামে জীবন্মৃত তেপান্তরে জমে ওঠে ও কাদের
প্রেতস্ফীত শোথাতুর কবন্ধ মেদের স্তূপ ?

তবুও কি অগ্নিবাষ্পে ব্যথাময়
এই শূন্য শূন্য নয় ? গ্রহ-তারা ফুটে ওঠে মুঠিতে মুঠিতে
আমাদেরই ?

২৮ নভেম্বর, ১৯৬৬

আসলে সে নিজের ধিক্কার

আসলে সে নিজেই যে নিজের ধিক্কার ।
তাই তার ঘৃণা
প্রায় বিশ্বমানবকে, তাই তার রাগ
অসহায় অপারগ অশক্ত শিশুরও ভিড়ে খোঁজে
প্রতিহিংসার শিকার ।

দুর্বুদ্ধি কাদায় ভারি গাদাবন্দুকের ফাঁকা তাগ—
সে করে চলেছে নিত্য কোনো টোটা বিনা,
নিজেই সন্ত্রাসে চোখ বোজে
দুই হাত স্ফীতোদরে, পৌরুষের মরিয়া বিকার।
মানুষ যখন হয় মনুষ্যত্বহীনতার উন্মাদ ধিক্কার

তখন কী বিড়ম্বনা! আমাদের কোনো লাভ নেই তাকে হেঁকে দূর-দূর
যে জানে না কোনও ভাষা! তখন গর্জায় জনসাধারণ্যে ঘৃণা,
ভেঙে যায় ভেদাভেদ শত্রুর বন্ধুর,—
হন্যে-দেওয়া শিকারিই অন্তে হয় নিজের শিকার।
কে কবে লড়ায়ে নেমে মারে প্লেগবাহক ইঁদুর?
২ ডিসেম্বর, ১৯৬৬

শুধু ভেজাল ক্ষতি

সেখানে চোখে ফাঁকা কোটর, নেই তিলেক জ্যোতি,
পেশী পাথর, হৃৎপিণ্ড অচল।
সূর্যহীন প্রবল দাহে জল
কেবল ঝরে অঙ্গারের তেপান্তরে,
কেবল পোড়ে পাতাল-জোড়া অসংখ্য বসতি।
সেই কালীয় অন্ধকারে কেউ কি বাঁচে-মরে?
অসাড় দিনরাত্রি, গেঁজে দুষ্ট হলাহল।

অথচ মনে এসেছি প্রাণ-আলোকময়তায়
পৃথুল লালে তালতমালে স্বচ্ছ বসতিতে
স্বপ্রতিষ্ঠ জনপদের ব্যাপ্ত আরতিতে
প্রত্যেকের স্বাধীন সংলগ্ন মমতায়
আলোয় আলো রাত্রিদিন শুভ্রে নীলে ঝরে
রৌদ্রময় জ্যোৎস্নাময় মেঘল সংগীতে
যেখানে মনশরীর সদা আলোকপান করে।

বুঝি না একী দেশ! ত্রিকাল উধাও সম্প্রতি।
আলো কোথায়? এখানে নেই অন্ধকার দাহও,
শূন্য মরুশ্মশানে ধসে আজব হিমবাহ।
মানুষ তাই নামানুষ ও নাপশু অবস্থা।

এখানে দিশা হারায় চোরা আলোয় নিজে সতী,
রুদ্র শিব স্বয়ং কেন সাজে ছিন্নমস্তা !
জীবনও নেই, মরণও মিছে, শুধু ভেজাল ক্ষতি ॥
১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৬

নিজেই অবাক হয়

নিজেই অবাক হয়, স্বভাবের এ কী স্বাধীনতা !
হৃদয়ে রৌদ্রকে ধরে, বীজকম্প্র আকাশে বাদল !

যতই আঘাত পায়, কিছুতেই মানে না হীনতা,
মনের পাতালে তার আদিতেই মাটির দীনতা
রূপান্তর পেয়েছিল অঙ্গারিত হীরকে উজ্জ্বল ।

আশা হতাশার উৎসে, যদি বোমা জ্বালে রসাতল
তখনই সে গান শোনে মুরজ মুরলী তূর্যে,
ফেরারি হতেই হলে জঙ্গলেও বাজায় মাদল !

গোপনে অবাক হয় নিজেই সে, তৃণের ক্ষীণতা
কোথা পায় শিরস্ত্রাণ ? মাটিতে, হাওয়ায়, সূর্যে ? ..
সেখানে কি গড়েছে সে বাষ্পে বাষ্পে তার স্বাধীনতা ?
১০ জানুআরি, ১৯৬৭

অসম্পূর্ণের কবিতা

তর্কেও সুযোগ নেই,
মনে হয়, এখানে কোনোই প্রাণধারণের ।
অনাবৃষ্টি, অসময়ে অতিবৃষ্টি ।
আর তাও নিয়ে যায়
ধসে-ধসে ঢলে-ঢলে লাল মাটি, ঘোলা জল ।
দায়ভাগ দিয়ে যায়
উর্বরতা, রুক্ষ তাপ, ফাটা হিম । এ অপচয় নিবারণের
অনেক উপায় আছে, অনেকেই জানি, কিন্তু কার তা আয়ত্তে ?

মাটিব না, মানুষেরও নয়, মাটির মানুষ যারা।
স্বত্বে স্বত্বে কারা বলো যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির নির্বিকার চোখে
সহিষ্ণুর জ্বালা জ্বালে, বারবার উচাটন রাবণের।

অথচ প্রত্যেক মাঠে মাটি চায় মুক্ত নির্বাচন, বৃষ্টির রৌদ্রের।
মানুষেরা, স্থানীয় মানুষ চায়, প্রাচীন দাসের
সাবেক শূদ্রের অভ্যাস সত্ত্বেও অজেয় আশার
শুভবুদ্ধি, সমবেত, আর জনে জনে,
হৃত অপহৃত সোজা অধিকারে জীবন্ময় মৃত্যু-তারণের
মাটি, স্বাধীন মাটির লাল আর লাল জল আষাঢ়ে শ্রাবণে
আর সোনা সোনা রৌদ্র চায় আশ্বিনে অঘ্রানে
স্বনির্বাচিত সকালে মাঘের হিরায়
বিকালে ও গোধূলির বর্ণাঢ্য গার্হস্থ্যে।
সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক যারা, যারা ভাবে মানুষেরা বোকা ষাঁড়,
এমনকি দোআঁশলা কুকুর, সেই রুগ্‌ণ আগন্তুকই ভাবে
এখানে সুযোগ নেই কোনো প্রাণধারণের।
নেই, বিচ্ছিন্নের নেই ॥

*   *   *

পাখিরা মানুষ নাকি ? আশায় অভ্যস্ত ওরাও কি ? করে গান !
একদা বাগান ছিল, নানা ফলফুলের বাগান
সযত্নে রচিত, দীর্ঘ মনোযোগে নিষ্ঠায় সচ্ছল।
হ্যাঁ, সে ছিল বটে একদা বাগান, ছিল পাখিদের গান ;
আজও আছে, যেন বা বাগান আছে, যেন মরুডাঙা দেশে শান্তিনিকেতন।
আজও আছে যেন জল, মাটিতে সরস গাছে গাছে
ডালপালা ফুলফল এখনও সতেজ যেন মূঢ়
লোভের করাত থেকে করে যায় আত্মত্রাণ।

বাগানে এখন শুধু স্কন্ধকাটা ফসিল উদ্ভিদ্।
তবুও পাখিরা আসে, দশবিশ ঘরের গায়ক,
খুঁটে খুঁটে বীজ খোঁজে, যেন এক ঝাঁক জীবতত্ত্ববিদ্।
খোঁজে কোথা বাসা গড়া যায়, খড়কুটা নাই হোক,
আছে বটে নানান রঙের কবোষ্ণ পেলব গায়ের পালক।

আর আছে নানা স্বরে নানা সুরে গান,
একটি তাগিদে বাঁধা, জীবনে জীবন দেওয়া প্রাণ স্পন্দমান ॥

* * *

কারো বা সুযোগ আছে, সবার যা নেই।
ভাঙা বাড়ি, জানলা দরজা ঢিলা,
ছাদ থেকে জল পড়ে, বালি ঝরে,
রৌদ্রের অজেয় গতি, আসে চতুর্দিকে,
আর ঝোড়ো বৃষ্টি মুক্ত জলে আসে ঘরে।
হাওয়া দেয়, বিশ্বাস হাওয়ায় ভরে,
গাছে গাছে বেগ জাগে, আমার শরীর মনে, চতুর্দিকে,
পথে পথে দেখি খেত, আকাশ, সবুজ মাঠ, টিলা,
বিশ্রামেও ক্ষিপ্র গতি চৈতন্যে, যা সকলের নেই,
যাদের দস্তুর অন্য, দমবন্ধ ঘরে।
তাই জনসাধারণ্যে, মুক্তিতে নন্দিত, চষে গড়ে এঁকে লিখে।
দুর্ভাগ্যে সুযোগ আছে, সৌভাগ্যের ছলে বলে নেই ॥

* * *

কেন যে আর হাওয়ায় নেই মন!
অন্ধকার আবহাওয়ার আপিসের
কিংবা ছাপা কাগজে কিংবা বেতারে
অন্ধকূপে কী খোঁজা প্রাণপণ!

মাঠের হাওয়া হারায় চৌকাঠে,
গাছের ডালে উতল হাতছানি!
সামান্য যে পাখি তারাও জানে
কোন্ দিকে কী হাওয়া ছড়ায় মাঠে!
হাওয়া! হাওয়াই প্রাণের জানাজানি,
কাকলি তাই তাড়ায় ফিসফিসের
রুদ্ধ মুখ মুখর নীল সেতারে।
হাওয়ায় হারে কত না বেইমানি।

হাওয়ায় আজ ভরাট প্রাণমন ॥

প্রতিবাদী বাহুবন্ধে

মন কি ভরেছে, ওহে সাবধানী, স্বার্থকে ঘৃণায় ?
বিশ্বে কি গড়বে ঘর, পরকে কি করেছ আপন ?
সত্তায় বেঁধেছ সত্তা শত শত ? নিশ্চিতি বিনাই
জীবনে জীবন দিলে, দুঃসাহসী, রাখোনি গোপন
বক্ষের কোনোই ঘর ! আর আজ বার্ধক্যে কাঙাল !
তোমার গর্বের মাটি জালিয়াত ভেজাল বাচাল
স্বদেশেই নিরুদ্দেশ ! বলি, ওহে বিদগ্ধকপাল
আত্মগ্রাসী আয়নাতে যত দেখ, মেনো না কখনো
মসজিদ মন্দির গুরুদ্বারে দপ্তরে মসনদে
বিচ্ছিন্ন ঘৃণায় শবসাধনার লুব্ধতায় কোনো
দিকে কারো সত্য মুক্তি নেই ! জেনো যে মানসহ্রদে
মননের অলকনন্দাকে মেলে আজন্ম আনন্দে
আশায় নৈরাশে দুঃখে সুখে মানবিক নানা ছন্দে,
সেখানে সান্ত্বনা মাত্র প্রেমেই—বা প্রচণ্ড ঘৃণায়—
অর্ধনারীশ্বরে একই—বিশ্বে প্রতিবাদী বাহুবন্ধে ॥
৯ ফেব্রুআরি, ১৯৬৭

অন্য রঙ্গমঞ্চে

সারাটা জীবন বুঝি একলব্য মননের মল্লমঞ্চে
পেশির চর্যায় যাবে ? ঝুলন বা রাসের হর্ষ
কিংবা যৌথ নৃত্যোৎসবে বা গানের দোলায়
বিচ্ছিন্নের উঞ্ছবৃত্তি চৈতন্যের তীব্র বিপ্রকর্ষ
কোনোদিন মেলাবে না একতায় এই চিরমর্ষ
ব্যক্তিকে কি তার ব্যস্ত হাটখোলার ইঁটখোলার গঞ্জে ?

অবজ্ঞা ও আত্মদান, ক্রুদ্ধ ঘৃণা আর ভালোবাসা,
বঞ্চক ক্ষমতা আর যত ধূর্ত তীরন্দাজ প্রাত্যহিক আশা
মিলবে না কোনো কুরুক্ষেত্রে, কোনো বিশ্বরূপ সত্যে,
কোনো সমীকরণের নবন্যাসে স্বয়ম্বশ মৌল একতার তত্ত্বে ?
পূর্ণ হয়ে এল প্রায় চৈতন্যের জাগরণে পঞ্চাশৎ বর্ষ,

দ্বিজোত্তম সত্যকাম সে শিশুকে হেনে যাবে অন্ধে মৌনে খঞ্জে ?

প্রৌঢ় হৃদয়েরা চায় সুস্থ শান্তি মননের অন্য রঙ্গমঞ্চে ॥
১৯৬৭

যেন চর্যাপদ

(আশাবরী যোগিয়া
Il Vecchio Castillo—Moussorgsky)

নাই-বা ঘুম ভাঙল, আহা না হয় নাই ভাঙল !
তোমার ঘুমে আমার প্রাণ জাগ্রত সদাই,
হায় রে ! লছিমা ।

না হয় পুবে আমার নীল হৃদয়টাই রাঙল !
আমার চোখে তোমার মুখজ্যোৎস্না বরদাই
দু চোখে, লছিমা ।

কোথায় ঘুম-জাগার সীমা, স্বপ্নেই যে জানল
হিন্দোলে বা রাসের হিমে চর্যা সুখদাই
সদাই লছিমা ।

যাই না সাজো, সদাই তুমি, যেদিন থেকে হানল
নশ্বরকে অমর প্রেম, জানি, প্রিয়ংবদা,
স্বপ্নে লছিমাই ।
নাই বা ঘুম ভাঙল দিনরাত্রি নাই ভাঙল ।

সকালের চতুর্দশপদী

সকাল নয়, ভোরের আগে কাকজ্যোৎস্না-গানে
শ্যামার ফোটে হঠাৎ স্বর, কোকিলা গেয়ে ওঠে ।
অবাক ঘুম স্বতই ভাঙে, নতুন খুশি জাগে ।

তোমার চোখে ক্লান্তি কেন ? এ ভুল একজোটে
এসো না দেখি, দরজা খুলে আকাশ ধরি প্রাণে,
নয়ন-ভরা আলো তোমার আমার অনুরাগে।

মেঘলা অমাবস্যা আজ নাই-বা হল ভোর,
কালোর শাদা ভালোই খোলে সংগঠিত রঙে।
তাইতো এও অবাক করে, খুশিতে প্রেম জাগে।

দুঃসময়ে যে কোনো রাতে দুখের নাহি ওর !
পাংশু আলো আজকে সোনা, দেখ আরেক ঢঙে।

ইতিহাসের চির-মাথুর পূর্ব-রাগে লোটে,
হাজার পাখি রাত্রি ভাঙে একটি কলতানে।
তোমায় গান দিয়ে জাগাই ভোরাই সংরাগে ॥
২৬ ফেব্রুআরি, ১৯৬৭.

সুতরাং

নিঃসঙ্গ বৈদগ্ধ্যে বন্ধু, যন্ত্রণাই, শূন্যে শিল্পচর্চা
প্রেমের মতোই ব্যর্থ।
তোমার ব্যথায় ব্যথী আমি
বুঝি জ্বালা দৈনন্দিন, কিন্তু কেন্টিশ্ কুমারস্বামী
কেউ নই, প্রবাসী আনন্দে নেই মনের কড়চা
সে কথা জন্মেই বুঝি, যতই না পশ্চিমা ভাষায়
মনন মন্থিত হোক্, মর্মে মর্মে মাতার অঞ্চল
কালীয়দমনে দেয় কলকাতারও গেরস্ত বাসায়
সত্য ছায়া।
শ্বেতাঙ্গ তুষারে মন বৃথাই চঞ্চল।

সুতরাং এ যন্ত্রণা ভোগ করি এসো ধ্বন্যালোকে
গৌড়ীয় মল্লারে পটে প্রাত্যহিক রৌদ্রের নির্মোকে ॥
২৮ মার্চ, ১৯৬৭

গোটা মাটিই মন্দির

মন্দিরের দেশ ছিল, গোটা মাটিই মন্দির।
এখন লোপাট সব, ভাঙা-চোরা রক্তিম মাটির
চতুর্দিকে ভগ্নস্তূপ, শতছিন্নভিন্ন মূর্তি।
নেই সেই গোপাল ছেলেরা, রাখালের খেলা নেই
প্রাণের অস্থির কৈশোরের স্ফূর্তি নেই।
যৌবনের সম্মিলিত মেলা নেই, রাস ভাঙা, মেলা নেই,
ধুঁয়ার ছলনে কাঁদা পরিপাটি কৌতুকের খেলা নেই।

খুঁজে খুঁজে বৃথা ঘোরা, মন চোখ পায়না চেনাকে
যা ছিল সুন্দর স্বপ্ন, শুধু দেখা ঘায়ে ঘায়ে—মারে মারে
সব চূর্ণ ধূলিসাৎ মতিচ্ছন্ন শৃগাল দাপটে, শুধু আছে তেপান্তর
ব্যাপ্ত জনপদে শুধুই ধ্বংসের শূন্য রূপ,
নৃশংস লোভের শতক্ষতে অন্ধ দগ্ধ।
কোনো মূর্তি ওঠে না দুচোখে, নেই
এমনকি কালীয়দমনও ॥

তন্ত্র যদি মান্য হয়

তন্ত্র যদি মান্য হয়, মাতৃতন্ত্র মনে হয় শ্রেয়,
মালাবারে বাংলায় যেমনটি ছিল পুরাকালে।
পিতৃতন্ত্রে বহু দায়, নির্বাচন রসালে মাকালে।
এবং কিছুতে মাতৃভাষা ভোলে না যে সেই হেয়

কারণ ভাষাই নদী, বাপী, ঝর্না, চৈতন্যের কূপ।
এবং জল-ই যদি নাই পাও, খানাপিনা কোথা?
মননেরও ভ্রূণ-সাধ নিরুদ্দেশ, বিকল বিরূপ
সর্বচ্যুত ব্যক্তিত্বের চর্চা বৃথা, সর্বদা, সর্বথা ॥
১ এপ্রিল, ১৯৬৭

তবু রাবীন্দ্রিক প্রাণ পেল

তাই ওরা হেরে গেল। আমাদের লক্ষ লক্ষ মন
মৃত্যুতে উন্মত্ততায় কর্দমাক্ত করে দিয়ে গেল।
তবু ওরা হেরে গেল, উজ্জীবিত শক্তির নির্ঝরে
মত্ততা হারাল মাথা, ঘৃণ্য মৃত্যু লজ্জার কোটরে।

হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে। ষড়যন্ত্র সযত্নে গোপন
রেখেছিল, দুঃসংবাদ বাংলা রৌদ্রে হাওয়া নিয়ে গেল
নির্ভীকের ঘরে ঘরে, তারা শুভবুদ্ধির নির্ঝরে
পথে পথে ক্ষিপ্রপায়ে শান্তিধারা ছড়াল শহরে।

হেরে গেছে ওরা। গায়ে লজ্জার গ্লানিই, তবু মন
রাবীন্দ্রিক প্রাণ পেল ত্রিকালের ত্রিশূলপ্রহরে ॥
৬ এপ্রিল, ১৯৬৭

আমিও তো যেতে চাই

আমিও তো যেতে চাই জন্মাবধি, যেখানে নির্ঝর
স্ফটিক-চঞ্চল আর ষড়ঋতুই মধুর-মুখর,
যেখানে রৌদ্র ও বৃষ্টি নিয়মিত মৈত্রীর আকর,
দুহাতে সঙ্গতে বাঁধে প্রত্যেকটি জীবনের প্রতিটি বৎসর।

পেতে চাই স্তব্ধ শান্ত পৃথিবীতে শুচি মহাকাশে,
দুদিকে মরাই ভরা, সুগঠিত শহর দুপাশে,
যেখানে মানুষ মুক্ত, প্রতি ব্যক্তি সংলগ্ন প্রত্যাশে,
শতায়ু বিনাই প্রতি মানুষ অমর ॥
২৬ এপ্রিল, ১৯৬৭

নির্মনন ? ঠিক তা না

নির্মনন ? ঠিক তা না, মন তার ঊর্ধ্বশাখ দেহে ।

শরীরটা যেন তাপমানযন্ত্র, থম্‌থমে গরমে
ঝিমোয় গাছের মতো, জন্তু কিংবা পাখি ; রোমে রোমে
আকাশের স্মৃতি জাগে, শিথিল আরামে—মা'র স্নেহে
যেন শিশু, স্তব্ধ স্থির চৈতন্যের বিস্তারে অবাধ
বিলায় নিজেকে নীল বনে বনে পার্বত্য আকাশে,
যেন বা জাগাই স্বপ্ন, বুঝি ঐ বুকফাটা ঘাসে
বৃষ্টিতে সিঞ্চিত জল তার বক্ষে সুনীল অবাধ
সমুদ্রের আবিশ্ব নিটোল অনন্ত প্রতীকে ঝরে—
আজকে বৈশাখী ঝড়ে কাল ছাদে জ্যৈষ্ঠের ঝারিতে
যেমনটি দেখা যায় পুরুষের ঘনিষ্ঠ নারীতে ।

নির্মনন ? বলা যায় ইন্দ্রিয়োজ্জীবিত, অগোচরে
দ্বন্দোত্তীর্ণ দেহমন ষড়্‌ঋতুর হরেক আরামে
ছড়ায় দু বাহু তার মহাদেশে মাঠে ঘাটে গ্রামে ॥
২৭ এপ্রিল, ১৯৬৭

দ্বান্দ্বিকে সম্বাদী

গ্রানিট পাহাড়ে জন্ম, তাই তার নিরম্বু সত্তায়
নদীস্রোত নিয়ত উপমা,
কখনও প্রাণের বন্যা, কখনও বা বালিতে সোঁতায়
চৈতন্যপাতালে করে ক্ষমা ।

সমাজে এককে দেশে দশে তার ঊর্মিল সংহতি,
ব্যক্তিগত, বাংলায়, ভারতে ।
এই পাড়ে আশাভঙ্গ ? ও পাড়ে সে পূর্ণ করে ক্ষতি,
বিশ্বব্যাপী দুর্গতে সৌগতে ;

যেহেতু কাদায় নয়, আদিম পাথরে তার আদি,
চাই তার অন্ত অন্তহীন, সে যে দ্বান্দ্বিকে সম্বাদী ॥
১৭ জুন, ১৯৬৭

এবারের গ্রীষ্মে

দিঘি ফেরার, নদীর চোখে সাহারা,
পথ ঝিমায়, গোচর পিঙ্গল,
আকাশ ধোঁয়া, চাপা আগুন গলে,
গ্রামে গ্রামান্তরে কান্না জ্বলে,
উপোসি কথা কয় অনর্গল,
হঠাৎ-হঠাৎ এদিকে ওইদিকে
গন্ধে রঙে কাদের স্থির পাহারা !
কঠিন গাছ, নিথর লতাপাতা,
হঠাৎ প্রেম জাগায় জয়গান,
আকাশ কাঁপে, শিহরে ধুলা ছাপায়,
ফুল ফোটায় যেন বা এক গাঁতা,
নানান রঙে অপরাজিত চাঁপায়
গন্ধে মাটি বিভোর দিনমান ।
শুকনো মাটি আর আকাশ কার
প্রাণ সত্রে করে যে জলদান !

কৃষ্ণচূড়া মেশে রাধাচূড়ায়,
শিরীষে আর দেশি লেবার্নমে ।
পাণ্ডু দাহ হারে প্রাণের জিতে ।
শিশুরা আমবাগানে কি যে কুড়ায় !
সাঁঝে সকল খোঁজাই থামে সমে,
শূন্য গোলা উঠানে একাদশীতে
শুভ্র শত মল্লি বেলি জমে
—যেন অজিত হো-চি-মিনের ধৃতিতে ॥

১৮ জুন, ১৯৬৭

কারণ মর্ত্য মাতা আমাদের

দূর দিগন্তে শুধু চোখ নয়, মনও
সে কী আরোগ্যস্নানের মুক্তি খোঁজে কালবৈশাখে ।
আকাশে মানুষ যোগাযোগে বুঝি কোনো
আশ্বাস পায় মানবিকতার মর্ত্য দুর্বিপাকে ।

তাই কি বিদেশে স্বপ্নের বিস্তানে
গঠন করে সে আকাশ-বিহার চন্দ্রলোকের ধ্যানে ?

আমরাও বুঝি প্রাণধারণের বোঝা
আকাশে ওড়াই ঝড়ে বৃষ্টিতে বাংলার সমতলে,—
বস্তুত নই পলাতক, যত বকুনি ঝাড়ুক ওঝা।
জীবন—বা আধি-ব্যাধির মুক্তি নিরুদ্ধ অর্গলে

কবে কোথা মেলে, মরচে ধরা এ দৈনিক শৃঙ্খলে ?
কার মন বাঁচে চোখ বেঁধে ? বৃথা বালিতে মাথাটা গোঁজা।

স্বচ্ছ আকাশে আলোয় মুক্তি, শুদ্ধ অন্ধকারেও।
আমরা দিনের গ্লানিকে ওড়াই শূন্যের বাস্তবে,
কারণ মর্ত্য মাতা আমাদের বাতাসের পরপারেও
পিতৃলোকের বাহুতে বদ্ধ সৃষ্টির উৎসবে।

তাই বুঝি নীলে চোখের মিছিল, ঝড়ে প্রাণ মেলে রাখা !
তাই প্রত্যয়, ওরে বিহঙ্গ ! এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা ॥
২১ জুন, ১৯৬৭

প্রত্যাশিত ছিল নাকি

প্রত্যাশায় ছিল না সে।
নিরাশ প্রান্তরে মৃত্যুর চতুর ফাঁকি ছাড়া
ভাবি নি যে আর কেউ আসে।

কেনই বা আমাদের নিঃসঙ্গের ভিড়ে
আসবে সে ? দিনগত ক্লান্তির এ খরা মরা মাঠে
বৈশাখী বিদ্যুতে ঝরে উল্লসিত ধারায় ধারায়,
রাত্রি করে দেবে ভোর, এনে দেবে ফের
পাড়ায় পাড়ায় জীবনের সাড়া,
উজ্জীবিত গান্ধিজির হাত ধরে উপস্থিত যেন বা লেনিন ?

প্রত্যাশিত ছিল নাকি, দিন আর রাত্রি, প্রতিদিন ?
যেহেতু আমরা কাঠচাঁপাও না, আমাদের বিচ্ছিন্নের ভিড়ে

আসে নি সংবাদ বুঝি অদৃশ্য হাওয়ায়,
দুরুদুরু তালে তালে, শুনেছে যা আমজাম পিপুলের
অগণন নীড়ে, যারা মুক্তির আকাশে আসে যায় ?
প্রত্যাশা ও হতাশার কিবা অর্থ ফাঁকিদার, অপ্রস্তুত
এমন ভুলের ?
২৫ জুন, ১৯৬৭

স্বপ্নে দেখি পুরাতন মিতাদের

'মেঘেরা জড়ায় গিরিচূড়াদের, গিরিচূড়া বাঁধে মেঘেদের,
'নিচে ওই নদী আয়নার মতো ঝিকিমিকি করে স্বচ্ছ।
'পশ্চিম গিরিমৌলিতে ঘুরি, হৃদয় আমার চঞ্চল
'দক্ষিণাকাশে তাকিয়ে, স্বপ্নে দেখি পুরাতন মিতাদের।'

আমার মনে বাঁচে অনেক মিতা,
কেউ বা পুরাতন, বহু নূতন।
মেঘে জড়ায় বটে চূড়াও আমাদের।
স্বপ্ন খোঁজে তবু সারাটা ত্রিভুবন।
নেভাও আমাদের হাজার চিতা।

হে গিরিচূড়া, শোনো, তোমরা গড়ো
আজকে স্বপ্নকে আকাশস্পর্শী !
কেন যে আমাদের হৃদয় অনীহায়
অসাড় আধঘুমে-জাগায় জড়োসড়ো !
ছড়াও আলো-ছায়া স্বচ্ছ নদীতে,
হব না কেন বলো ত্রিকালদর্শী ?

জড়াক গিরিচূড়া সাহসী মেঘেদের
মেঘেরা চূড়াধারী অসীম অভয়ে
নামায় হিম-নদী হাজার বাহুতে,
তা দেখে মৃত্যুর দস্যুদানবেরা
পালায় বানচাল গুপ্তি পাতালে।

বোমারু বানে ভাসে সে হিমবাহুতে।

বিশ্বের যত গিরিচূড়া বাঁধো বিশ্বের মেঘমন্দ্রে ।
আয়নার মতো হৃদয়ের মতো নদী ঝলসাক স্বচ্ছ ।
পুবে পশ্চিমে গিরিমৌলিতে অবাক তাকাই, দুর্জয়
দক্ষিণাকাশে ইতিহাস মাতে, স্বপ্নে দেখেছি মিতাদের ॥
২৬ জুন, ১৯৬৭

বৃষ্টি বিষয়ক টুকরো চিন্তা

তরুণ-তরুণী খেলে নবীন প্রেমের রঙ্গে ;
তা খেলুক, শিক্ষার্থীরা নাট্যে অনভিজ্ঞ, বোঝা যায় ।
অসময়ে মনস্থির করা চলে অনেক শপথ-ভঙ্গে
যৌবনে অধীর প্রেমে । বয়সে তা যোঝা যায় ।

কিন্তু রৌদ্রবৃষ্টি, যারা পৃথিবীর প্রথম প্রেমিক,
যুগল-নিয়ম যদি নিরম্বু-বাক্যেই সারে, তবে ধিক্ ধিক্ !
কি আকাশ কিবা মাটি কি মানুষ অঙ্গে ভঙ্গ বঙ্গে
সাধে বলে, জল হল পৃথিবীর আদি মহাদায় !
৫ জুলাই, ১৯৬৭

একশো দেড়শো বছর আগে

আমাদের চিত্ত জিনে এরা এল দিগ্বিজয়ী বীর—
কুরুক্ষেত্রে মুক্তিস্নাত, অভিনব অশ্বমেধ ! আবেগে অস্থির
আমাদের কোটি কোটি পাণ্ডবের একাত্ম হৃদয়ে
পার্থ পার্থসখা যেন পাঞ্চজন্যে গাণ্ডীবে বিজয়ে ।

আমাদেরই স্বপ্ন এরা বাস্তবিকে মূর্ত প্রাণময় ।
অক্ষত অক্ষয় রাখি স্বপ্নগুলি প্রতিদিন সতর্ক তন্ময় ॥
১৯৬৭

পশলা পশলা বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে

আষাঢ়ের স্বচ্ছ নীলে স্তব্ধ মেঘমল্লার বাহার।
কলকাতার নিস্তরঙ্গ সন্ধ্যার আকাশ ছেয়ে বয়
চেতনার শত নদী, অজয় কাঁসাই গঙ্গা পদ্মা কিংবা বাংলা সমুদ্রই–
কোমলের অনন্ত বিস্তার, কিন্তু স্তব্ধ বর্ণাঢ্যে তন্ময়।

সন্ধ্যার আকাশ আহা হৃদয়েরই বাংলা প্রকাশ,
বাংলার হৃদয় হতে আদিগন্ত জননীর মতো
স্নেহঢালা অথচ সংবৃত, স্থির, আত্মস্থ, সংহত
ধ্যানবাক্যে —সদ্‌গময়।

সমস্ত দিনের গ্লানি আসন্নের আমেজে শীতল।
মাটি চায়, মন চায়, দেহ চায়, মানুষের সমস্ত জীবন
চায় জল, চায় ঘনশ্যাম প্রেমে অঝোর কীর্তন।

আশ্চর্য, যে ভূগোলতত্ত্বেই বাঁধা সৌন্দর্যের মৌলিক চেতনা!
রৌদ্রমেঘবৃষ্টি দ্যাবাপৃথিবীর গানের চিত্রের আদ্যে!
আজও তাই চুয়াত্তরে ক্রন্দসীতে আঁকে গায় পৃথার বেদনা,
রাবীন্দ্রিক সুন্দরের সাধ মেশে কৃষকের শ্রমসাধ্যে।

যখন আকাশে স্থির মহানদী কিংবা মহাসমুদ্রই
এবং রঙের বন্যা মেঘে নীলে কৈলাসগম্ভীর,
তখনই কি জীবন-জীবিকা শিল্পে সংবেদনে একটি অর্থই,
প্রাকৃতিক-মানবিক, রূপের সাযুজ্যে স্ফূর্ত সৃষ্টিতে অস্থির?
৫ জুলাই, ১৯৬৭

একটি নদীর দুটি দৃশ্য

কখনও সে পাথরে বালিতে
স্ফটিক নির্ঝর বেগে নাচে,—চেনা, নিরাপদ নদী,
টিলায় টিলায় শালপলাশের পাড়ের ঢালুতে
গ্রাম্য শিশুদের খেলা, গোচারণ, নিরুদ্বেগ গোধূলি অবধি

আবার কখনও খ্যাপা, যেন তাকে শ্মশানকালীতে
ভর করে, গরুমোষ ছুঁড়ে মারে, পাথর ভাসায় ;
পাড় ভাঙে, ভুলে যায় দুই পাড় নিজ প্রণালীতে
বক্ষে সেই বেঁধেছিল, গোটা বিশ্বকে সে শাসায়, আছড়ায়,

সবাই যেন বা শত্রু, রুদ্রের বুকেই নাচে নদী ।
অথচ প্রত্যহ সেই বাড়ে অন্নব্যঞ্জন থালিতে ।
আবার পাতবে পাত্, অন্নপূর্ণা অন্নজল নাই দেয় যদি
তাহলে সে নদীই না, রুক্ষ লুব্ধ মরু মাত্র বুভুক্ষু বালিতে ॥
৭ জুলাই, ১৯৬৭

চেনা মুখের আদল

এই মুখে বহু চেনা মুখের আদল ।
শাড়ির ও কাঁচুলির উদ্ধত সংক্ষেপে
ভিন্ন রূপ, তবু কত মেয়ের মায়ের
স্মৃতি মুখে স্মিত, শত চিকন প্রলেপে
এ মুখ সাবেক, দেশি, বাংলা মনের
ঐতিহ্যের ছবি—যেন যামিনী রায়ের ।

চেনা আরো স্পষ্ট হল, যেদিন বিকেলে
হঠাৎ সে অন্তরঙ্গ, আবেগে তন্ময়
অন্যদিকে চেয়ে চুপ, ডান পাশে হেলে
মৃদু কথা বলে, উপলক্ষ—শ্রোতা নয়,
উভয়ের চেনাজানা যে অন্যজনের
ব্যথা তার দুই চোখে নামায় বাদল—

সারা মুখে বাংলার আপ্লুত আদল ॥
১৪ জুলাই, ১৯৬৭

একশো বছর পরে

এসো পিছু পিছু, যত ভদ্রমহোদয়
যা বলে বলুক, তুমি থাকো উচ্চশির
অটল মিনার, ঝোড়ো হাওয়া বৃথা বয়। —দান্তে : পুর্গাতোরিও, ৫

একশো বছর পরে

কেন যে আবার এত পথ ! ভাঙা, বাঁকা পথ,
কাঁটা-ঘেরা, লোভনীয় সোজা, চোরা পথ !

হয়তো বা শোনা যায় গোলক ধাঁধায় অদৃশ্য শিশুর হাসি,
হিংস্র হাঁকের ফাঁকে হয়তো বা বাঁশি বাজে
বনের আড়ালে এই কালের প্রান্তরে
দূরদেশি রাখাল ছেলের।

তবু গন্তব্য হারায় গ্রামশহরের দিবারাত্রি-উদ্‌ভ্রান্ত রাস্তায়
পদে পদে নির্বাচনে দিশাহারা, দেশে দেশে,
চতুর মরুতে কিংবা দুর্বুদ্ধির পঙ্কিল ধারায়।
ভিয়েতনাম নেপামে পোড়ে তাই,
পুবে ও পশ্চিমে, এদেশে আজকে, কাল ওই দেশে
অনেক শকুন ওড়ে।

এ বড় অদ্ভুত মর্মান্তিক পরিহাস !
অথচ পথের চিহ্নে বিস্তৃত ভূগোল
আর দীর্ঘ ইতিহাস পেয়েছিল আবিশ্ব পথিক
সে কবে সেকালে, অনন্যপ্রতিভা, অসামান্য জ্ঞানে
ধ্যানী শ্রমের প্রজ্ঞায়, দিনগত জীবনের সমবেদনায়,
ডাস্ কাপিটালে !

এবং সে মহাকাব্যে একালের সম্ভাব্যেরও শেষ কলি বাজে
কৈলাসিত নিশ্চিত মাত্রায়, যেন তূর্য গর্জে চিরবিস্মিত সন্ধানে
ধূর্জটির যুগ্ম-নৃত্যে।
ত্রিনেত্রে সম্পাতে দেখা যায় কেবা শত্রু কেবা মিত্র,

মননের অনন্ত আহ্বানে, আমাদের মানবিক সুখেদুঃখে
কঠিন অথচ এক স্থির লক্ষ্যে দৈনিক যাত্রায় ॥
১৭ জুলাই, ১৯৬৭

এরা বলে, সবই ঘটে শ্রীকৃষ্ণের কুটিল আশ্বাসে।
বৃষ্টি চাই হাঁক তুলে তাই ভীম মারে বজ্রাঘাতে!
(কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় বুঝি), আত্মীয় ও কুটুম্বনিপাতে
দুর্যোধন অশ্রুজলে ভাসে, দেখে যমুনারও মকরেরা হাসে!

এরা বলে, সবটাই পার্থসারথির পক্ষপাত,
ইতিহাসে নারায়ণী পক্ষপাত রথের ঘর্ঘরে।
পাশাই শুধু কি দ্যূতক্রীড়া? বলে, তাই বৃষ্টি ঝরে?
তাই কি ভাসায় বানে হস্তিনার মস্ত গড়-খাত্?

প্রশ্নটা দুর্বোধ্য নয়, কেন নগ্ন দুঃশাসন শাড়ি-পরিহিত।
কিন্তু এই হাসিকান্না সবই অক্ষকীট-নিয়ন্ত্রিত ॥
১৯৬৭

আশা যেন মাতৃভাষা

মনে হয়, আমাদেরই ভুল।
ধৈর্য তার চেতনায় মজ্জাগত নদী,
তাই তিক্ততার ক্রমান্বয়ে স্রোতোত্তীর্ণ আশা তার।
প্রস্তুত মাটিকে যত জঙ্ঘতৃণ করে, মারে হরেক বর্বর,
ততই জোগায় প্রাণ উলূপীরা, তলে তলে ফল্গু ফল ফুল।

জৈবিক? হতেই পারে। কিন্তু মানুষেরা
জৈবিকে বা প্রাকৃতিকে বস্তুতই মানবিক, স্বাভাবিক।
জীবকে হত্যায় কেন সে হবে জর্জর?

দেখ নি কি চিত্রল-হরিণী, কান পাতে, ঘ্রাণ পায়,
পল্লবিত নীলাকাশে নৃত্যের আবেগে ছুটে যায় প্রাণের আশ্বাসে,

কিংবা ধরো গভীর বনের শিকারীর অচেনা বাঘের
অগ্নিময় সুস্থ্ চোখ বৈশাখী হিরণে আর প্রবল শ্রাবণে ?

একমাত্র সেই আদি নিয়মের বশবর্তী, জৈবিক স্বেচ্ছায়,
তিতিক্ষায় ; তাই লোকটির পাশে
আমরা আভাসে পাই আশার আরেক অর্থ,
বাজারের ঐ পারে, ব্যাপকে গভীরে আরেক আরতি,

শরীর-মনের অদ্বৈত বিন্যাসে মৌলিক শুচিতা,
ইন্দ্রিয়ে-মননে এক স্নায়ুজয়ী যুগান্তরের দীক্ষায়
দেখি প্রাচীন পৃথিবী আমাদের অশ্রুস্মিতা
আমাদের দীর্ঘজীবী আশা ।

আশা যেন মাতৃভাষা, অজেয় চিরায়ুষ্মতী ॥

মানুষ যে

বনে ডুবে যাক, নাকি শান্তি : ঘৃণার কুলকুচা ?
ভারতীর ভিতে ঘর, দুস্থ বটে, ভাঙা আজ বাসা ;
তবুও মানবগর্ব মৃত্যুহীন । ভক্ত নই প্রয়োগতন্ত্রের,
সুবিধাবাদের গর্তে উপযোগ স্বভাববিরোধী ।
সুতরাং যদিও বা শত্রু হয় দুরন্ত, প্রত্যাশা
সর্বদাই শুভবুদ্ধি, সম্প্রতি সত্যের অসত্যের
সীমা প্রায় লুপ্ত, অধিকন্তু শক্তি দেখি নিরবধি
নির্মম নির্লজ্জ । এবং আমরা সে শক্তিতে উদাস,
আমরা যে মানবজীবনের সহিষ্ণু প্রেমিক । মানি,
দীর্ঘকাল নিজবাসভূমে আমাদের পরবাস
হয়তো বিচ্ছিন্ন করে গেছে দেশে কর্ম আর বাণী ।
তবুও লজ্জায় মরি, মানুষ যে !—কী করে যে হানি
শঠে শাঠ্য, যদিই বা সিঁধ কাটে ইঁদুর বা ছুঁচা !

আমাদের কবিতা প্রত্যাশা

এখানে সবাই দেখি মাটি আর মাটির মানুষ।

অনেক শতাব্দী বেয়ে মাটির চেতনা আজ বুঝি সোঁতা বালি,
সজীবের সবুজের সরসের মরুভূমি
নির্জলায় নিষ্ফলায় গেহেনায় গোমোরায়।
এরা কিন্তু শ্বাসরুদ্ধ তাপ সয় অবহেলে,
হয়তো যা ধনিক বোমার উন্মাদ দাহেরই মতো ভয়ঙ্কর—
শত অভ্যাসিকতায় ভারতীয় বিষাদ সত্ত্বেও।

প্রত্যাশাকে স্বপ্নের শিকায় তুলে আগত বন্ধুও ভাবে খালি
এই মাটির ক্লান্তিতে কখন নামানো যাবে মেঘের পৌরুষ।
আর বজ্রে ও বিদ্যুতে ওই এল কে মৌসুমী আরবার!
হয়তো বা সাময়িক বন্যার বিভেদহীন প্রাবল্য সর্তেও
আসে তৃষিত শান্তির জল সকলের,
আপাতদৃষ্টিতে নয়ছয় কারো কাছে কখনও বা প্রলয়ঙ্কর।

তারপরে রুক্ষ দগ্ধ ডুবে যায়, পাথরে কাঁকরে আকাশকুসুম
আর শস্য জাগে শষ্প ফল ফুল আর ঘরে মাঠে মানুষ, মানুষ
তাকায় তখন সেই মরিলে না মরে রাম অমর্ত্য আশায়।
অনেক শতাব্দী ভ'রে বছরে বছরে যে আশা অক্ষয়—
সেই বুভুক্ষায়, কারণ আশাই যেন নশ্বরের শ্রেষ্ঠ ক্ষুধা,
অত্যন্তাভাবের জয়।

শহুরে শরীরে এই মাটি-আকাশের উদ্যত ভাষার ভাপ লাগে,
অসহ্য গরম, এমন কি দাহ নেই, নেই বিশ্বযুদ্ধ অন্তর্যুদ্ধ
হয়তো বা নেই সেই সুস্পষ্ট গৌরব।
শুধু আছে বীজকম্প্র দৈনন্দিনে বিশৃঙ্খল প্রতীক্ষা—গুমোটে যেন
অবশ বসুধা,
চায় কিছু জল, সময়ের নিয়ন্ত্রণে
যেমনটি, ধরা যাক, একুশ বাইশ থেকে চেয়েছিলেন লেনিন
প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজ কালজয়ী প্রশান্ত অটল।

তাই বুঝি পুবে হাওয়া! আর উত্তরে পশ্চিমে উধাও আশ্বিন
ডেকে আনে দক্ষিণের সামুদ্রিক মিতাদের

সপ্তাশ্বের শতবর্ণ বাদীপ্রতিবাদী মহিমায় ঐকতান :
হে বন্ধু এবার আর নয় জীর্ণ বিবাদীর গান !

আর বাহুবদ্ধ সিক্তবাস পৃথিবী-ক্রন্দসী নিয়ে আসে ধানী রঙে
হেমন্তের দিন ।

শুনেছি তাই তো এনেছিলেন লেনিন ।

তারই হাওয়া গায়ে লাগে অধমর্ণ শহুরে শৌখিন উল্লাসে সন্ত্রাসে ।
আর মর্মরিত মনে হয়—এখানেও বাঁচে বুঝি এপাশে ওপাশে
পঞ্চাশৎ বহু বীর ।
এমন কি একদা বিশ্বের মুক্তি-প্রিয় দিউগাশভিলিও !
লক্ষ লক্ষ বহু মুখ ।
(বুখারিন মলোতফ মানবেন্দ্র ভরশিলফ বুদিওনি ট্রটস্কি ইত্যাদি !)

মাটিতেই প্রাণ জাগে আকাশের বক্ষলগ্ন পৃথিবীর নবভাষ্যে ।
যে মাটিতে অক্টোবর উপনীত দ্বিজ নভেম্বরে ।
আর লক্ষ্মী পূর্ণিমারা হাস্যে-লাস্যে ঘর ভরে কোজাগরে ॥
৭/৮ অক্টোবর, ১৯৬৭

৭ই নভেম্বরের রোজনামচায়

শান্তি এখানে সারাদিন ঝরে ছয় ঋতুতেই শিশির ।
মুক্তি এখানে অবিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তির সমারোহ,
নির্জনতায় সমীকৃত হয় জনতার প্রতিভাস ।

স্বচ্ছ জীবনযাত্রা লোভেও অপাপবিদ্ধ অস্থাবির,
দিনের রুজির দুরূহ সরল দুস্থতা নির্মোহ ।
প্রাজ্ঞের কথা স্পষ্ট করেছে : প্রকৃতি কেমন মানুষের ইতিহাস ।

শহুরে ধোঁয়াটে গৌণতা গড়ে অশুচি কড়ির পাহাড় ।
প্রেম মরে তালবেতালের নানা ছলায় গঞ্জে গঞ্জে,
রাজনীতি সাজে নীতি ছেড়ে মূঢ় শক্তির ক্রূর পাশা ।

ধনিকরাজের বণিকতনয়া নিলাজ নাচের বাহার

দেখায়, মাতায়, ডাক দিয়ে যায় অন্ধে এবং খঞ্জে,
কান্নায় ভিজা মুখে বীভৎস হাসে উদ্বায়ু ভাষা।

ঐখানে প্রকৃতি রিক্ত, তাই কি মানুষের মহাযুদ্ধ
স্বচ্ছ সরল ? সাংবাদিকতা নয়, বরঞ্চ কবিতা,
কিংবা গানের মতোই। গুপ্তি মন্ত্রণাসভা নয়।

এদেশে নগ্ন বক্ষ করেছে ক্ষুধায় ক্ষুধায় শুদ্ধ,
তাই কি সকাল-সন্ধ্যা মুক্তি, তাই বরেণ্য সবিতা
রাঙায় পাহাড় মাঠ খেত বন সমান জ্যোতির্ময় ?

বিদেশে যায় না চালান্ শস্তা মানুষের কালো হাড়।
প্রকৃতিমানুষে বিস্তার করে পূরবী এবং বিভাস,
ভোরে শুকতারা সন্ধ্যাতারায় প্রতিদিন জ্বালে বাসা—

স্বপ্নেরা তার পক্ষধ্বনিতে বিজ্ঞানে তন্ময়।
হারানো মানুষ প্রকৃতিতে পাই মানবিক ইতিহাস
মৌলিক পরিপ্রেক্ষিতে পথে দীর্ঘ দিশারী বহুদেশব্যাপী পাহাড় ॥
৬ নভেম্বর, ১৯৬৭

প্রেমের জীবনস্বত্ব

সূর্যাস্তের ইন্দ্রধনু আবার যেন বা কোনও পার্থ ধরে
সূর্যোদয়ে উপমা প্রত্যহ
দেখি আর ভাবি এই ন্যায়যুদ্ধে স্বার্থ আর অনর্থ অম্বরে
অনন্ত ব্যাপ্তিতে পায় আরোহী ও অবরোহী-উত্তরণ,
কিবা রাত্রি কিবা দিন বারমাস্যা অহরহ।

ঘৃণার স্বরূপ দেখি সর্ববস্ত্রহরণের পর্বে পর্বে,
অথচ প্রেমের রাত্রে শুকতারায় প্রতিভাত হয় মর্ত্য।
হে পৃথিবী ! দৈনিক তোমার সত্যে জীবনযাত্রার গর্বে
প্রেম পায়, যা সে চায়, চিরকাল, প্রেমের জীবনস্বত্ব,
সুখবহ দুঃখসহ, প্রেয়সী ! তোমায় ॥
৬ নভেম্বর, ১৯৬৭

এরা কারা গায়

অদ্ভুত গান ! এই্ পৃথিবীর কান্না ?
তন্ময় সব প্রাণের প্রতীক্ষায় ।
এরা কারা গায় ! দেশ বিদেশের ওস্তাদ
কোথায় মিলেছে ? কোন্ তানসেনী দীক্ষায় ?
স্বরগ্রাম ফাটে, এ যে কার ফরিয়াদ !

দশদিক ভাসে আমাদের এই্ কান্নায়,
তন্ময় শুনি, তিক্ত তিতিক্ষায়
প্রত্যহ মরি, তাই্ আর স্থির গান নয়,
বাজে বিদ্যুতে গানের প্লাবনে জেহাদ !
মুঠি মুঠি আনে ব্যাপ্তি বিশ্ববীক্ষায় ।

আহা এ কী গান ! বন্যায় জ্বলে খাণ্ডব ।
তারায় তারায় সারগমে হয় ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প,
একাকার হয় পাতালে ওদের শব
লক্ষজনের একলব্যের শিক্ষায় ।

ওরা কারা তবু ডালে ডালে করে মরিয়া লম্ফ ঝম্প ?
২৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮

অকাল বৃষ্টি ফোঁটা ফোঁটা

ক্লান্তিতে যখন মেশে কলকাতার সন্ধ্যার বিষাদ
তখন কী-ই্ বা করা ?
একা একা এ পথে সে পথে হেঁটে মরা ছাড়া
—অবশ্য ডাক্তারি মতে বৃদ্ধের স্বাস্থ্যের
এই্ সবচেয়ে নিরাপদ অন্বেষণ ।
তাই্ যৌবনের লেক ছেড়ে ময়দানের ব্যবসায়ী প্রকাশ্যতা ছেড়ে
আধো-আলো আধো-ছায়া নিরিবিলি গৃহস্থের
এ পাড়া সে পাড়া বেয়ে চলা ।

ভাঙা পথ, ভাঙা শান;
ঘাড় নিচু, প্রাণ নিয়ে ঘাড়ে,

—বলা কিছুই যায় না, চলি, দুর্মর যে স্বাস্থ্যের সন্ধান ।
হঠাৎ জলের ফোঁটা, হিমশুকনো মাঘের শৃঙ্খলা ভেঙে আশ্চর্য অদ্ভুত-
পথে দেখে দেখে বুঝি ভুলেছি আকাশ—
বৃষ্টি এল কোথা থেকে, ফোঁটা ফোঁটা অকালের
গোপন চোখের জল ।
যেন পড়ে কুশ্রী এই কলকাতার ধুলাক্রান্ত মাটির শিকড়ে ।
অপ্রস্তুত । কান্নার হাওয়ায়
জোর চলি দ্রুতশ্বাসে যেন অদৃশ্য মিছিলে
অশ্রুজল বিস্তার ছড়ায়
কলকাতার পথে পথে সারা দেশে ।

ছায়া খুঁজি পথে কোনও অশ্বত্থের ছাদে ।
কিন্তু কান্না কিছুক্ষণ বাদে
আবার চালায়
যেন সেই দেশব্যাপী গুপ্তি অপঘাতে আকাশের জল মেশে ॥
৩০ জানুআরি, ১৯৬৮

কবে হাওয়া দেবে

ন্যায়যুদ্ধের বর্তমানের কুটিল হিংস্র ফাঁদে
পাদমেকম না গলাবে, ঘরোয়া গলায়
লড়ায়ে মাতবে তবু প্রতিদিন দৈনিক সংবাদে ।
রাক্ষসী-মায়া বাঁধে কতই না ছলায় !

জনগণকে পাবে কি খালি বাইরে জনতায় ?
নিজের মুখে দেখলে কাকে একাত্ম ?
দেখ আবার দেখ তাকেই মমতা-নির্মমতায় ।

ওটাকে দেখলে মানবজন্ম ঘৃণ্য !
কীর্তিকলাপ শুনলেও এই জীবনেই হয় বিঘ্নি ।
ইঁদুরে-শৃগালে জন্ম দিয়েছে যাকে তার থাকে লগ্নি
এমনি পাপের গুপ্তি গর্তে । তাই দেশ শতছিন্ন ।

নাবিক আমরা নামিয়েছি কবে প্রাণের বহর,

কতকাল ধরে শুনি শতশত জোয়ার-ভাঁটার প্রহর,
কবে হাওয়া দেবে কপিলগুহায় দুলবে বেগের লহর !

অত চুপিচুপি কেন কথা কও ওগো মরণ ! মানবজীবন !
বাঁচাই তো প্রেম, মরণের ছলা হিংস্র,
উভয়ত কেন পরো এক আবরণ ?
তুমি বিদ্যুতে ধুয়ে রূপ দাও, স্বচ্ছ তোমার স্বরূপে
স্পষ্টের ঝড়ে বজ্রকে হানো মারণ ।
মানবমনের সারাজীবনের হোমালোকে করি বরণ ॥
২৭ ফেব্রুআরি, ১৯৬৮

সুতরাং ছেদ কোথা

(কাজলার জন্য)

একথা বোঝা কি এত তোমারও কঠিন ?
তুমিও তো প্রেম জানো তৃপ্তি যার অসীম তৃষ্ণায়,
আলিঙ্গন যার নিত্য দেহের দেহলিতলে মাথা কোটে দীন,
যে পাওয়া মানেই চাওয়া, না হলে যে বিশ্বই বিষায় ।

স্থির জানি আমাদের নশ্বর জীবনে
চিরদিন চৈতন্যের জ্বালা তৃষ্ণা ক্ষুধা ।
কী করে বা হবে—এই মন শান্ত, নিঃশেষিত সমস্ত আবেগ ?
মানব-মননে মাতে নিরবধিকাল আর বিপুল বসুধা ।

সুতরাং ছেদ কোথা ? মানবজৈবিক স্বস্তি অন্বিষ্ট সর্বত্র,
ন্যায়ের সঙ্গতি কাম্য অবিশ্রাম আবিশ্ব আবেগে—
যদি নিত্য উন্মুখর ত্রিকালের ঊর্মিঘাত লেগে
দ্বার খোলে দেশে দেশে চিন্তার সর্বতোভদ্র ॥
১ মার্চ, ১৯৬৮

রাত্রি তুলুক

আমি তো সখী কদাচিৎ তা ভুলি।
স্বাধীনতা কি শূন্যে ঝরে? মুক্তি চাও তুমি,
বেড়ির পাকে তাই তো ওই করকমলে দুলি।

যেই না স্বপ্ন ভাঙল,
পাহাড়ের ওই ওপাড় বেয়ে সে নেমে চলে বহুদূর—
পায়ে-চলা পথে, পাথর-ছড়ানো, চোরকাঁটা-ছাওয়া, গেরিমাটি-বন্ধুর।

মুমূর্ষু চাঁদ. অজাত মূর্খ সূর্য
কোথায় গুপ্ত! অনন্ত মনে হয় অন্ধকারের শতক।
ভেঙে গেছে বুঝি সব উজ্জ্বল তূর্য?

এর চেয়ে ভালো দিনের ভিড়ের কোলাহল?
তবে এসো, দিনে লজ্জার মুখোমুখি
এই রাজপথে কেউই হব না, রাত্রি তুলুক হৃদয়ের হলাহল ॥

মার্চ, ১৯৬৮

তাকে দেখি, চিনি

তাকে দেখি, চিনি. সারাটা অঙ্গে
চিরাকাঙ্ক্ষীর মমতার মেঘ তাকিয়ে রয়েছে সর্বক্ষণ,
কখনও আষাঢ় কখনও বা কালবৈশাখীর
তীব্র দেখার প্রাণের রঙ্গে
বিশিষ্টতায় শারীরিক হল যমুনাতীরের তমালতরুর সুলক্ষণ

সৌরভে তার সত্তা আমার নিজেকে পায়
অন্ধকারের আকাশপৃথিবী একাকার হয় যেমন হাওয়ায়।
দুই স্বাতন্ত্র্য সাযুজ্যে পায় প্রত্যহে চিরউজ্জীবন,
পিতৃপুরুষ নবরূপে পায় চিরবিস্মিত আকর্ষণ,
শ্বাসে প্রশ্বাসে মন্দাক্রান্তা ঘনিষ্ঠতায় নিয়ত গায়ল সর্বক্ষণ।

তাই সে তোমার পাশ দিয়ে যদি স্বকাজে চলে
তুমি টের পাবে স্বরূপটি তার,

বৈশাখীর বা শ্রাবণের মেঘরৌদ্রের মিলে ভাস্বর
দুই চক্ষুর মেদুর দেখায় অপরূপ
প্রতিটি অঙ্গে দীর্ঘ যেন বা অমর প্রেমের সর্বাঙ্গীণ স্বাক্ষর ॥
২৮ মার্চ, ১৯৬৮

বীরের বাহুতে স্বায়ত্ত বরনারী

পিতার প্রেম ও বরাঙ্গী মাতা আদিতে.
আমার দীর্ঘ মমতায় তার বিস্তর পরিণতি,
কঠিন টৌড়িকে নিটোল করেছি ঈপ্সিত সম্বাদীতে।

আপন লালিত বাগানে যেমন ফুল
বিকশিত মধুসৌরভে রংবাহারে,
অথচ তাকালে কারোই হবে না ভুল,
স্পষ্টই তারা বিশেষ গোলাপ, ঘ্রাণে
দর্শনে আর মনোনিবেশের অবিরাম সম্ভারে।

কবি বলেছেন প্রেয়সীকে তাঁর অর্ধেক কল্পনা।
কথাটা এখন অসম্পূর্ণ, বলো উভয়ত বাস্তবিকের ব্যঞ্জনা,
একটি মানবী-মানবের দুই তটে জাহ্নবী-রচনা।

প্রাচুর্য ঃ চাই আবিশ্ব সুখ মানবধর্মে ধীর
নিত্যকর্মে শুভ্রবিবেকে ঝরুক শান্তিবারি।
আমাদের ছায়ানীড় পত্তন সর্বদা প্রস্তুত
অস্থিচূর্ণ কুরুক্ষেত্রে, মানি না ভগ্নদূত
আমরা সবাই মানবজন্মে অমর মৌলপ্রতীক—
কঠিনে কোমল বীরের বাহুতে স্বায়ত্ত বরনারী।
২৯ মার্চ, ১৯৬৮

বিশ্বেরই দুর্দিন

দাও হাত ভরে রক্তোৎপলরাশি।
মানসযাত্রা গন্তব্যের দিকদিগন্তে মেশে
যেখানে তুষারবন্যায় জ্বলে ক্রান্তির খরা হাসি।

কাল বা পরশু ছড়াব বিশ্বে আপনপরের দেশে—
সহস্রদল তখনও হবে না বাসি ।

পিতৃগণ কি পাঠাল রৌদ্রে উন্মাদ অনুচর ?
পুবে ঝড় রাগে উপড়িয়ে ফেলে, শতচ্ছিন্ন করে ।
পশ্চিমা লূ-তে কোথায় তৃপ্তি ? সারাদেশে ঘরে ঘরে
সে কোন্ মুক্তিস্থানের লগ্নে মিলাবে আপন-পর ?

দীর্ঘ আয়ত ইতিহাস দেখা অতীতে ও আগামীতে ।
অথচ বর্তমানের শূন্যে কী করে টানবে ছেদ ?
মোহানার মহামুক্তিতে কেন কাদা, বালি, ভেদাভেদ ?
কত কান্নায় বহাবে জোয়ার ঊর্মিল সংগীতে ?

জ্ঞানে আর কাজে, স্বপ্নে এবং বাস্তবে
তত্ত্বে তথ্যে কুস্তি চিরটা-কাল কি অন্তহীন ?
আকণ্ঠ গান স্তম্ভিত কেন ? সংগীত-উৎসবে
মৃদঙ্গে তাল কেন বা বেতাল, তম্বুরা ছেঁড়া-তার ?

বিশ্বেরই দুর্দিন ।
২৭ এপ্রিল, ১৯৬৮

জনৈকা মার্কসীয়া

চেনাই কঠিন, কখনও হয়তো মালতীলতাই দোলে,
কখনও নাচে সাগরোত্থিতা হাওয়ায়,
আবার কখনও অশ্রুসিক্ত পুবের চোখের জলে,
কখনও বা পাতাঝরা গান করে অবিরাম মুদ্রায় ।

তাকেই কি দেখি পিয়াল আবার অটল অচল ঠায় ?
শিকড়ে শিকড়ে গম্ভীর স্থিতি, ঝড় যত হাওয়া তোলে
তাল-ফেরতায় দ্বন্দ্ব-মুখর হরেক আকর্ষণে
সে করে হৃদয়ে রূপান্তরিত, ঠাটে-বেঁধে মাথা নাড়ে,
মৃদু আলোছায়া দুই হাতে পাড়ে পল্লব-অঞ্চলে ।

কী করে মালতী হল যে পিয়াল স্বয়ং !

কোন্ শক্তির মৃত্তিকা থেকে লাগডাঁটে ধরে নিজেকে ?
এই উল্লাসে এই মর্ষণে অপরাজয় কি কেন্দ্রিকে, মার্কসীয়া যেন,
খুঁজে পেল তার বিশ্বব্যাপ্ত বিচিত্রায় সোঽহম ?
কিসের মাধ্যাকর্ষণে ?
২৮ মে, ১৯৬৮

ধরণী যে পিপাসার্তা

The man estranged from himself is also the thinker estranged from himself, that is, from the natural and human essence: Critique of the Hegelian Dialectics as a whole.

উৎস তার অস্থিতে মজ্জায়
সর্বদা জানায় নিজ সত্তা,
কলকাতায় কুণ্ঠিত লজ্জায়
সে খোঁজে জ্ঞানের ধ্রুব বার্তা,
কাগজে বেতারে বিসংবাদ !

স্নায়ু তবু আকাশে মাটিতে
গাছে ঘাসে ইন্দ্রিয়-ইঙ্গিতে
পায় এক আদি শক্তিমত্তা ।
অথচ সে জানে সে আহ্লাদ
কিংবা ব্যথা সাংবাদিক নয় ।

দেহ্ তাকে করে নাজেহাল
কলকাতার কবন্ধ জীবনে,
অবশ্য সে জানে বানচাল
চোখ কান ঘ্রাণ চতুর্দিকে,
থেকে থেকে তাকেও সংশয়
দিনেরাতে দ্বিধান্বিত মনে
খণ্ড খণ্ড করে প্রাত্যহিকে ।

তবে সে কি মনটাকে খুলে
গ্রন্থাগারে পাঠাবে ? দপ্তরে ?
আর পঞ্চপাণ্ডব পালাবে

খাণ্ডবে বা গালা-মোড়া ঘরে ?
নাকি মার্কসীয় চিদম্বরে

মননের সম্পূর্ণ স্বভাবে
খুঁজে পাবে সশরীরতায়
নিত্যোত্তীর্ণ উষা বা সন্ধ্যায়
রাঙা দিনশেষের মুকুলে
প্রত্যক্ষের সত্যময়তায়
জীবিকার রঙে রসে রূপে ?
তাই তো ধরণী পিপাসার্তা
মাঠে ঘাটে, তার রোমকূপে ॥
৩০ মে, ১৯৬৮

ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে

গোধূলি বিবর্ণ হল। অন্ধকার একটি প্রতীক্ষা,
নিদ্রায় ও বিনিদ্র প্রয়াসে, প্রহরে প্রহরে
অনাগত, সম্পূর্ণ দিনের।

অতএব চোখ খুলে ধূসর নেতিতে বিশ্ববীক্ষা
চর্চা করা ! ধৈর্যভরে, যাতে উত্তীর্ণ বিবাদে
বর্ণাঢ্য আনন্দ শুনি, অর্ধমৃত বিধ্বস্ত শহরে
দায় শুধি গ্লানির আকাশে গ্রামগ্রামান্তরে মানবঋণের,
দৈনন্দিন আনন্দেই, কিংবা তারই নামান্তরে, ঐতিহাসিক বিষাদে,
ট্রাজিক উল্লাসে তীব্র, আবিশ্ব উদাসী ভারতীয় সংগীতের মতো।
জুন, ১৯৬৮

এক ইতিহাসে

সারাদিন এবার শ্রাবণে
এই ঝরে অঝোরে, এইবা সংবৃত পাণ্ডুর

বিশ্বের রূপক একি—নিদেন বাংলার ?

কখনও ঘর্মাক্ত মৌনে, কখনও প্লাবনে
বিহ্বল, যেন বা মহামাতৃত্বের বৈধব্যে বিধুর,
দুঃখে যার তুল্য সারাদেশ জুড়ে মল্লার বিশুদ্ধ ?

তাই কি বাংলার মাঠে অনন্ত আকাশে
মাসে মাসে বারমাস্যা দৈনন্দিন আনম্র উপমা,
প্রাচীন সাধনা থেকে রাবীন্দ্রিক বহুতা প্রয়াসে ?

সে উপমা কবে তুমি তুলে নেবে সর্বব্যাপী মাতৃসমা,
প্রত্যহের আশাভঙ্গে ও আশায় সমুত্তীর্ণ দুই বাহুপাশে
ব্যর্থ ও সার্থক এক প্রতিভাসে, এক ইতিহাসে ?
১ জুলাই, ১৯৬৮

স্বয়ং শরীর তার চিন্তা করে

কোথায় যে অন্ধকারে পালাল সে !
তার বাগ্মী রক্তধারা শুচি দুই কপোলে মুখর,
এবং এমনই স্বচ্ছ তার শিরাধমনীর ক্রিয়া
যে বুঝি দেখাই যায়, স্বয়ং শরীর তার চিন্তা করে।

কোথায় উধাও তন্বী ? সেখানে কেউ কি স্থির বসে
দেখে তার ভাষা, বোঝে কার স্পষ্ট স্বর ?

রক্তিম উদয়-অস্তে সে কোণার্কে বয়ে যায় স্বচ্ছ নিয়াখিয়া ?
বিশুদ্ধ চৈতন্যে নাচে কীর্তনীয়া মুগ্ধ শত পাথরে পাথরে ?
জুলাই, ১৯৬৮

বিদেশী বন্ধুদের

"India is a hard country to mature in—"
"My insides are haggard"—Alun Lewis.

অনেক সমুদ্র আর বহুদেশ মহাদেশ পার হয়ে এলে,
সহোদরোপম, এলে বিদায়ের আসন্ন ভাষায়,

উত্তোলিত শেষ হাতে রেখে গেলে আত্মদান, নিজে দিলে মৃত্যুর আদেশ,
অচেনা পাহাড়ে দিলে আপন অক্ষয় হাড়, কবিত্বের উহ্য দুরাশায় ।

বিদেশবিভুঁয়ে হিংস্র আত্মীয়তাহীন যুদ্ধে আকস্মিকতায়
তোমার মরিয়া আত্মহানা শূন্যে প্রেমের ও কবিতার চির প্রতিবাদ ।
সহমর্মী, সহধর্মী, বহু দেশে অরণ্যের পাহাড়ের হিংস্র রিক্ততায়
বাতাসে নিশ্বাসে বহু চৈতন্যে সে ধ্বনি বাজে, এখনও অবাধ,

লবণাক্ত স্বাদ ॥

চার দশকের পুরোনো ছবি

তখনও কি বারান্দায়
রোদ্দুরের আলপনা ? নাকি শুভ্র ছায়ায় অধ্যাস ?
হালকা কুরশিতে তাঁর অক্লান্ত আসন,
লিখে যান অপরিসর টেবিলে,
খোয়াই-এর প্রখর হাওয়ায়—

কী লেখেন ? উপন্যাস ?
অন্য এক গোরার বিকাশ ? কিংবা কোনও দামিনীর আরেক বিন্যাস ?
কোনও অন্যায় বা অপরিচ্ছন্ন চিন্তার বিষয়ে
প্রতিবাদী ব্যাখ্যার প্রবন্ধ ? বা ভাষণ ?
নাকি কোনও দীর্ঘায়ু কবিতা ? ছন্দে মিলে
নিরবচ্ছিন্ন বুননে মনে মনে কালের রাখাল বাঁশরির লয়ে লয়ে ?

দাঁড়ান । খোদাই মূর্তি । কলমের সে প্রচণ্ড গতি অবসান ।
পদক্ষেপ কয়বার, অন্য মনে, দুই কোণে মিত বারান্দায় ।
দূরদেশি চোখের তন্ময়-অন্বেষায়
মনে হয় অবচেতনের মুখে ফুটে আসে সুর, কথা ।
গান আসে, গান ওঠে, শব্দ সুর
নামে পড়ন্ত হাওয়ায় ।

তারপরে আবার হঠাৎ টেবিলে বিজয়ী হাত
রাখেন, এবং ওই কলমের দক্ষিণে হাওয়ায় সর্বত্র, সর্বথা,
ওড়ে কথা, ওড়ে সুর ।
অঙ্ক করেই না বন্ধ তার পাখা ।

বারান্দায় সূর্যগুলি নেমে বসে নতজানু,
ছায়াগুলি করে প্রণিপাত,
ভূলুণ্ঠিত নিথর হাওয়ায়।

ছবি দেখা ক্ষান্তি পায়।
গাছের ছায়ায় স্থাণু
যুবকটি—বা বালকই—নিবিড় চৈতন্য ধরে ফিরে যায়
আসন্ন সন্ধ্যায়,

টাটাহৌসে চাখানায়, নাকি রিক্ত বোলপুর স্টেশনের নিঃসঙ্গ চত্বরে ॥
১৭ অগাস্ট, ১৯৬৮

বৃষ্টি সাবিত্রীক গান করে

বৃষ্টি পড়ে। পাতা নড়ে।
কিন্তু গাছ কই? মাটি কই? বৃষ্টি পড়ে,
মাটি খোঁজে, মন খোঁজে, মনের শিকড়ে
বৃষ্টি চায় মনের মাটিতে।
শ্রাবণভাদ্রের জলে
চিরচেনা বাংলার বহুগানে পড়ে অবিরত।

অলিগলি রাস্তা ধুয়ে, প্রায় শুচি প্রায় সুস্থ
জলচলাচলে, জলে জলে দৃষ্টি চলে অনাহত
প্রবল বৃষ্টির জলে
মহেন্দ্র দত্তের অথবা বিদেশি হয়তো বা
উপহৃত কিংবা অপহৃত! ছত্রতলে।

কলকাতার স্তূপীকৃত দুর্গন্ধের রাস্তায় অসুস্থ দুস্থ
বৃষ্টি পড়ে।
পাতা নড়ে মনের মাটিতে অশ্বত্থে কদম্বে ইতিহাসে।
দীর্ঘজীবী অবিরাম জলধরশ্যাম
আরোগ্যকৌশলে রমণীয় অভিরাম
বৃষ্টি পড়ে দুর্গত রাস্তায় আমাদের দৈনিক নিগড়ে,
জল পড়ে পাতা নড়ে জল চলে মনে অবিরাম।

কাদা জমে চলে জলে মাটি গড়ে শহরে বস্তিতে গ্রামে
চলে আর বিশ্ব জমে কাছে আর পর আসে ঘরে
দূরও আপন হয় অভিন্নহৃদয় এদিক ওদিক,
কলকাতার ভাঙাচোরা শহরেও জলসত্র খুলে ভরে
সৌভাগ্যে সুগত আমাদেরও দুর্গতির বদ্বীপের চরে।

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি ঝরে অঘমর্ষী অনুকম্পায়ী প্রতীক
মনের মাটিতে আবিশ্ব জীবনে ঝড়ে
জমায় পলির মাটি ঘরে বাইরে সর্বত্র।
মাটিতে মনের ইতিহাসে ঐতিহাসিক মননে আকাশে বাতাসে
মানবিক সংকটের ক্ষুরধার ক্ষণে
নানাদেশে নানারূপে শত প্রতিভাসে
জীবনের বিচিত্র কৌশলে বৃষ্টি ঝরে
প্রচ্ছন্নে প্রকাশ্যে ঝরে মনের মাটিতে
সন্তপ্ত গঙ্গোত্রী শীকরে করায় কি স্নানশুচি ? তারপরে
অশ্রুস্রোতে ভিজে ভেসে নিজেই কি সাবিত্রীক গান করে ?·
২৪ অগাস্ট, ১৯৬৮

তবু জলে ফলে ভালো

তবু জলে ফলে ভালো, না হলেই শূন্যে হাহাকার।
মাটিও পরান্নে ক্লান্ত, হতমান, জরিষ্ণু নিঃসার,
প্রাচীন লাঙল দীর্ণ, শীর্ণ দুটো বলদ সম্বল।
সর্বদা আকাশে মুখ নিষ্পলক, চায় শান্তি, জল।

জন্মমৃত্যু কাটে আশা-হতাশায়, সত্তা তেপান্তর,
যেন বীরভূমির কোনও মল্লদেশে জমির প্রান্তিকে
ঐশ্বর্যে ঊষর মাটি, অবহেলা যার চতুর্দিকে,
নদীনালা সর্পাহিত, বক্তৃতাও শূন্যে আড়ম্বর।

অবান্তর গৌণতায় জ্বলে চেতনার কর্মচাঁড়,
কিংবা নামে ভুল বৃষ্টি, শোষে মরে আসন্ন ফলন,
অনাহারে কিংবা অতিসারে দুস্থ ভারতীয় চলনবলন।
অঘ্রানের লাল ঊষা সূর্যাস্তেই শয্যাগত জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়।

হৃদয়েরা তবু ভিজা পথ হেঁটে, আশা বা নিরাশা
পায়ে চেপে, পেতে চায় ফলন্ত জ্ঞানের নিজভাষা ॥
২৬ অগস্ট, ১৯৬৮

পরবর্তী পাঠ 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' গ্রন্থের 'চতুর্দশপদী' কবিতা (পৃ ৩১০) দ্রষ্টব্য।

দগ্ধ গান

আগের বছরে
পৌষের পলাশবনে
দেখেছ উদ্ভিদ দৃঢ় কোন্ শক্তি ধরে ?
পাতাঝরা পেশির অস্থির
বলবান ভূতত্ত্বে গভীর প্রচ্ছন্ন মাটিতে
ঝুরু ঝুরু ওড়ানো হাওয়ায় ?

এসেছি তো আবার দুজনে
মাঘের সংক্রান্তি-জ্বালা দিনে।
দেখি, পায়ে পায়ে, যেদিকেই যাই যেদিকে তাকাই
শুনি, গায়, আগুন লেগেছে ভাই বনে বনে।
পেশিতে শিকড়ে বাঁচে এত রং ! নাও দেখে, নাও চিনে
সর্বত্র তাকাও, উদ্ভিদ চৈতন্যে নাও !

এ বছরে
চৈতালি উৎসব দেখি পত্রহীন অস্থিসার।
হাওয়াই আকাশ নেমে মাটিকেই করেছে শ্মশান ?
বাসন্তীর বর্ণাঢ্যতা স্তব্ধ, জগ্ধ যৌবনের প্রাকৃত বিস্তার ?
নাকি শুধু ছদ্মবেশ ? তাই বন্যা দাবদাহ একাকার করে ?
আমরাই চিনি না, তাই, বুঝি এই গাজনের গান ?
৩১ অগাস্ট, ১৯৬৮

আবিশ্ব মনীষা শুশ্রূষায়

. . .to hope till hope creates
From its own wreck the thing it contempletes

বুঝি এই অন্ধ মুমূর্ষায়
আছে দুস্থ বিশ্বের প্রভাব।
শরীরকে হানে, চেতনাকে
হানে কারা অস্মারবিলাসী,
নিজেদেরই বেঁধে টানে ফাঁসি,
হা হতোস্মি হাঁকে সর্বনেশে
কণ্ঠ থেকে ঢালে রক্তস্রাব।

ভাব স্বায় মানবস্বভাবে
যদি চায় এই দুর্বিপাকে
জীবনের শুদ্ধিতে নিদান—
যেন নীলরতনের জ্ঞানী
রোগ ও রোগীতে সমধ্যানী–
স্বস্বভাব পাবে দেশে দেশে,
মন পাবে প্রজ্ঞার বিধান।
অবিচ্ছেদ্য পরস্পর ডাকে
শক্তি বাঁচে শক্তির অভাবে
ডাকে আজ সংলগ্ন বিজ্ঞান,
মূর্তি, ছবি, সংগীত, কবিতা—
আবিশ্ব মনীষা শুশ্রূষায়।

সুতরাং দীর্ঘ সভ্যতাকে
বুকে ধরো আপন দয়িতা,
চরণে পরাণে বাঁধো ফাঁসি।
অখণ্ড সত্তায় শোনো বাঁশি,
চায় সুস্থ স্বাধীন সদ্ভাব
ব্যক্তি-বিশ্বে সর্বান্নবর্তিতা ॥

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

সাজানো বাগান আজ

"Until Birnam wood do come to Dunsinane."

তাই বুঝি ? সাজানো বাগান আজ জীর্ণ প্রতিনিধি ?

স্বনামে বিধাতা যারা, তারা সব কৌটিল্যে তৎপর,
দাক্ষিণ্য বাঁহাতে ঢাকে, দগ্ধজগ্ধ চিত্তে বাম বিধি,
তারা চতুর্দিকে ওড়ে, মুদির মক্ষিকা যত চতুর মৎসর।

সাজানো বাগান বন্ধু নিতান্তই দুস্থ প্রতিনিধি।
পথে পথে—বা বিপথে ঘুরে মরে লোকারণ্য হারানো স্বভাবে
একটি কদম্ব শুধু এক কোণে, ঐ কোণে নিঃসঙ্গ মনসা।

কদম্বের ছায়াপুটে আসে কিরে যদুপতি বিচ্ছিন্ন মনসা ?
হয় ক্ষরে শিবনেত্রে না হয়তো ভৈরবী বরষা।
সাজানো বাগান জলে পোড়ে—কিংবা জলেরও অভাবে,
দেখে জ্ঞানবিজ্ঞানের হতবুদ্ধি ছিন্নমস্তা এ কী ভিন্ন বিধি।

সাজানো বাগান আজ প্রাকৃতিকে মানবিকে ব্যর্থ প্রতিনিধি।

শুধু প্রাণপণে চায় শুদ্ধ আরণ্যকে শষ্পে সতেজ বিস্তার,
যেহেতু বিপুল পৃথ্বী আর কাল একচ্ছত্র সত্য নিরবধি—
মানবিক প্রাকৃতিক যোগাযোগে সংলগ্ন বাগান জাগে যদি।
না হলে বাংলার শত তিস্তার আর কোথায় নিস্তার ?
৪ জানুআরি, ১৯৬৯

পুনরালেখ্য

একদিন ছিল—তার সারা অঙ্গে লাবণ্য বিহরে ;
তবে, হ্যাঁ, ভাস্কর্যে, নাকি বলব অঙ্কনে
বিরাজে পশ্চিমা গর্ব, তন্বঙ্গীর জমাট আননে
—মনে হত, মিষ্টান্নকুল্‌পি যেন ইতরে বিতরে।

আজ সে সম্পূর্ণ, আর কিছুটা বা প্রকাশ্যে পৃথুল ;

কাঁচুলিতে, আস্তিনের লেসে ঢাকে মহেন্‌জোদারো-কে
কেউ বলে, মুখশ্রীতে আল্‌তামিরা বর্ণিকা বর্তুল,
প্রতীচ্য পসরা যেন রয়—এই দুস্থ প্রাচ্যলোকে !

কালের বিনত ভিক্ষু দেখি ত্রস্ত চোখে
যে সূর্য পশ্চিমে ডোবে উদয়ের লগ্নে তারই ভুল ।
৬ জানুআরি, ১৯৬৯

অনন্য রাত

হিমগিরি ছেড়ে সে কেন আসবে বদ্বীপে ?
মানসহ্রদের হিমানীস্বচ্ছ কন্যা !
যদিচ হয়তো তুষারের ঝড়ে, কখনও ঘরের প্রদীপে,
আঁধার ঘনায়, নীলিমায় তোলে বন্যা ।

দেহাতীত সে যে, নাকি বলা যাবে তাপ তার
জড়িয়ে গিয়েছে উহ্য স্মৃতির পাতকে ?
আরোহী শিখরে সমতলে আদি পাপ কার ?
বেঁধেছে সীমানা আপন মৌল জাতকে ?

বাস করি চরে চড়ায় বালিতে বন্যায়,
ভেসে যাই কত মন্দাকিনীর অতলে ।
হিমানীতে নয়, দিন কাটে জলে পাতালে,
তবু অনন্য রাত চায় ঐ কন্যায় !
৮ জানুআরি, ১৯৬৯

পিতার মতো মাতার মতো

দুঃখ যখন অসীম পাথার তখন এ কী গানে
জীবন দেখি নরক হয় পার ।
মরণ ছায়া নিত্য ফেলে আগুন জ্বালে বানে,
দুহাতে ঢালে বিপুল হাহাকার ।
তখন এ কী গানের ভাষা : শুভম্‌ শুভমস্তু !
দিনযাপনেই যখন আশা পাপক্ষয়ের ঝড়ে

কাঁপন হানে হৃদয়ে-হাড়ে, বিশ্বব্যাপী বস্তু
যেন-বা প্রায় নেতির ঘায়ে নিগড় গড়ে ভেঙেই পড়ে।
অনেক হিরোশিমায় যেন অনেক হাইফঙে
যিশুর শ্বেত নদীও কেন রাঙা ?
হিমের রাতে হাওয়ায় ঝড় কখন থামে সে কোন সমে,
বৃষ্টি নামে মাতাল ঘুম-ভাঙা।
হৃদয়ে হাড়ে আরেক কাঁপা দুস্থ ঘুম-ভোরে
আকাশ জাগে স্বচ্ছ তার কিসের শুচি হিমে,
হিমানী নীলকণ্ঠ বাহু-ডোরে।
ত্বম্ অহম্ মুখর হয় শুভমস্তু শুভমস্তু সদ্য-নিঃসীমে।
বিপুল বস্তুবিশ্ব জাগে, চেতনা লাগে গানে।
ত্বমসি, বলে, ত্বমসি, বলে, ত্বম্ অহম্ ছড়ায় ভালোবেসে
রিক্ত হিম সত্তাময় স্বচ্ছ নীল হিমে,
শীতের ঘোর রাতের ভোরে হাহাকারের বিরাট দেশে
পিতার মতো মাতার মতো সন্তানে সন্তানে ॥
১৬ জানুআরি, ১৯৬৯

আত্মস্থ শম্বুক

এক চায় বৈদেহী কবিতা, অন্যে চায় সাবেক বিবাহ,
আত্মদানে নিত্য পরিগ্রহণের সম্পূর্ণতা।
মুশ্‌কিল এ মতান্তরে, জাগতিক চিত্রে পরিণাহ
উভয়েরই ছিন্ন থাকে, ভিন্নতায় কেন্দ্রেও শূন্যতা।

তবুও কাটাল যুগ উভয়ের উচ্চাবচ একান্ন সংসারে
এবং শোভনভাবে, পরশ্রীকাতরও থাকে মূক।
হৃদয়ে অত্যন্তাভাবে, কেবা ডোবে দ্বৈতের পাথারে !
উত্তাল তরঙ্গ শেষে প্রতীকের আত্মস্থ শম্বুক ॥
২৩ জানুআরি, ১৯৬৯

আমৃত্যু চৈতন্যে

চতুর্দিকে পোড়ো জমি, বিলাসী পশ্চিমা নয়, বিরিক্ত আদিম।
বিদেশি-দেশির তিন শতাব্দীর ভোজে-লেহ্যে-পেয়ে বিস্তৃত শিকার,
ফাঁকা ফাঁপা মানুষদের সঞ্চয়াতিরিক্ত মৃত্যু ভূতনৃত্যে বাজায় ডিণ্ডিম
দেখি শুধু, যত চলি চতুর্দিকে রেখে গেছে বঞ্চনার দুরন্ত বিকার।

বহু যুগ ঘুরে থামি। এখানে বাস্তবই স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নে যে কবিত্বে একাত্ম
বহুদিন রাত্রি, নাকি অনেক শতাব্দী চলি বিরাট স্বপ্নের দেশে প্রাচীন
শপথে,
বহুলোক, যদিও বা মনে হয় একা একা, বহু রাজপথ বহু কংক্রিটের বর্ত্ম
হেঁটে, হেঁটে রক্তাক্ত মাটির পথে, বালিপথে, ভাঙা, ধসা, কাঁটাপথে।

ক্ষুধায় কাতর, শ্বাসরুদ্ধ, তৃষ্ণায় জর্জর, পথ বুঝি শেষ হল জগ্ধ তেপান্তরে
অরণ্যের ভুক্ত-অবশেষে। বহুলোক, মেয়ে ও পুরুষ, বহু শিশু খায়, যেন
দেয় হব্যে,
ভূরিভোজ পাথরে নুড়িতে, মরা আণব ধুলায়, আর কুড়ি হাত ভরে ভরে
পরিবেশনে মেতেছে একাই দানবমৃত্যু, দেখি এক দণ্ড কেবা পর কেবা
আত্ম।
বসে পড়ি ফণিমনসার ঝোপে, শূন্যপাতে, দুই হাত ভরে আমৃত্যু
চৈতন্যে ॥

২৮ জানুআরি, ১৯৬৯

গ্রাৎসিয়া

বিস্ময়টি থাকুক তাহলে,
যার তোমাতেই উৎসমুখ।
এর পরে কখনোই আর জীর্ণ হাওয়া
জোগাবে না দৈনিক নিশ্বাস।

শ্মশানশিখরে এই লঘু উদ্দীপ্ত হাওয়ায়
যেখানে প্রশ্বাস ছাড়ি সমস্ত সত্তার রোমে রোমে
প্রাক্‌ভৌগোলিক দীর্ঘ অতীত চেতনা, সেখানে কি থাকে রুচি

যন্ত্রণার পরিচিত প্রান্তরে অথবা
শিল্পের যা স্বাভাবিক, চিরঅতৃপ্তির ঘাটে ঘাটে ?

তোমার মুখের ওই ভাস্বর বিস্ময় এবং কয়েকটি মাত্র কথা
আমাকে বেঁধেছে স্থিত দুঃখের-সুখের এই বিবিক্ত শিখরে,
ভোরের চূড়ান্ত এক বলিষ্ঠ ফুগে-র বিস্তারের ঠাটে

এবং তোমার ঐ মধুস্রবা মৌনপ্রায় লাবণ্যে, প্রসাদে
যে খাদে সাধ ও সিদ্ধি সমান ঐশ্বর্যময়,
নির্ঝরিত আমার দুর্গম ন্যূনতম ভাষা
—ও দুয়েরই শাসন ছাড়িয়ে এবং নন্দিত
সেই দীর্ঘলয় স্বরে বিশ্ববহ স্তোমে,
যা, তুমি তো জানোই, গ্রাৎসিয়া ! একান্ত তোমার
এবং বাদে ও প্রতিবাদে অন্বিত, অব্যয় ॥

(ইংরেজি থেকে ভাবানুবাদ। বেঠোফেনের গ্রোসেফুগে প্রমুখ সংগীতরচনা ও পত্রাবলী এবং রলাঁর মহোপন্যাসের স্মৃতি-প্রভাবে লিখিত ১৯৪৪-এ।)

তবুও আশ্চর্য বৃষ্টি

তবুও আশ্চর্য বৃষ্টি, দুপুরের শেষে প্রায় নামল বিকেলে,
বাড়িঘর ভেসে গেল, অন্ধকার আপিস অঞ্চল,
জলে জলে বাতাসের ছাটে ছাটে সতেজ সজল
ক্লান্ত তিক্ত অভাবের মন যত, কদম্বকেশর শত মেলে
সুখের শিহরে বুঝি। বৃষ্টি এল আশ্চর্য বিকেলে।
দুশ্চিন্তাও হল বৈকি, বণিক শহরে ঘোলা জল
দুদণ্ডে ভাসায় বস্তি, ছড়ায় না স্বচ্ছন্দ সচ্ছল
নদীতে আমনক্ষেতে সারাদেশে স্বাস্থ্যে হেসে খেলে।

তবুও আশ্চর্য বৃষ্টি। আমাদেরও হৃদয় চঞ্চল,
ময়ূর না হোক তবু মানুষেরই মতো পাখা মেলে
দপ্তরে আড়তে ঘরে সকলেই ভোলে অবহেলে
বর্তমান গ্লানি-জ্বালা, চলে যায় স্বভাব-সরল
শৈশবেই, মহাখুশি জলপথে ইস্কুলের ছেলে,
ইলিশের মতো মুক্ত। সারাদেশে জলের ফসল ॥
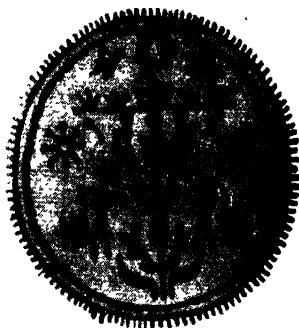
ঈশাবাস্য দিবানিশা

বিষ্ণু দে

সূচিপত্র

এ বড় রঙ্গ তো

অকালে দেয়ালির একী লাল বাহার !
গলিতে কোঠাতে ট্রাম-রাস্তাতেও
লাল বাহারে দেখ স্বতস্ফূর্তি কার
বাঁধানো শানে চলে, শত নাচ তাতেও।
আশাভঙ্গ ক্ষান্ত কি ? প্রাণের বিস্তার
ছড়ায় দুইহাতে লাখো কণ্ঠে তার।

এ বড় রঙ্গ তো, বৃদ্ধ হাড়ে হাড়ে
তালিতে তালি বাজে, অকালে দীপাবলী !
কে হারে কেবা জেতে কে কমে কেবা বাড়ে
গৌণ হয়, যায় শতেক দলাদলি।
জ্বালায় কারা আশা স্রোতের পাড়ে পাড়ে,
চেনায় অচেনায় আশার গলাগলি।

এ যেন দেশজোড়া বিরাট এক ঘর,
আরোগ্যোৎসবে আকাশও হরষিত,
ভোজ্যে নরনারী সকলে তৎপর।
এ যেন মেনকার পরম সমাদৃত
গৌরী উন্মুখ, কোথায় আসে বর !
সকলে উদ্‌গ্রীব, লগ্ন সমাহৃত ॥
১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

রাবীন্দ্রিক আত্মস্থ্ সংগীতে নির্ভীক ছবিতে

একমাত্র অরণ্যে উপমা।
অথবা মৌলিক শুদ্ধ মানবস্বভাবে,
নিরালম্ব খেয়ালির আশা নয় বিলাসী সজ্জায় নয়।
আজীবন পরিক্রমা
জীবনের দুর্মর ভাষায় আমরণ বেদনায়।
আপাতস্বার্থের ভাষা নয়।
আকাশের শব্দ ছন্দ যার মাটির মজ্জায় মেঘের প্রবাহে,
সর্বাঙ্গীণ চেতনায়, কখনো বন্যায়, আকস্মিক হিমবাহে,
কখনো বা মানবিক বাষ্পদাহে।

অথবা নির্মল স্বচ্ছ রৌদ্রে দীপ্ত প্রেমের প্রভাবে
পেশল সুষমা ।

উপমায় উপমিতে উপমেয় এক হবে কবে ?
বিশ্বপ্রকৃতির স্বস্থ অনাহত স্বভাবগৌরবে প্রাণের আকরে
লুব্ধ অন্ধ অকালদর্শিতা দূর হবে নিয়মে নিয়ত
মানবিক মৌলিক বৈভবে ?
অরণ্যে উপমা তাই ; আকাশবিহারী গাছে
লতায় শৈবালে
রৌদ্রময় রঙিন কাঁকরে
উচ্চাবচ ধৌত স্নাত মাটির অরণ্যে ।
দলে দলে শিকারি-শিকার মানুষের ভয়াল জঙ্গলে নয়,
শহরে ও গ্রামে বলি নয়, আপন হৃদয়ে ইতিহাসে
এখানে নামুক সন্ধ্যা পূরবীতে
সূর্যদেব জাগুক বিভাসে
পুনর্বৃত্তে উপমা রূপকে ধন্য
রাবীন্দ্রিক আত্মস্থ সংগীতে নির্ভীক ছবিতে ॥
৮ মে, ১৯৬৯

পুবের হাওয়ায়

সকরুণ ক্ষীণ নীলাকাশ থেকে পাহাড়ের ঢল বেয়ে
মাঠের অনেক সবুজ যোজন পার হয়ে ছুটে আসে
মুখে মুড়ি দিয়ে বৃষ্টি এদিকে,
এই দেখি আসে ভিজে দেখি আসে এই বুঝি নিজে নেয়ে
আবার কখনও থমকে কি ভাবে কী বিশ্ব-প্রত্যাশে !

গরম দেশের মানুষ আমরা, রৌদ্রে ও মেঘে মানুষ ।

খরার মাটির, দশহরার মাটির, নরম মাটির মানুষ ;
আমাদের ভালোবাসা বস্তুত পুবে,
পুবের হাওয়ায় বৃষ্টি আসা ।
কিবা মেয়ে কিবা পুরুষ গড়েছি ভিন্ন ধরনে পৌরুষে,
তীর্ণ আত্মদানের গরবে নরম মাটির বাসা ।

বানে বিদ্যুতে মজে মরে শত নদীতে জানাই রাগ ।

কর্তার কূট বোকার ইচ্ছা যত করে অপকর্ম,
ততই আঙুল হেনে কেটে দিই,
আকুল আবেগে দুহাত ছড়াই নাগবংশীর ধর্ম,
বিষধরও বটে সময়-বিশেষে, কে মানাবে বলো বাগ্ ?

তাই অসহায় আমাদের দিনে পুবালি কিংবা ঈশানে
বৃষ্টির আসা মর্মে মর্মে গভীর অধরা প্রতীক যে।
ছবির উৎসে পোড়া মাটি গ'ড়ে শতপদাবলী গানে
কীর্তনে গীতবিতানের সন্ধানে
জ্ঞানে-অজ্ঞানে চেতনার নীলে আমরা রাবীন্দ্রিক যে ॥

২৫ মে, ১৯৬৯

রাত্রিতে শোনা যায়

তবুও রাত্রিতে শোনা যায়।

নাকি ওই ক্ষীণ সুর বহুদূর নক্ষত্র সংগীত মাত্র ?
শুনি যে তা মনে হয় শুধু বুনি স্বপ্নময়
নীলে, মহাশূন্যতায়, ছাদে কিংবা খোলা জানালায়।
কারণ প্রখর দিনে গ্লানির জ্বালায়
সে গীতবিতান অশ্রুত অদৃশ্য প্রায়,
কোমল গান্ধারে যা শোনা উচিত ছিল অহোরাত্র
বিংশ শতাব্দীর প্রজ্ঞায় বিজ্ঞানে
প্রতিশ্রুতি সমবেত পরিপূর্ণতায়।

দেখি নক্ষত্রধ্বনিত এই অন্ধকারে ডুবে যায় গৃধ্নুরও কারবার।
তাই রাত্রিকে হৃদয়ে বাঁধি
নাক্ষত্রিক নীলে,
যদি মর্ত্য মৃত্তিকায় কর্দমাক্ত রাজপথে দৈনিক বিপথে
ব্যাপ্ত হয় আমাদেরই ছন্দে মিলে
মানবিক জীবনের প্রাকৃতিক পরম সংগীত,
কলকাতারও স্তব্ধতায় শুদ্ধ উজ্জীবিত
যে সংগীতে উদ্দেশ্যের পূর্ণতায়
সমাহিত হয়ে যায় সর্ববিধ আধি,

নিমগাছের শিহরনে যে সংগীত রাত্রিতে দেখা যায়।

দিনকে রাত্রির নীলে অবিচ্ছিন্ন বাঁধি বারবার
দীর্ঘায়ু নিষ্ঠায় ॥
১১ জুলাই, ১৯৬৯

পরবর্তী পাঠ 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' গ্রন্থের 'দিনকে রাত্রির নীলে' (পৃ ৩০৫) দ্রষ্টব্য।

একটি দেয়াল

লম্বা পাড়ি, তারপরে নব্য রাজপথ। এ কি গন্তব্য ? গ্রাম্য পথ,
তারপরে দেওদার-বীথি শেষ, তারপরে কিছু
একদা লালিত আম্রকুঞ্জ, কিছু জাম, কিছু মুমূর্ষু পেয়ারা,
ওই দিকে শিশু আর গম্‌হার, ফুলময় সেগুন ও শাল।
তারপরে স্মৃতিমাত্র মৃত শত ফুলের জ্যামিতি দ্বীপে
যা ছিল বাগান, শখ, সাধ, সাজানো বাগান,
তাই মুমূর্ষার মাথা নিচু বামন জঙ্গল।
হাঁটি স্তব্ধতার তপোভঙ্গে, বেশ সাবধানেই, মাথা হেঁট, চোখ নিচু।
বাড়ি কোথা ? ইমারত ? সেই শৌখিন প্রাসাদ বুঝি ওই একটি দেয়াল ?
কোথায় সে ভোজ্য পেয় ? গন্ধর্ব ? অপ্সরা ? দশজন বাবুর্চি বেয়ারা ?

ওদিকে ও কার ঘর ? মাটিতে নিকানো দাওয়া,
মাটির প্রদীপ জ্বলেনি তখনও আলো,
একটিই নিঃসঙ্গ ঘর, দলবল ছেড়ে
জুতো টিপে টিপে চলি, একা, সাবধানেই, মাথা নিচু
সূর্যাস্ত আভায় লাল নিজেরই ছায়ার যেন পিছু পিছু।
মোটা কাঠের গুঁড়িতে আঁটা দ্বার খোলা, খাটিয়ায় বিছানো কম্বল।

ভদ্রলোক, বোধহয় তো ভদ্রলোকই, দারোয়ান নয়, শাদা চুল,
ভূতে ঢাকা দুই চোখ, হঠাৎ বলেন, যেন অন্ধ চোখে
কিংবা যেন তারা-ঢাকা চোখে, বলেন, ওসব ভুল, জেনো আজ ভুল,
সংগীতে ধ্রুপদ মাত্র সত্য জেনো, অনিত্য খেয়াল।
দেখেছ তো দশা তার ? একটি দেয়াল।
২২ জুলাই, ১৯৬৯

একদা ভেবেছি যাঁকে

প্রকৃতি-প্রসঙ্গে তাই সত্য বটে; যথা, প্রচণ্ড খরায়
মানুষ— আকাশে মুখ প্রাণপণে চায় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, ফোঁটা ফোঁটা
বজ্রের অমৃত স্পর্শ, যেন মৃত্যু ক্ষান্তি মানে জন্মান্তরে স্বপ্নের সহায়।
আমাদেরই মর্ত্যে মাটি বেঁচে ওঠে সদ্যস্নাত শুচি অমরায়
আসন্ন জননী যেন, স্রোতে স্রোতে রূপান্তরে পূর্ণ হয় সোঁতা।

তেম্‌নি, একদা ভেবেছি যাঁকে অলৌকিক আকুতির অচিন্ত্য প্রতীক,
অনেকে গেয়েছি একবাক্যে সেই সুরে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে
আজ দেখি যে প্রতিভা অপার্থিব ক্রন্দসী-নন্দিত, সেই হানে আনন্দ ভৈরবী
ক্ষণে ক্ষণে, গঙ্গায় পদ্মায় রুদ্র সাধনার মেঘ রৌদ্রে, হাঁকে ধিক ধিক।
দিগ্বিদিক উন্মুখর বাংলার বা সভ্যতারই সংকটের মানবিক
পরিত্রাণে ক্লান্তিহীন দীর্ঘায়ুর শ্রমোত্তীর্ণ গানে ॥

২৩ জুলাই, ১৯৬৯

নৈঃশব্দ্যকে

কবিতায়—বা গানেও খুঁজি শব্দের চরম অন্বিষ্ট,
খুঁজি অন্তঃশীল নৈঃশব্দ্যকে।
চাই ধ্বনির দুর্মর রেশ যেন ওই নাক্ষত্রিক ঐকতান
সূর্যেরও যা অনায়ত্ত যে তীব্র আলোকে
চৈতন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উচ্চমাত্রা নিম্নতম-মাত্রাময় গান,
প্রাত্যহিক সুখে দুঃখে শোকে
কিংবা দ্বৈত প্রেমের উল্লাসে যখন সমস্ত ইষ্টানিষ্ট
স্বরোদের সূচিমুখ গৌরীশৃঙ্গে করেছে প্রয়াণ
সপ্তবর্ণ আমর্ত্য দ্যুলোকে ॥

১৪ অগাস্ট, ১৯৬৯

সান্ত্বনা

বার্ধক্য চৈতন্যে শ্রেষ্ঠ, কৈশোরক যা হয় ভাবুক,
চারুপাঠও তাই বলে। জরা বিকাশের চূড়া, অপিচতা শেষ প্রান্ত
মহা আয়ুর সাগরে— অতলান্ত এবং প্রশান্ত

আয়োজন প্রবালের রক্তিম শিখর। এখানেই ক্ষান্ত
সুন্দরী এ পৃথিবীর আশ্লেষে জীবনযাত্রা।

অথচ হয় না ক্ষান্ত অন্তত ব্যক্তির জৈবকালে,
সকালে সংবাদ হানে হরেকরকম্‌বার চাবুক,
সন্ধ্যায় রক্তাক্ত নীলে ভোলে মন স্বীয় ন্যায্য মাত্রা,
আর অধোঘুমে দেখে সুন্দরের বিবিধ কৌতুক।

বার্ধক্যে সান্ত্বনা শুধু স্বাস্থ্য রক্ষা বিকালে সকালে ?
সম্পূর্ণ মানুষ হয় বয়সেই দুরন্ত ভাবুক ॥
১৪ অগাস্ট, ১৯৬৯

ছুটির বেড়ানো

ছুটিতেও লাভ আছে।
আশ্চর্য প্রশস্ত পথ, নিসর্গে উদার,
কংক্রিটে, কোথাও বা ম্যাকাডামে পাকা।
আশেপাশে, দূরে বা কাছেই, পোড়ো পোড়ো গ্রাম,
দীনহীন, কোনোটা বা ফাঁকা।
(অতীতে বা ভবিষ্যতে হতেও তো পারে বটে আরেক চেহারা ?)
মানুষ অনেকে শহরের কলে মিলে-কিংবা গেরস্ত বাড়িতে
স্বপ্ন দেখে দারোয়ান অথবা বেয়ারা।
যারা আছে তারাও স্বাধীন নয়, বেঁচে আছে নেহাৎ নাড়িতে
দীর্ঘজীবী দেশজ স্পন্দন, তাই।
অথচ স্বাধীন নয়, হীনমন্য দীন।

আশ্চর্য সুন্দর রাস্তা, যেন ডাকে একটি সংলাপে
সমস্ত শহর গ্রাম, প্রত্যেকেই সংলগ্ন অথচ স্বাধীন।
গাড়ি থামে। কফি নামে, জলযোগ কিঞ্চিৎ স্যাণ্ডউইচে
এবং আপেলে, মুক্ত দৃশ্যে। ধোঁয়া নেই, ধুলো যদি ওড়ে
তাও বিশুদ্ধ মাটির, মেঠো, ছুটি-কাটানোর উপযুক্ত।
দূরে দুটি গ্রামীণ বালক, আদুল শরীর,
জিজ্ঞাসায় স্থির, দেখে আমাদের আর
মধ্যে মধ্যে পদচারণের ছন্দে দিগন্তে তাকায়
পাহাড়ের নীলে।

কি ভাবে তা সঠিক বুঝি না, কাছে গেলে
ভয় পায়, পিছনে ফিরায় মুখ, তারপরে ছোটে
আঁকা বাঁকা গ্রামের গলিতে, মাঠে, পাকা রাস্তা ফেলে
মানব সন্তান দুটি ! দেশজ হিসাবে আত্মীয়ও বটে ॥
২৪ অগাস্ট, ১৯৬৯

কেন ভাবো স্বপ্ন শুধু পলায়ন ?

কেন ভাবো স্বপ্ন শুধু বাবু পলায়ন ?
স্বপ্নকে কেন এ ভ্রান্ত ভয় ?
স্বপ্নেই দেহের শান্তি, প্রাণের আরাম, মনের পূর্ণতা ।
চাও, চাও আরো স্বপ্ন, থরো থরো অন্ধকার,
কিবা ঘুম কিবা জাগা, সদা স্বপ্নময় ।
বর্তমান অন্ধকারে রাস্তাও শূন্যতা চন্দ্রিম আভায়,
চাও বীজকম্প্র ভবিষ্যতে, বাস্তবতা, স্বপ্নে যা তন্ময় ।
ভয় কেন ? স্বপ্নেই মুক্তির জাগা, নবজন্ম, প্রত্যহের
জ্যোৎস্নাস্নাত রূপান্তর ।

দেখ, শ্রাবণ আকাশ ভরে অন্ধকার, মেঘের বিদ্যুত,
ক্ষণে ক্ষণে নক্ষত্র বিস্ময় ।
বুঝি তাই শ্রাবণের গানে গানে বাংলার আকাশ
বহুকাল ধরে সুরধুনী
ক্ষণে ক্ষণে চূড়ায় শীকর নির্বিশেষে সকলের
কৈলাস শরীর-মনে ।

অবশ্য এদেশে বা বিদেশে শ্রাবণের চাঁদ কিংবা জ্যোৎস্না
সবই অলৌকিক, কম পক্ষে অবান্তর, ঠিক ।
কিন্তু সেই হেতু কেন স্বপ্নও স্বাধীন মাথা ঠুকে মরে,
দুঃস্বপ্নে পালিয়ে যায় ?
শ্রাবণের স্বপ্ন সর্বদাই সবখানে,—
এমন কি পোড়া দেশে, বাংলায়
এমন কি আমাদের কলকাতার করপোরেশনেও ॥
২৭ অগাস্ট, ১৯৫৯

দক্ষ স্মৃতির বাগান

তোমরা ভালোই জানো কতটা কৃতজ্ঞ, আনন্দিত—
কে না জানে ! এই যে সদলবলে ঘুরিফিরি
বিস্তৃত নিসর্গে
অথবা প্রাচীন ঐশ্বর্যে বর্ণাঢ্য কালের বাগানে
এদিকে ওদিকে, প্রায়ই, অন্তত মাঝে মাঝে
স্মৃতির চারণে পুষ্পবীথি ফল, আর বনস্পতি, উপকারী বহু গাছে,
পাতাবাহারেও,
রঙের গন্ধের ঐশ্বর্যে বাগান পরিপূর্ণ সারাদিন
রৈবিক সকালে সাঁঝে মধ্যাহ্নেও আর নাক্ষত্রিক অন্ধকারে
প্রত্যহের গ্লানিহীন
জীবনের স্বপ্নে আর স্বপ্নের পরেও
বাস্তবে ও ঘুমে যে দেশে চৈতন্যে ঝরে
মেঘ রৌদ্র, জল অবিরল গানের ত্রিধায়
ধারাস্নান সংহৃত গম্ভীর—
স্নায়ুর এবং বুদ্ধির অর্থাৎ চৈতন্যের সর্বাঙ্গে গভীর
মুক্তিস্নান ।

অবশ্য হঠাৎ হঠাৎ বিশিষ্ট কারণে
—যে বিষয়ে হয়তো অন্তত আমি নিতান্তই অজ্ঞ অজ্ঞ—
সম্ভবত অকারণে কোনো আপতিক গৌণ আক্রমণে
নিজের মনের অগোচর মনে তোমরাই কেউবা
ছিন্ন করো দশপ্রহরণধারিণীর খর খড়্গে
ইরায় ও পুরোডাশে চিৎকমলতারিণীর মহাযজ্ঞ
বাস্তবে স্বপ্নে যা একাকার ।

দক্ষ স্মৃতির বাগান দগ্ধ মুহূর্তেই শুধু
তোলো হাহাকার শত কিরাতের ক্ষিপ্ত ভর্গে ।

পিছু পিছু ওরা বুঝি বা আমরাই ?
দীর্ঘকায় ইতিহাস স্বয়ং পালায় সেই অস্পষ্ট নিসর্গে ॥

৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

তোমার সংলাপে, ভ্‌লাদিমির ইলিচ্‌ লেনিন

ক্লান্তিহীন
তোমার আভায় জ্বালি দিনগুলি জ্বলদগ্নি জবাকুসুমসঙ্কাশ,
তাই নেভে সূর্যরাঙা সন্ধ্যাগুলি প্রাজ্ঞ পারিজাত।
তবু কেন থেকে থেকে দিনগুলি বিবর্ণ শেফালি ?
আর রাত্রি কণ্টকিত নীরক্ত গোলাপ ?

প্রতিটি দিনের দাবি রাত্রিময় স্তব্ধ অবকাশ
রাত্রি চায় অপচেতা কর্মের নিপাত,
নক্ষত্রে মিলাতে চায় অন্ধকার অর্থের কাকলি,
ভ্রান্তির ট্রাফিক জ্যামে অপঘাতে শান্তি চায়, প্রাণপণে চায়
তোমার সংলাপ,
ভ্‌লাদিমির ইলিচ্‌ লেনিন ॥

১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

আদ্যন্ত বুননে আজ

আমার স্মৃতির হর্ম্যে শতবর্ণ নক্সী কারুকার্যে
তোমার যে ঐশ্বর্য তা ক্লান্তির বিভ্রান্তি-হেতু
মুছে দেবে তুমি ? অসম্ভব। মৃত্যুঞ্জয় বেঁচে আছি আজ যে,
সে বাঁচা তোমারই শত নক্সা-বোনা মীনকেতু
আমারই সংবিৎ ছেয়ে ইন্দ্রধনু, সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে।

তাকে তুমি ভেবেছ কি করো প্রতিক্রিয়ায় নস্যাৎ ?
করো যদি, জেনো সখী অচিরেই তুমি অকস্মাৎ
দেখবে আমারই কাঁথা আদ্যন্ত বুননে আছ সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ॥

১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

চৈতন্যের উত্তরণে

ভেবেছ কি লেখার আঁকার গাওয়ার গড়ার,
কাঠ ছেঁটে কষ্টি কিংবা বেলে কেটে খোদাই করার
গঠনের দিব্য ঝোঁকে যারা অবচেতনের তলে

নিয়মিত চব্বিশ না হোক বেশ কয়েক ঘন্টাই
ঘোরে থাকে, সারাদিন নিশিপাওয়া নিস্পলক চোখে,
যেন বা তাদের চোখ মুখ হাত এমন কি মনটাই
সম্পূর্ণ আয়ত্তে নেই প্রতিষ্ঠিত সাফল্য-কৌশলে।
কারণ তাদের কেউবা অনেকদিন কেউ কম,
আয়ুর মাঠটা ব্যেপে দৌড়ের ঘোড়ার ক্ষ্যাপা রোখে
ছুটেছে সে কোন লক্ষ্যে লক্ষ্যভেদে, কার মুনাফায় ?
দৌড়ে সে মট্‌কে পড়ে সেটা কার লোভে অন্তিম দফায় ?

শুধু শিল্পী কবি নয়, সর্ব সৎ সংগঠনকর্মে এই তো নিয়ম।
ফলে, আশ্চর্য কি ! যদি দেখ তার জীবনযাত্রায়
বিনিদ্র রাত্রিতে কিংবা স্পষ্টাস্পষ্টি দিনের আলোয়
বাজারে দুর্নাম রটে বেচারার, নানান্ মাত্রায়
কারো কারো মন্দ ঘোর নিন্দনীয়, শাদায় কালোয়
খারাপে ভালোয় ভয়াবহ, দূরে পরিহার্য কখনো বা
অন্তত সমাজে তাই সভ্যতার ব্যবসায়ী ইতিহাসে অদ্যাবধি।

নব্য ভব্য কেউ ভাবে না যে কোনো দৈবশক্তি
ভর করে এদের করে প্রতিবাদী, দিব্যোন্মাদ। দেবদ্বিজে ভক্তি
সেজন্যই অধুনা কিঞ্চিৎ কম, শিল্পীর জীবনও
ধনিক বণিক বিশ্বে ভাগ্যবান কয়েকটি ছাড়া প্রায়ই পল্বল,
যদিচ পৃথিবী সুন্দরী এবং মানুষ মহান, জলধি
নিরবধি কাল। যার ফলে ধৈর্যচ্যুতি স্বাভাবিক
আত্মীয় বা বন্ধুদের, অথবা শত্রুর। তবু শোনো বলি হে প্রেয়সী।

মনে রেখো এ বক্তৃতা তোমরাই তো ভাগ্যের নাবিক
বা নাবিকা চিরনাবালিকা ! অথচ সর্বত্র লবণাক্ত জল !

দুস্থ এই হতভাগ্য অবশ্যই বহু দোষে দোষী,
যা ক্ষমার্হ, স্নায়বিক চৈতন্যের অখণ্ডতা-হেতু
রচয়িতৃদের বহু ক্ষেত্রে বোধ্য, মা তুমি জঠরে জানো, যতই না ধিক !
সমাজপতিরা বলে, যত ধূর্ত ভণ্ড।
আমাদের জন্মলগ্নে তুঙ্গী মীনকেতু
অথবা বাগ্‌দেবী ! সমাজে আজন্ম ভঙ্গ শিল্পী অবচেতন ও চেতনের সেতু,
চৈতন্যের উত্তরণে ঈশ্বর পাটনী তারা, বীর বৈজ্ঞানিক ॥

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

আভঙ্গ মূর্তি

তুমি আবির্ভূত হলে আকস্মিক, সেকালের দেবী,
নাকি নব্য ভাস্করের বিমূর্ত শিল্পের হৃদয়-ঈশ্বরী
মানব কন্যাই কেউ প্রস্তরিত ?
কৃষ্ণ কটিতে আঘাতে আঘাতে অবধৃত
গৌরবে উত্তীর্ণ যে গরিমা
প্রাচীন দিঘির কর্দমাক্ত জলে স্থলে
আলো অন্ধকারে আন্তরিক
চিরায়ত ধ্যানকম্প্র সংগঠন বলে
শৈবাল ছায়ায় খর রৌদ্রে পরীক্ষায় অবিরত
বিচ্ছুরিত আভা দেয় ক্ষয়হীন
সময়ে ও জলে জলে রাত্রি দিন জেগে প্রতীক্ষায় মসৃণ শবরী,
যেন রামলীলা ঢালে শ্রবণে দর্শনে চৈতন্যের অতল মায়ায়।

কার শিল্প সৃষ্টি এল সৌভাগ্যের আকস্মিকে পাওয়া
পায়ে ধাক্কা হাতে স্পর্শ লেগে ?
ঈষৎ আভঙ্গে স্মিত স্থির দৃষ্টি,
অক্ষির তারকাহীন শতেক ব্যঞ্জনা আলোর কৌণিকে,
নীলাকাশে চঞ্চল ছায়ায়,
দেবী মূর্তি ? নাকি কারো মানবিক প্রেমের মঞ্জরি
স্নায়ুতে হৃদয়ে চেনা পদাবলী ভাস্কর্যের ঈষিত মায়ায় ?
নাকি তুমি ত্রিকালের ঈশ্বরী পাটনী মনপবনের নায়ে
মনেরই গঙ্গায় অতীতে ও ভবিষ্যতে দিকে দিকে
বরাভয় মেলে বর্তমানে ধাবমান
নিজেই নিজেতে স্থির নিশ্চিত কায়ায় ?

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

আলেখ্য : ২১

(শ্রীমান দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে)

কোথা চেরাপুন্‌জি কোথা সুদূর সাহারা !
দেশজ লাবণ্যে পুষ্ট, মৃত্তিকা-মেদুর
কান্তি তার। সেও বুঝি মেনে নেবে হার
কোম্পানির পত্তনীতে নিওন-নীলায় ?

নীরক্ত কি ? দেখা শক্ত, বুঝি যত দূর,
মেনেছে, যেমন মানে, উড়ন্ত হাওয়ার
আবেগে কবন্ধ ছাদে উদ্ভিজ্জ লীলায়
দুর্মর পিপুলচারা ভাঙে পলেস্তারা।

তেমনি এ সুভদ্র কন্যা প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বে
জয়বিন্দু এঁকে দেবে ঘন শ্যাম মুখে
আসমুদ্র পৃথিবীর বাষ্পে বাষ্পে সুখে
মেঘের ডম্বরে নম্র তেজে স্থির চিত্তে।

সপ্তরথী ভাসে, বেঁচে ওঠে সর্বহারা
খরা হয় শস্যস্নিগ্ধ ডাঙায় টিলায় ॥

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

দীর্ঘ মুক্তিস্নান চলে

দীর্ঘ মুক্তিস্নান চলে আর চৈতন্যে শরীর
সমুদ্রে-সৈকতে-জলে বালিতে ফস্ফর জাগে
বিভোর—যে জাগৃতির ব্রাহ্মঘোরে শিশু
ঘুম থেকে জেগে থাকে ধ্যানমগ্ন বীর
মায়ের আয়ুর স্পন্দে যেমনটি থাকে
সমুদ্রের অগাধ নীলিমা, যে নীলে শরীর স্থির
জেগে থাকে শুকতারা সুদূর পাহাড়ে চৈতন্যের বিশ্বের সংরাগে

সে কি ভাবে আরেক পর্যায় উন্মোচিত
সৈকতের ফেনময় অতন্দ্র ফস্ফরে ?
ভাবে ভোরে নতুন অধ্যায় অনাঘ্রাত মেলে ধরে
হৃদয়ে শরীরে ?
আর ক্লান্তির অতীত যায় দূরে চলে
অশ্রাব্য গঞ্জের ঘাটে শহরের হাটে যেখানে কবিতা ছবি
সবই ভাগাভাগি করে অস্পৃশ্য অদৃশ্য মূষিক তস্করে ?

হয়তো বা সঠিক জানে না তবে এইটুকু জানে
শরীরের অন্তঃস্থ প্রজ্ঞানে

চৈতন্যে সাযুজ্য সঙ্গে স্তব্ধতায় শূন্য ডুবে যায়
আকাশের পাড়ে পাড়ে সমুদ্রের বিশ্বব্যাপ্ত রাত্রি আর দিনের একতা
যেখানে অভিন্ন এক, দেশে দেশে ধ্যানমগ্ন জয় পরাজয়ে,
ক্ষয়ের অনন্ত সুরে শান্ত শুভ্র উদার ভৈরবী
আয়োজন ঊর্মিময় চৈতন্যে অক্ষয় ॥
১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

তাহলে কি ক্ষমতা মাত্রেই

তাহলে কি ক্ষমতা মাত্রেই মারীর বীজাণু ? বিদ্যাবুদ্ধি হৃদয়বত্তার
নীলে নীল জলে কেন চড়া পড়ে ঠিক যে মুহূর্তে হও গদিতে চড়াও
অথবা গদির স্বপ্নে—মাঠে বাটে বিচ্ছিন্নমস্তার
সমাজসম্বন্ধহীন অঙ্গহীন হানাহানি.আপিসে কোঠায় জঙ্গলে ?
লোকে বলে শ্মশানে মড়াও হাসে আজকাল জীবিতকে, তোমাকে
আমাকে দেখে !

অত্যন্ত অস্বস্তিকর ব্যাপারটা, অবশ্যই ব্যক্তিগত পরিস্থিতি, তবে কিনা বৃহত্তর
অর্থে, কারণ সবাই
যারা প্রাণপণে খেতে কলে খাটে, গড়ে, আঁকে, গায়, বলে, বোনে,
ভানে, লেখে,
তারা বোঝে সশরীর মর্মে মর্মে তারাই অক্ষম, গৌণ, তারাই জবাই
ক্ষমতার খেলোয়াড় অন্ধ পায়ে, যতই না একা একা, দঙ্গলে দঙ্গলে
ওই, পা বাঁচিয়ে ছোটে, যেন ক্ষমতাই বাজারের তেজি মন্দি দাঁও লোটে—
কারো বা কপালজোরে, কারো উত্তরাধিকারে কারো ফন্দি বা
ফিকিরে ঘোঁটে ।

যদিচ অস্বস্তিকর ব্যাপারটা, অধিকন্তু মন্দ, ক্ষতিকর— শরীর মনের পক্ষে
এই অক্ষমতা, কারণ সান্ত্বনালোভে মনে হয় বুঝি এই অক্ষমতা
এই গৌণ হয়ে থাকাটাই একমাত্র সৎ পন্থা অবান্তর নিলামি গদির
গোলামি গুহার বিশ্বে— সর্ববিধ ক্ষমতার বিকলাঙ্গ ক্ষতবিশ্বে ।
তাইতো চিন্তার কথা এই দুষ্ট পরিস্থিতি, যখন যারাই আঁকে,
গড়ে, গায়, বলে, খাটে চষে, বোনে, লেখে, যাদের কাজেই জীবন্ত মমতা,
যাদের দিন ও রাত্রি আভা ফেলে নীল জলে, জোয়ারে ভাঁটায়, বিরাট নদীর
বাঁকে বাঁকে
কূলে কূলে বেয়ে যায়, বয়ে যায়, নীলিমাই তুলে নেয় বক্ষে বক্ষে ।

ফলে প্রশ্ন ভাসে জলস্রোতে ; শেষটায় কি লক্ষ লক্ষ অক্ষমেই হবে
সমতটে একাকার সৃষ্টিময় প্রাকৃতিক প্রকৃত ক্ষমতা, মানবগৌরবে ?
১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০

পরদেশি পরবাসী কত ছিল লেনিন তোমার দেশে ?

বহুদিন যেন আসিনি এ দেশে, আপন দেশেই
পরদেশি, নাকি পরবাসী শুধু পরগাছা সৌভাগ্যে ?
অথচ নেহাৎ দেশজ, মূলত গ্রাম্য,
বড় জোর কলকাত্তাই আধা-শহুরে বেশে—

চিরপরিচিত দৃশ্য কেন বা এমন অচেনা লাগবে ?
স্মৃতিতেও নেই চেনা সেই শত সহস্র মহীরুহ ?
আরণ্যক সে মহিমা প্রাকৃত সুখী দুখী জনপদে
আলোয় ছায়ায় নিয়মিত মেঘে রৌদ্রে কম্প্র, কাম্য ?

শুধুই কি চোখে, হাতে পায়ে আর রক্তিম সংবিতে
ফোটে যে দগ্ধ মাটির ঢেলার হঠাৎ হঠাৎ ব্যূহ।
শুধুই আগাছা চোর বিষ কাঁটা খোঁচাবে গুপ্তিক্ষতে ?
অন্ধ ধূর্ত পাশার দুরাশা বাগাবে. জোগাবে শক্তি ?

সারা দেশ তারই মস্তিতে হল জগ্ধ নগ্ন নিলাজ,
দুঃশাসনেরা কীচকেরা গাঁথে কত অপচেতা চুক্তি !
দুস্থ প্রকৃতি, ক্লান্ত মনীষা, দুস্থ বিশ্ববিরাজ।
পরদেশি পরবাসী কত ছিল লেনিন তোমার দেশে ?
৯ মার্চ, ১৯৭০

Lenin and no myth of Lenin—

আশ্চর্য ঘটনা এই বটে : মানুষের ইতিহাসে রুশের লেনিন !
ইতিহাসে দেখি ভাসে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কত দিগ্বিজয়ী বীর
সসাগরা ভূখণ্ডের লোভে মত্ত !
অথচ বস্তুত দেখি সূর্য
লেনিনের মহাবিশ্বে গান করে অনির্বাণ কিবা রাত্রিদিন !

লেনিনের মনীষার হস্তাক্ষর বিশ্বব্যাপ্ত আজ ইতিহাসে,
অটল নেতৃত্বে বীর্যে কণ্ঠ যার ত্রিকালে বাজায় তূর্য
অভ্রান্ত চিন্তায় তীব্র ! অথচ স্বভাবে তিনি আত্মস্থ সজ্জন ।

শক্তির পুরাণ তিনি চাননি, ও গড়েননি, সুস্থ, বীর, স্থির
আজীবন স্বয়ং ছিলেন মানবিক সাধারণ্যে অসামান্য জন ।

কেন বা সবাই চিন্তা করি না যে লেনিনের প্রাজ্ঞ প্রতিভাসে
৫ মার্চ, ১৯৭০

মন হয় প্রত্যেকে লেনিন

তোমাদেরও মনে হয়, মনে হয় তোমরাও প্রত্যেকে লেনিন ?
লাজুক সুকান্ত ওই কথাটাই বলেছিল কৈশোর সংরাগে বহুদিন আগে ।
সহজ বিনম্র কবি বাংলায় তার কথা শতবর্ষে জাগে ।

কারণ লেনিন নন দেবতা বা পুরাণনায়ক, তিনি একালের বীর,
স্থির ধীর ভাবুক, আত্মস্থ, নেতা, মানবিক, নিজেকে জাহির
কখনোই করেন নি ; এমন কি কোন এক সভাঘরে স্বয়ং লেনিন
পূজারীর অত্যুক্তিতে শোনা যায় উঠে যান সঙ্কোচে বিরাগে ।

তাই আজ মনে হয় যদি সারা দেশ ভাবে, ভাবে প্রতিদিন
সাধারণ মানুষেরা, সকলেই, নিত্য ভাবে— দীন হই নই কভু হীন
তাহলে হয়তো হবে প্রতিমাস অক্টোবর, প্রতিদিন প্রত্যেকে লেনিন ।

শুনেছি যে লেনিনেরও সাধ ছিল একদিন সকলেই হয়ে যাবে শতায়ু লেনিন ॥
১৩ মার্চ, ১৯৭০

নামাও উষ্ণ বন্যা

তুষারমৌলি ভাবনা যখন স্বচ্ছ ঝর্না
নামাবে তোমার চৈত্রের শেষে তাপের গানে
তখন কি মনে পড়বে আবার আসছে বছর
হিম হয়ে যাবে অথচ বদ্বীপে দিচ্ছ ধর্না !

তোমাকে দেখেই বুঝি মানুষের মনকে টানে
একাধারে হিম জমাট শুভ্র দূর অগোচর
আবার সে ঘামে আশ্লেষে মাতে বাংলার চরে
ভরাটি ভাসায় আবেগে গলিত হিমের বানে।

থেকে থেকে দেখি হৃদয় তোমার মৌনব্রত
আবার হঠাৎ চঞ্চল হও স্বচ্ছ ঝর্না।
সে কি তুমি মানবিক তাই হিমে আত্মরত,
তাই প্রাকৃতিক নিয়মে নামাও উষ্ণ বন্যা ?
৩০ মার্চ, ১৯৭০

অনেক হৃদয়ে

একক মাহাত্ম্যে ছিল সুপর্ণ পিপুল, যেন ঘন অরণ্য একাই।

কালান্তরে দেখি প্রায় অগোচর, মৃত্তিকারও মরুবীজ সংক্রমণে
রুগ্ন মগ্ন উর্ধ্বমূল, আদিম মূল্যের জীর্ণ দণ্ড শূন্য বনে,
ভগ্ন উরু দীর্ণ আশা, কুরুক্ষেত্রে যতদূর আমরা তাকাই।

আশাভঙ্গ মূলত কি মানবিক নৈঃসঙ্গ্যই নয় ? বিবিক্ততা
অনেকাংশে একাকিত্ব নয়, অনেক্ সময়ে ? নৈরাশের ভাষা,
এই অমানুষ পত্রপুষ্পজগদ্ধ দগ্ধশাখা মৌনের তিক্ততা
মনসি সন্ততা ক্রন্দসীর প্রান্তরে লম্বিত দিগন্ত পর্যন্ত,

অথচ যেখানে অন্তর্দৃষ্ট জলধরশ্যাম অনেক হৃদয়ে
বজ্রে বজ্রে গাজনে মন্থিত করে বিদ্যুতের নীলকণ্ঠ আশা,
দূর্বাদিল অভিরাম এ-মাঠে ও-মাঠে, ধানীরঙে আদিগন্ত
অরণ্যের সংবৃত মিছিলে, একত্র সংহত অন্বয়ে অব্যয়ে,
আশার ও নৈরাশের পর্বে পর্বে পুরুষার্থে দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ ভাষা,
যে ভাষায় জীবনের দীর্ঘছন্দ কর্মে স্বসমুখ আদিঅন্ত ॥
৭ এপ্রিল, ১৯৭০

তাই হোক, ভাঙো তবে

তাই হোক, ভাঙো তবে, ভাঙো, তাই হোক,
নির্বিকার প্রতিবাদে তোমার সৈকতে সিক্ত কঠিন পাথর
অক্লান্ত চেষ্টায় ভাঙো যুগযুগান্তের গড়া চূড়ার নির্মোক।
তোমার শ্রমিক ধৈর্যে স্বয়ং ত্রিকাল সমবেদনা-কাতর।

সদ্য ভিজা বালি নুড়ি প্রকাণ্ড চাঙড় দুহাতে ছড়াও
অধ্যবসায়ের রৌদ্রে হীরক ও রাত্রির ফস্ফর,
বিপদসঙ্কুল পাড়ে পাড়ে বেয়ে যাও ঢেউ তুলে তুলে,
নোনা নীলজল আর নীলাচল বাঁধো পরস্পর ॥
১১ এপ্রিল, ১৯৭০

সেই কবে কোন এক ইস্টেশনে

We disregard a number of attributes as contingent.
We separate the essence from the appearance...

কী আশ্চর্য লেগেছিল
অথচ ঔচিত্যে সোজা স্বাভাবিক, তাই এখনও অবাক!
যখন পারলুম সেই স্বভাবের যথার্থের ইতিবৃত্ত জানতে,
সেই কবে কোন এক ইস্টেশনে, রুশিয়ার উত্তর সীমান্তে,
সহকর্মী কয়জনে সময় হয়েছে কিনা,
সেই তর্কে ব্যতিব্যস্ত,— আর লেনিন বললেন, সদ্য দেশে-ফেরা,
কিন্তু সেই সদা তীব্রতায় মিতবাক্, সোনালি শ্যেনের দৃষ্টি একবার হেনে—
তাহলে সিদ্ধান্তে এলে ডেকে দিয়ে বোলো,
আপাতত এই প্ল্যাটফর্মটার ওপরে শুয়ে পড়ি—
ক্লান্তিতেও সংশয় দ্বিধার নই ভক্ত।

সিদ্ধান্তে পৌঁছল যেই জনা কয় সহকর্মী, জানালও,
অমনি ক্লান্তিও দূর! শুরু হল সেই ক্ষিপ্র মাপা পদক্ষেপ,
স্নায়ু মননে সংবৃত কেন্দ্রে
ব্যক্তি বিশ্বে ধৃত ব্যাসে। তারপরে,
তারপরে উনিশশো সতেরোর শবরী আগত ঐতিহ্যের সপ্তপ্রান্তে,
আজও সে সত্তরে স্থির, চিরগতিশীল কেন্দ্রে
মৃত্যুহীন সুর!

বোলো তাকে বোলো ব্যাপ্ত আজ এই ভুলভ্রান্তিতেই,
এমন কি দুর্গতির দুর্মর অভ্যাসে দুর্বল বাংলায়।
তাই বাংলাতেও সূর্য জ্বলে, চেতনায় উদয়াস্ত। আর সোনালি
সূর্যেরা ঝরে
যেখানে তরুর তম্বুরা বাজে বাগানে ময়দানে পথে
আর সর্বত্রই উন্মীলিত গুলমোরের থোলো ॥
২৪ এপ্রিল, ১৯৭০

মনে কেবা শান্তি চায়

মনে কেবা শান্তি চায়? প্রশ্নময় অশান্ত প্রহর চাই,
প্রতিদিন প্রতিরাত্রি। শান্তি চাই নরাধম শক্তির খেলায়,
খেলা কিম্বা মরিয়া কামড়ে ক্রূর কর্কটের লোভের বড়াই
যাতে চিরতরে পায় ক্ষান্তি। আমরাও শুদ্ধিতে চাই
যেন অশান্ত অতৃপ্ত মুক্ত মননের অনন্ত মেলায়
জিজ্ঞাসার স্তরে স্তরে প্রশ্নে আর উত্তরণে পাই
তৃপ্তিহীন মহাশান্তি, মানবিক সর্বদাই লড়ায়ে অস্থির,
কিন্তু মৃত্যু এনে মৃত্যু হেনে নয়। আমরাই, যারা বীর,
তারা বভ্রুবাহন যে বৈজ্ঞানিক মানবিক মনের মুক্তির,
যেখানে নরক স্বর্গ-বাদী মহাজন স্বর্গতের কালের ভেলায়
সৌরজগতের বিশ্বে লুপ্ত, অস্থিসার-ডাইনোসর, যেখানে সদাই
মানুষ, মানুষ মহামানবিক ভবিষ্যতে গত-কে মেলায়
লুব্ধের কর্তৃত্ব ফেলে বাস্তবের সত্যে স্বপ্নে কবিত্বের গর্বিত হেলায়।
শান্তি চাই ব্যাপ্ত বিশ্বে, মনের স্বাধীন সংলগ্ন অশান্তি চাই ॥
২ মে, ১৯৭০

কেবা যাত্রী কে পাটনী

ব্যথার ঘূর্ণিতে—কিংবা বলি— ঢেউ ভেঙে, ঢেউ তুলে
মৎসার্টের কনচের্তোর মুরলী-দোহারে কিংবা
আদাজ্যো-ফ্যুগের তন্ত্রী টেনে টেনে,
কিংবা আরো মর্মভেদী উপমা হয়তো বেইথোফেনে,
চতুর্তন্ত্রী যন্ত্রণার উত্তীর্ণ মুক্তির মর্মান্তিক কূলে—

হাইলিগে দাংগেসাং—থরো থরো আরোগ্যস্নানের
তীব্র জয়গানে— প্রসাদে জীবন গানে মৃত্যুকেই তূর্য হেনে।

এখানে প্রশান্তি গড়ি তিক্ততার পলি-পাড়ে, আঘাতের সীমা জেনে,
অস্তিত্বের সহকর্মী যন্ত্রণার বধির সংগীতে সংহতির আনন্দনে
যেখানে কবিতা ওঠে ভাষার অতীত সুরে ফুটে
যেমন শিলের হ'ন বেইথোফেনে রূপান্তরে মৈত্রীতে উত্তীর্ণ
যেমন ট্রাজিক বৃত্ত পারমিতা প্রজ্ঞা পায় স্বীয় ছন্দ
বৈপ্লবিক আরেক উল্লাসে আরেক শান্তিতে দীর্ণ, পুনর্পূর্ণ,
আত্মদ্বন্দ্বের নৈরাশ্যেরও আশার উৎসে নাস্তিক্যে আস্তিক মনে
রূপনারাণের কূলে প্রাত্যহিকে জেগে ওঠে
প্রাণময় স্বপ্নে— যেন মার্কস্, যেন লেনিনের রক্তের অক্ষরে তূর্ণ।
তাই বুঝি কেবা যাত্রী কে পাটনী
হয়ে যায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে সকলই অভিন্ন ॥
১৪ মে, ১৯৭০

ভিক্ষা দিয়ে ভিক্ষা মেগে মেগে

নিসর্গের স্থানে কালে, নিকট ও দূরের মানুষ
আশে পাশে সর্বদাই চলে বসে, খাটে, ভিড় করে,
সংগীতে ও নৈঃসঙ্গ্যে প্রায় একই আবশ্যিকতায়।
তাই বুঝি প্রত্যহই দিনে রাতে, একান্তই প্রাকৃতিক
অথচ বিশুদ্ধ এক মানবিকতার,
গান শুনি নানাবিধ ছবি দেখি হাতে হাতে গড়ি মূর্তি,
যেন বা আমিও আঁকি গড়ি যেন আমি সুরেরই মানুষ,
বিশেষত যেই আশেপাশে জীবনে বা জীবনের খবরাখবরে,
চেতনার চূড়ায়, মননে যেই অতল গহ্বরে চিড় ধরে—
বিশেষত তখনই প্রবল ঘোরে,
সূর্যের উড্ডীন ঘোরে উজ্জ্বল আলোয়
কিংবা তারা-নেভা নীল স্তব্ধ ভোরে
যখন বিষাদ কিবা কিবা স্ফূর্তি
কেবা আছে কেবা নেই কাছে কিবা দূরের মানুষ
নিসর্গে ত্রিকালভর্গে
মানবিক কালের খড়্গে অশ্রুর প্রহরে জেগে কর্মিষ্ঠ প্রহরে
একাকার যখন জীবনমৃত্যু, আশা ও নৈরাশ সামাজিক

একা ও বহুর অঙ্গাঙ্গি একাত্ম বাহুডোরে
ভিক্ষা দিয়ে ভিক্ষা মেগে মেগে ॥
২৭ মে, ১৯৭০

সাধ্যে-সাধে

ছোট ঘর, অনেক মানুষ,
গাছ্ ঘাস পুড়ে খাক্ ইট
হাওয়া বন্দি, আলো ক্ষীয়মান,
দিনে টানে নিশি-পাওয়া গিঁট।
মেয়েরা উদ্‌ভ্রান্ত, ম্রিয়মান,
অন্য পক্ষে উদ্বায়ু পৌরুষ।

কোথা রাবীন্দ্রিক প্রিয় গান ?

অনেক মানুষ, ছোট ঘর,
সংগীত গাঁথে না পরস্পর।
অথচ কোথায় কে পালাই।
গ্রামে তো শহরই ক্ষীয়মান,
নিসর্গেও লোভের বালাই
মুমূর্ষুর গ্রামীণ শহর।

বেসুরে জীবন খান্‌খান্‌
ধূলিসাৎ, কোথায় পালাবে ?
যেখানেই যাবে মনপ্রাণ
বৃথা খোঁজা ! তৈরি কিবা পাবে ?
নিজে সেধে গড়ে পরিত্রাণ
সাধ্যে-সাধে অদ্বিতীয় গান ॥
১০ জুলাই, ১৯৭০

উন-চতুর্দশপদী

মুশকিলটা আমাদেরই, সকলেরই, কমবেশি, একালে কপাল
অনিশ্চিত, নিদেন দুর্জ্ঞেয়, যেন সকলেই আদম বা ঈভা।
দান্তের কপাল ছিল ভালো, জঙ্গি, ছিল তাঁর শ্রম ও প্রতিভা,
যুগ ছিল অনুকূল, মননের নব্যজাগরণে প্রাতঃকাল।
তিনি তাই সরাসরি অঘমর্ষলোকে নরকে ও স্বর্গে
নিষ্ঠা বিবেচনা মতে শত্রুমিত্র টেনে রাজনীতিতে উত্তাল
ঘৃণার তরঙ্গ তুলে, কিংবা প্রেম জ্বেলে বিশ্বজননী সন্নিভা
ন্যায় বুদ্ধিকে আয়ত্তে এনে কালোচিত মহাকাব্যে আত্মোৎসর্গে
স্বধর্ম সারলেন ভালো। মুশকিলটা আমাদেরই পাইনা নাগাল ॥
সোজাসুজি উত্তরণে, অতল উত্তুঙ্গ আমাদের মর্ত্যস্বর্গে।
কোথা সে রুশতী ? দেবে হিরণ্ময় সত্যে, মুঠি শান্তি-খড়্গে,
ঐকান্তিক চৈতন্যের সাধেসাধ্যে শারদীয় প্রভাতীর বিভা ?
অথচ ছেয়েছে বিশ্ব, তারই লক্ষ পত্র, মানবগীতার ভর্গে !

২৬ জুলাই, ১৯৭০

ফ্রানৎস্ শুবের্ট—কোয়ার্টেট ১৪

বিদায় যে নেব, তাও মনে হয় অকালেই কুসুমিত সাধ,
কারণ সমাজ দেখি, নিসর্গেও, মনে হয় ঘোর অসময়।
অথচ সবাই চাই বিদায়ের দিন হোক মানবিক মননে অবাধ,
বিরোধেও স্বস্থ মুক্ত, সুস্থ দ্বন্দ্বে মানবিক চাই বরাভয়।

অথচ সময় মানি সমাগত বিদায়ের অনন্তে অগাধ
অনেক নদীর নীল মোহানায় টলোমলো বিরাট তন্ময়।
অথচ নির্দোষ ভ্রান্তি আজও ঢালে দূষিতের স্বর্ণময় খাদ।
বিদায়ের কালে ভাবি পূর্ণচ্ছেদে এই কি সময় ?

২ অগাস্ট, ১৯৭০

ঊষার আঁধার ছন্দে

তবু থেকে থেকে যেন
যন্ত্রণার তন্ত্রী বেঁধে করে যায় মন্ত্রমুগ্ধ গান,
নির্মম সমের যন্ত্রে সঙ্গতিতে অন্ধ সে কি ?
দক্ষিণে ও বামে উভয়ত, অর্ধ অন্ধ ?
নাকি শ্বেত গোলকের আপিঙ্গল কৃষ্ণে করে
আকণ্ঠ সে পান আলোর কোণার্ক বর্ণ ?
সপ্তস্বরে সপ্তসিন্ধু গান করে যখন সে,
যেন দেহে প্রাণে বিদীর্ণ দধীচি, মুক্তি আনে, মুক্তস্রোত গড়ে তোলে
ইস্পাতের গুপ্তি স্তূপে,
যতই না দানো-পাওয়া সোনার সাঁজোয়া কারা করে দেয় দ্বার বন্ধ।

মনে হয় সে রূপক,
দেখি শুনি তাকে মৃত্যুহীন প্রমেথীয় আদি রূপে,
আর প্রায় প্রতিদিন, সে অর্থাৎ রূপায়িত তার সত্তা
প্রায়ান্ধ প্রাণের গানে তীব্র করে, ম্রিয়মান রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ।
আমাদের মানুষের মরত্বে-অমর পৃথিবীর
দেখি তার প্রাণবত্তা আমারই মতন বহু অর্ধমৃত মানুষকে
প্রতিবেশী, সজ্জন ও পথিককে করে উদ্বেলিত।
মাথা ওঠে বনস্পতি আশাভঙ্গ বিরাট আকাশে সপ্তবর্ণরূপে,
নির্যাতিত অবহেলিত দলিত আমাদের
—শ্বেতাঙ্গের সেই অর্ধসত্যে নয়,— এই বাস্তবের পূতিগন্ধে
আমাদেরই অন্ধকূপে
ঊষার আঁধার ছন্দে ॥

৬ অগাস্ট, ১৯৭০

আকাঙ্ক্ষার রকমফের

I have desired to go
Where springs not fail,
To fields where flies no sharp and sided hail
And a few lilies blow.....

আমারও আকাঙ্ক্ষা তাই, কিন্তু কোথা সে কোন্ নিসর্গে
বৃষ্টি ঝড়ে শান্তি ঝরে ?
শিশিরের অন্ধকারে নক্ষত্র ঝংকৃত ঝিল্লি, শান্তির নির্ঝরে
মধ্যদিনে মৌন খড়গে ?

নিসর্গও মানুষেরই মানসের ব্যঞ্জনা কি, মননের বরে
দীর্ঘ মানবিক ভর্গে নয় ?
চেনা-অচেনার শত আকাঙ্ক্ষার মর্ত্যে, নরকে না, স্বর্গে নয়,
নিসর্গেই স্বভাবেই, বাইরে ও ঘরে ॥
৭ অগাস্ট, ১৯৭০

পরবাসীও যে নয়

উপমাও যেন মৃত আজ। জলে, স্থলে, বাতাসেও ছায় ছিন্নমস্তা,
এক নয়, শত শত। প্রচ্ছন্নে প্রকাশ্যে দেশে দেশে সর্বত্র তাদের যাতায়াত,
দেহে মনে, নাড়িতে নাড়িতে কীটাণুতে, ছিন্নভিন্ন গ্রামে ও শহরে,
এদেশে ওদেশে।
একমাত্র এখানেই জোড়া-মাথা কুবেরের সরকার গোমস্তা
গুপ্তি ঘরে দিব্যি নিত্য এদেশে ওদেশে প্রভুপদে করে প্রণিপাত,
মুখে চোখে একাকার, ভিন্ন শুধু এর ওর ভিন্ন ভিন্ন বেশে।

ছিন্নমস্তা সব কিছু প্রাকৃতিক মানবিক, অথচ শ্মশানও নয়,
ছত্রভঙ্গ জনপদ ছারখার এদেশে ওই দেশে গ্রামে ও শহরে,—
একমাত্র গোছগাছ সিন্ধুকে বন্দরে বিমানে আড়তে বস্তা।

মানুষই উদ্‌ভ্রান্ত, তার শরীরে মানস নেই, সদাপলাতক মনে ভয়।
পরবাসীও যে নয়, তাই স্থিতি-নীতি ভুলে যায় বাহিরে ও ঘরে,
শতভিন্ন মুখে ভাবে বেঁচে যাবে, শক্তির শিকার।
লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ছিন্নমস্তা।
পরকে ও নিজেকে ডরায়, ঘর নেই, দক্ষযজ্ঞ দেখে—
নাকি দেখেও না— বিদেশে, স্বদেশে ?
৮ অগাস্ট, ১৯৭০

রক্তের অবাক শক্তি

রক্তের অবাক শক্তি। অজেয়তা অগণন ধমনী শিরায়,
ঘাসে ফুল আজও ফোটে, ক্ষুদে-ক্ষুদে শত-শত মিলে
রক্তের বাহার অন্তহীন, স্বল্প দেহে দীর্ঘ আয়ু তেজীয়ান।
প্রতিদিন খাড়া মাথা তুলে, বনের বৈভব যখন জিরায়
অন্ধকারেও অম্লান, দেখা যায় চাঁদিনী বা নাক্ষত্রিক নীলে।
মনে হয় তাদের এ অমরতা বিস্ময় জয়ের জোগান্।

ঘরে ঘরে প্রাঙ্গণে গোচর মাঠে বিলাসীরও অপোগণ্ড মনে
পরান্নজীবীর চোখে, আমরাও বিনত দৃষ্টিতে প্রাণ ভরি
ঘাসফুলে অপরাজেয়ের বর্ণে, আর দেখি এ পাশে ও পাশে
তাদের হাওয়ায় দোলে স্নিগ্ধ শ্যাম সোনা ধানের মঞ্জরি,
আর চেতনাও স্পষ্ট হয় রূপায়িত তীক্ষ্ণ প্রত্যাশী মননে।
আমরাও মানুষেরা বেঁচে থাকি, শ্যামাঙ্গির প্রাণের পিয়াসে ;
যেমন সবুজ ধান হাওয়ায় হাওয়ায় দোলে মেঘের উল্লাসে,
যেমন ঘাসের ফুল বর্ণময় অমরতা ছড়ায় শিরায় ॥

৯ অগাস্ট, ১৯৭০

জঙ্গম সমীকরণ

দ্বান্দ্বিক বটে তাই সর্বদা উত্তরণ
মননে অস্থিমজ্জায় শ্বাসবায়ুতে।
তাই যন্ত্রণা, কারণ বিরোধ আমরণ
যদি চলে ন্যায়ে অন্যায়ে, বানে, নালাতে,
তাহলে বুঝিবা বিমূঢ় দীর্ঘ আয়ুতে
হতাশা হাজার স্বপ্নেই চায় পালাতে
দিগ্বিদিকের হতবাক্ ক্ষীণ স্নায়ুতে।

হয়তো তখন মেয়েলি দানের লালিত্যে
স্বপ্ন জীয়ায় কিংবা বিরাট নিসর্গে
নৈর্ব্যক্তিক মানবোত্তর সৌন্দর্য—
যদিবা ছন্দ আনে নশ্বর স্নায়ুতে,
চন্দ্রকোষের ঝঙ্কারে যদি ধৈর্য
চেতনায় বাঁচে, যদি কোণার্ক আদিত্য

বাজে প্রচণ্ড মধ্যদিনের বিসর্গে।

জানি যে শরীর মনে ইতি-নেতি স্মরণ
আজন্ম চায় জঙ্গম সমীকরণ ॥
১৪ অগাস্ট; ১৯৭০

মানুষ নির্ভয়

মরত্বে শঙ্কা বা আশা নয়।
প্রতিক্ষণে নশ্বর মানুষ,
সেখানেই মানুষের জয়।

তবে কেন ভয়ে দগ্ধ তুষ
জন্ম থেকে মরণ অবধি ?
মানুষই তো মরে মনোময় ;
মানুষেরই কাল নিরবধি,
বাকি সব তুচ্ছই তন্ময়।

আমাদেরই মৃত্যু অনির্বাণ,
মৃত্যুত্তীর্ণ তাই তো জীবন,
স্বচক্ষে দেখেছি মহীয়ান
প্রাজ্ঞ মৃত্যু করেন বরণ,
দেখেছি যে বীরের মরণ।

মানুষেরই মৃত্যুভয় সয়,
যে হেতু সে জীবনে চিন্ময়।
মানুষেরই বাঁচন-মরণ
স্বহস্তে মননে করে গড়ন,
আশৈশব বৃদ্ধেরা নির্ভয় ॥
১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

আফ্রিকায় এশিয়ায়

এখন গোধূলি ওড়ে, আর ওঠে নিত্যব্রত ম্লান সন্ধ্যাতারা,
সকালে যে সংহতির শান্ত শুকতারা। আর পাহাড়ে পাহাড়ে
তার নানা ছায়া পড়ে আর স্থির ধ্বংসপ্রায় বনের পাহারা
ইসারা ছড়ায় এই উৎক্রান্তিতে নিতান্তই মানবিক হাড়ে।

অবশ্যই মানবিক মেনে নিই, কিন্তু সেই কার্যকারণে যে
দুর্মর, অজেয়ই বলা যায়, যেমনটি কৃষ্ণকায়, পীতকায়
এমন কি শ্বেতকায়ও, বহুদেশি বহুভাষী নানা বেশে সেজে,
কেউ নিরুপায় নগ্ন, অর্ধনগ্ন, কেউ বা জড়িয়ে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে
মৌলিক আশায় খাটে জীবনমৃত্যুর পণরাখা প্রতিরোধে।

মানবিক, কারণ আকাশ পৃথিবী অর্থাৎ সমগ্র প্রকৃতি
তাদের সত্তায়, রক্তে, চৈতন্যের পাহাড়ে নদীতে এক নীতি
নির্ধারিত করে, যার দীর্ঘ ইতিহাস ব্যেপে এক কাম্য বোধে
রমণীয় রক্তিম আলোয় সূর্যোদয়ে মধ্যদিনে, অস্ত সূর্যে
শ্রমে ও নন্দনে আফ্রিকায়, এশিয়ায় মুরলি মৃদঙ্গ তূর্যে ॥

৩ নভেম্বর, ১৯৭০

অরণ্যের শেষ

জাগ্রত মননে, স্বপ্নে
অসম্ভব মানি—
জানি অবশ্যই অরণ্যেরও শেষ আছে।
হৃদয়ের, জীবনেরও ; কিন্তু কবে ও কোথায়
ঠিক বোঝা দায় নয়, তোমরাই বলো ?

খর ঝোপে ঝাড়ে রক্তে পাথরে কাঁকরে শতবিধ গাছে,
থেকে থেকে ভিন্ন ভিন্ন হিংস্র ডাকে উত্তাল পায়ের টলোমলো
ভিন্ন ভিন্ন জানা ছন্দে
দীর্ঘ দিনে রাতে ইতিহাসে, ক্ষণে ক্ষণে।

অথচ এখানে সর্বদা কি ছিল এই মহাবন ?
ছিল ভাবো এই বন্যতার আসন্ন আবাদ ?

জানি না কি লাভ পায়, কারা সেই মহাজন।
বন্য চাষি কিংবা গ্রাম্য প্রতিবেশী পায় কিছু ভোজ্য পেয় স্বাদ ?
পায় কিছু স্বস্তি, কিছু জিজীবিষা
এই বনে ও শহরে দ্বন্দ্বে ?

হতবুদ্ধি, একা একা চলি
বহুলোক দেখি বাকরুদ্ধ মহা-বন।
এই বানপ্রস্থ শেষ কবে কোথা
কার আদি কোন অন্তে
কার মনে কোন্ উজ্জীবিত সুস্থ বনে ?
২৮ নভেম্বর, ১৯৭০

জীবনের ঘরে নেই

My father used to say.......
Inns are not residences.

না, না, কারো জীবনের ঘরে নেই অন্য পথের সরাই।

কাজে যাবে যাও
কিন্তু জানো কোন কাজে ? কাজ বিনা ঘর
করা, গড়া, ভাঙা, জোড়া কিছুই যায় না।
স্ব-স্ব আত্মপর সংগতে সংগীতে ঘর-বাইরের সুর।
ঠিক তাই চাই হাত-পা নাড়ার ঠাঁই,
অবকাশ, ঘরে নীলাকাশ চাই,
সুস্থ সচ্ছলতা সকলের নিত্য এক-আধ প্রহর ঐকতান।
সত্যিই কি থাকে একা সব কণ্ঠে কণ্ঠস্বর
এককের, সুরেলা কি সদা তোমার প্রত্যহ বারোমাস ?

চাই বয়সানুসারে আর সম্বন্ধ-যাথার্থ্যে সমতাই,
নানা কোমলে গান্ধারে নানা নিষাদে মধ্যমে নানা
নদী খেত পাহাড় মাটিতে সংলগ্নতা, জানা বা অজানা
প্রচুর রচনা, কেন এক শুধু শত্রু কিম্বা ভাই-ভাই !

শুদ্ধ সভ্যতার মুক্তি স্বপ্নে ঘরে ঘরে, বিশ্বের আকাশ—
বিরাজিত রৌদ্রে স্বচ্ছ, মেঘে শুভ্র, নীলে নীল বারোমাস ॥
১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০

টিরানোসোরাই

এশিয়ায় অফ্রিকায়
আদিম ও অতিকায় জন্তুদের মতো তুমি
লুপ্ত হবে অচিরেই।

আজও শক্তিমদ অন্ধ, তাই নিজে বোঝো না জানো না
আজ কিংবা কাল ঐ অসমঞ্জস দেহ
সর্বংসহা মাটির তলায় হবে গত
ব্যথাতুর জগ্ধ পৃথিবীতে, শুধু যাবে গোনা
কটা হাড় ছিল কার, কবে, এখানে ওখানে।

কুৎসিত বেয়াড়া যত বেঢপ শরীর
আর স্থূল হিংস্রতায় চৈতন্যে বীভৎস
অজ্ঞান পশুত্বে পাবে শোকহীন নির্বংশ মরণ।

প্রকৃতির পরীক্ষার আদিপর্বে পেয়েছিলে
সঙ্গতির অভাবে অস্থির
অপশক্তি, তাই আজও ভাবো নিজে চিরজীবী টিরানোসোরাই।
কিন্তু বৃথা চাও আজ নৃশংস উৎসবে
হতাহত বঞ্চিত সমাজ, নিজেদের সূচিকাভরণ।

বয়স্ক বিজ্ঞানে আজ বহু পরীক্ষায় স্থির জানি
অন্তে নেই নিয়ম লঙ্ঘন, সুন্দরের কর্মী সুষমায়,
মানি দীর্ঘসূত্র ছিল আমাদের মানবতা এতদিন।
আজ তার ছিঁড়েছে বন্ধন, ছেঁড়ে প্রায়
সীমাহীন ধৈর্যে, জানে তার ক্ষীণ কণ্ঠে তীক্ষ্ণ তূর্যে বাজে
সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর সূর্যের ব্যঞ্জনা, আবিশ্ব ভোরাই
গোটা আফ্রিকায় এশিয়ায় ॥
১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭০

সুখের সহজ মুখ

সুখের সহজ মুখ বৃথা খোঁজা পথে কিংবা ঘরে।
এখন দুর্লভ সেই আত্মপরে স্বয়ম্বশ মুখ,
অন্তত অনেক চোখে অতৃপ্তির অস্থির অসুখ
ঘরে-বাইরের নীল আকাশকে সংকুচিত করে।
অথচ নিশ্চয় মাঝে মাঝে স্মিত ভোরাই প্রহরে
জীবন্ত আলোর সদ্য রক্তিমায় সকলেরই মন,—
হোক ভিন্ন, সত্যে-স্বপ্নে এক করে চৈতন্য-জীবন,
পাহাড়ে জঙ্গলে গ্রামে গ্রামান্তের বিপন্ন শহরে।
সুখের সাধক মুখ অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা
এখানে ওখানে বলে, ভাবেও বা বিভিন্ন বিন্যাসে।
তবু শোনো একই স্বর সাহানায় আহীর ভৈরবে,
দেখ সেজানের শত ভিক্তোয়ার চূড়াধৃত ব্যাসে
আকাশ আধারে মহা মহীরুহ বর্ণালি উৎসবে
জর্জ্যোনের স্তরে স্তরে নিসর্গের মাতৃমুখী আশা ॥
৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭০

অনুপস্থিতিতে ইচ্ছা

অনুপস্থিতিতে ইচ্ছা
হয় থেকে থেকে
দেখি, শুনি চেনা দৃশ্য, জানা শব্দ।

ছড়ানো প্রান্তর, উদার বিস্তারে কোথাও ঊষর,
শ্যামল গোচর ভূমি কোথাও বা রক্তিম ধূসর
কোথাও বা শস্যে শষ্পে চোখের আরাম,
নদীতে, পাহাড়ে, নীলে, সময়ের ফসলে ও ফুলে ফলে,
ঝরা পাতা সদ্যপাতা হরেক হরিতে
মাঠে গাছে নানা পাখি বসে, ওড়ে, দোলে নানা শৈশবের স্বর।

ইচ্ছাটা যে মুক্তি নয় জানি,
কিন্তু শুধু যাকে বলে মাথা গুঁজে পলায়নি বৃত্তি তাও নয়।
কারণ এ দৃশ্যে আছে সামগ্রিক মানব-জীবন,
আছে দুস্থ দৈনিকতা, অভাব, অসুখ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়,

অধিকন্তু এখানে ওখানে হঠাৎ হঠাৎ মৃত্যুকে নৈবেদ্য
এর ওর নিজের জীবন।

তা সত্ত্বেও বা সেজন্যই কি মানব-নিসর্গে
নিয়ম বা ব্যতিক্রম দুইই গ্রাহ্য, নিবার্য ও প্রতিষেধ্য,—
যা এ অপনাগরিক ; অসংলগ্ন মানবসমাজে
কষ্টবোধ্য, সুতরাং যার সমাধান
মনে হতে পারে আজ এইখানে এ মুহূর্তে অনায়ত্ত-প্রায়,
চোখের কানের বিভ্রান্তিতে হৃদয়ের বনে।

তবু, নাকি তাই ? থেকে থেকে ভাবীকালে স্মৃতি যায় ডেকে।
তাই চিরযৌবনের অনুপস্থিতিতে ইচ্ছা হয়
জীবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে দেখি, শুনি,
কাজে— অবসরে স্বচ্ছ দৈনিক ক্লান্তিতে,
স্বপ্নকম্প্র রাত্রির শান্তিতে।
৭ জানুয়ারি, ১৯৭১

সাধারণ্যে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বেশে

বার্ধক্যের ইশারা পাঠায়
এই প্রতি প্রভাতীর মৃত্যুর সংবাদ !
দুর্বোধ্য দুর্জ্ঞেয়।
জীবন-মরণ কেন আপতিক অন্ধ অপঘাত ?
নিজেকে বধির ভাবো, ভাবো তুচ্ছ হেয় ?
লুব্ধ নায়াগ্রা প্রপাত কোন্ অতল সাগরে
সব শব্দই ডোবায় ? শুধু ঘোরে বিদেহ ইশারা ?
শত শত অমাবস্যা দুঃস্বপ্নে জাগব ? ঘুমও তিক্তস্বাদ ?
ছায়ামূর্তি এরা কারা ওরা কারা ?
দৈনিক বিষাদে মেলে কোথা উত্তরণ ?
পথের সঙ্গীকে পাবে কোন্ ধর্মের কুকুর
জানো কি কোথায় ?

সে সুভদ্র সে সৈরিন্ধ্রী নেই আর পাঞ্চজন্যে,
নেই ভারতীয় সাবেক পুরাণ।
কোথায় সে শবরী জানকী ?

সে জীবনমন আজ একে অন্যে অঙ্গাঙ্গি অস্পষ্ট কিন্তু
আসন্নের এক-বিশ্বে উলূপীর দেশে
প্রতীক্ষার রসাতলে, প্রত্যাশায়, প্রস্তুতিতে।
নিত্য প্রত্যাশার প্রতীক্ষায় নিদ্রাহীন

যে যার হৃদয় ধরে দুই হাতে স্পন্দমান
শুধু এক জীবনের সম্ভূতিতে কে সে ? কারা ?
রাত্রিদিন প্রতীক্ষায় প্রত্যাশায় প্রস্তুতিতে
অসমান এক-বিশ্বে সাধারণ্যে সত্তা মেলে ধরে,
কিন্তু আপাদমস্তক ভিন্ন ভিন্ন বেশে ?

কবে যে শৈশব ও বার্ধক্য হবে স্বাভাবিক যৌবনের গান !
মৃত্যু হবে স্বয়ংসিদ্ধ, আজীবন স্বয়ং প্রমাণ !
৮ জানুয়ারি, ১৯৭১

সে আকাশ ঢালি ঘটাকাশে

আকাশ তিক্ততা-জয়ী, বর্ণাঢ্য, সুনীল, মেঘময়
কিংবা সূর্যস্বচ্ছ, স্বপ্রকাশ।

সে আকাশ ঢালি ঘটাকাশে, সেই অনলস মুক্ত অবকাশ,
রৌদ্রে অন্ধকারে স্মিত, নিত্য বিবর্তনে অক্ষয়
স্বীয় নিয়ন্ত্রণে স্থির আবিশ্বআধৃত,
ঘূর্ণ্যমান সৌরচক্রে স্থিত বেগে, মননে তন্ময়।

তাই এ বিবিক্তি শুধুই বিচ্ছেদ নয়
ইতিময়, বীজকম্প্র,
হৃদয় ও মননের তন্ত্রীতে মৃদঙ্গে
স্বপ্নস্পন্দ তালে তালে সংগীতের শতরঙ্গে
কৈলাসিত নৃত্যে বিভঙ্গে আভঙ্গে ভঙ্গে,
তুচ্ছ তিক্ততার পরপারে বর্জনে গ্রহণে উদ্‌গ্রীব, আনম্র।

নৈরাশ্যের তুচ্ছগ্লানি নয় ॥
২৭ জানুআরি, ১৯৭১

এ নিসর্গে তাকাবার

শুধু ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় নয়। আজ একাত্তরে
ভারতীয় বিশ্বে বাঁচি, ফলে তীক্ষ্ণতা প্রখর :
মানসে সর্বাঙ্গে সদা অশ্রু লাগে সকাতরে,
আর তাপে তখনই শুকায়, জ্বালা হানে শতশর।

কি বিদেশে কি স্বদেশে মন-জীবন ভঙ্গুর,
দিবারাত্রি যত্রতত্র মানবিক প্রতিশ্রুতি
ছারখার— আমাদেরই প্রতিশ্রুতি হতাহত, দূর
দেশে, সব দেশে ধূলিসাৎ মনের বিভূতি।

অথচ এ সত্য স্পষ্ট, আজ একাত্তর সালে
প্রতিকৃতিই মানবিক রচনা, চিন্ময়তায়
চূড়ান্ত প্রস্তুতি বিপুল প্রসঙ্গে কি সকালে
কি রাত্রিতে আমাদের মুখে দাম্পত্যে তাকায়।

দীর্ঘ সভ্যতার সৃষ্টি এ নিসর্গে তাকাবার
লগ্ন বৃথা যাবে নাকি ? জীবন কি মরণে কাবার ?
১১ ফেব্রুআরি, ১৯৭১

ভিন্নতায়

ভাগ্যে সখী তুমি ও আমি ভিন্ন
তাই তো প্রেম দিলে অমর স্পর্শ।
ভিন্নতায় পেয়েছি দেখ চিহ্ন
একতা-সাধা স্বাধীন ক্লেশ-হর্ষ।

ভাগ্যে সখী আমরা মানি ভেদ,
মিলের সেতু ক্যান্টিলেভর দ্বৈতে।
তাই ঈর্ষা, হানাহানি বা খেদ
অবান্তর, তর্ক করে সইতে

যেমন পারি আবাল্য বন্ধুকে,
যতই করে তর্ক বিনা-যুক্তিই।

তাই যা হয় বলুক নিন্দুকে,
দুঃসময়ে গড়ি স্বাধীন মুক্তি ॥
১২ ফেব্রুআরি, ১৯৭১

পরিপ্রেক্ষিত নিয়ম

দেখি, শুনি চতুর্দিকে ছোট ছোট শত দ্বৈপায়ন
খর স্রোত ছুটে চলে শত পাথরের বাঁকে বাঁকে,
ঝিকিমিকি স্বচ্ছতোয়া আজানু স্বাধীন শত পাকে
বালিতে সোনায় নানা আভার বিন্যাসে প্রাণপণ

বেগের বৈচিত্রে চলে, যেমন মানুষ ইতিহাসে
শোনা যায় চলেছেই সেই কোন্ আদ্যিকাল থেকে,
কখনও সরল রেখা কখনও বা জটিল বিন্যাসে
মিতাক্ষরা দায়ভাগে ক্রমান্বয়ে নানা সুরে ডেকে।

দেখি শুনি বেগের বৈচিত্রে এই সর্বংসহা চলা
—এ কি ভগীরথ চলে শঙ্খরবে কপিলমেলায় ?
বেগের আবেগে নদী কোথাও বা তম্বঙ্গি চঞ্চলা,
কোথাও বা বরদাই শস্যশষ্প দুহাতে বিলায়।

বেগোচ্ছিত নদী দেখি, ঘাসে বসে স্থবির অক্ষম,
চলে যেন সমুদ্র সঙ্গমে, গড়ে ভাঙে দ্বৈপায়ন !
নাকি খোঁজে পৃথিবীর কন্যাকেই—নিত্য রামায়ণ ?
হৃদ্‌স্পন্দে তারই বেগ স্থাণুকেও করে কি জঙ্গম ?

প্রেক্ষিত নিসর্গে গড়ে জীবনের সৌন্দর্যে নিয়ম ?
১৫ ফেব্রুআরি, ১৯৭১

অনুজের গান— ১৯৪৭-৭১

এসো আত্মীয় দুর্গতদেরও ঘরে
তোমাদের উষা আমাদের সন্ধ্যায় ।

দুঃসহ জ্বালা শৈশব যৌবন,
আমাদের কাল দুর্বহ অনুখন ।
কত দুর্যোগ, কত দুর্ভোগ যায় !
বিরাট কালের বিপুল তেপান্তরে
তোমার প্রাণের হাজার ঝুরির বরে
হাতছানি দেখি তোমারই পিপুল ছায়ে—
প্রাণ পায় মৃত কৈশোর যৌবন ।

মোহিনীর নয়, মানুষেরই নির্মাণ—
মাটির মানুষ, মানুষের সম্মান !
একাগ্র চোখে সদা সতর্ক কাজ,
প্রখর হৃদয়, লেনিনের মন প্রাণ
আকাশবিহারী করে দিল যৌবন ।

তাই সব শুনি সে নক্ষত্র-গান,
গঙ্গায় পাই ভল্গার প্রতিমান !
আমাদের রাত আমাদেরই দিন মানি,
কুহক তো নয়, সহোদর হাতে আনি
তোমাদের হাতে অনুজের যৌবন !

জ্যেষ্ঠ ! তোমরা গড়ে দিলে প্রতিভাস,
তাই আমাদের গঙ্গার চরে চরে
মেঘনার স্রোতে গড়ে তুলি ইতিহাস
উজ্জীবনের দগ্ধ তেপান্তরে ।
দুস্থ জগদ্ধ হোক না বর্তমান,
এক নীলাকাশ দুই দেশে করে গান :
মৈত্রীতে বাঁধো আমাদেরও যৌবন ॥

২০ আগস্ট, ১৯৭১

হিরণ্ময়েন পাত্রেন

আয়না বুঝি অন্যেরই জন্য ?
নিজরূপ নিছক কল্পনা ?
ভবিষ্যত জানি সুখস্বপ্ন,
যা গত তা বিলাসী আলপনা

হিরণ্ময় ! কেন খোলো পাত্র
মুখ দেখে কেন বা বিষণ্ন
সাধ করে হব অহোরাত্র ?
সত্যে যে হৃদয় বিপন্ন ।

থাক, রাখো সূর্যময় ঢাকনা ।
সুখে দুঃখে দেহে মনে অন্ন
পরমুখাপেক্ষী বন্ধ্য স্বপ্ন ।
অন্ধের কিবা নীল পাখনা ?

৯ অগাস্ট, ১৯৭১

সোঽহম অচেনা তাই

ধ্যানে জ্ঞানে কর্মে স্বপ্নে কোনো ক্ষেত্রেই যে
নই ছিন্ন ভিন্ন বা অমানুষিক অদ্বৈতসন্ধানী ।
সোঽহম অচেনা তাই, নিজেকেই নিজে
সম্বন্ধ সংগীতে মাত্র খুঁজে পাই, মানুষই পরমতম প্রাণী ।

এ জীবন বিচ্ছিন্ন বড়ই, মেলে মর্মের দোসর
একমাত্র অন্যের জীবনে লগ্ন কর্মে হৃদয়ে মানসে ।
অতৃপ্তির সমধর্মিতায় যেন সারা বিশ্বে সহোদর
অথবা যমজই বুঝি— কৌতুক না—এক মনপ্রাণ সে ।

গর্বিতের কথা হল ? হতে পারে, অপিচ যন্ত্রণা, সেই তো গৌরব,
সেই তো সন্ত্রস্ত, কেন চতুর্দিকে গোপন রৌরব ?

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

চাঁদেরই সন্ত্রাসে

হায় জ্ঞানী ! তুচ্ছ বুদ্ধিমত্তা
ছিন্ন ভিন্ন কাগজের মতো—
যদি ওড়ে গোটা গোটা সত্তা
অলিতে গলিতে অবিরত !
মন করে শরীরকে ভাগ
আর দেহ ? মনেরই দেহলি।
ফলে যত হয় ঘৃণা, রাগ
দ্বৈতাদ্বৈতে ভোগায় কেবলই।
অথচ চেতনা নভোনীল
সর্বতোভদ্রকে বুকে ধরে।
ব্যক্তি হয় বাহুস্থ নিখিল
বিশ্ব ভরে বাংলার অক্ষরে।

কোথা এর বৈদ্যের বিধান,
মৃত্যুঞ্জয় কোন্ মহা-মর্গে ?
অথচ চিন্ময় শুনি গান
মৃণ্ময়ীর সর্বাশ্লিষ্ট ভর্গে !
থেকে থেকে নিদ্রাহীন খেদে
ছিন্নমস্ত দূর মহাকাশে
ঘুরে মরি লক্ষ ভেদাভেদে,
বক্ষচ্যুত দেহ মনে ভাসে।
যোগ নয়, গুণ নয়, ভাগ
কাটে ছেঁড়ে বিযুক্ত সংরাগ,
দেহমন ছিন্নমস্তা ভাসে
মহাকাশে চাঁদেরই সন্ত্রাসে ॥

১ অক্টোবর, ১৯৭১

দেখে অন্য বিশ্ব

যেই চোখ ঢাকে দেখ নরকের দৃশ্য,
যদি চোখ খোলো দেখ সেই ভয়ানক
বীভৎসেই দাহ হয় যেন সারা বিশ্ব।

এদিকে মাইকে রাম এবং নানক,
ওইদিকে হরেকৃষ্ণ হরেরাম বোলে
মাতেন বয়স্ক আর লালক-পালক
যৌবনের দূত-দূতী, ধর্ম পড়ে ঢলে।

অথচ জীবন আজ বিশ্বব্যাপী জ্বালা,

মৃত্যু বহুরূপী ছলে বলে টানে কোলে।
তারই মধ্যে খানদানি-কান ঝালাপালা
হাইহিয়া করে দেয় বঞ্চক বেতারে,
আর মৃত্যু বৃষ্টি করে, আর হাঁকে, পালা।

লোক ভোগে, ডোবে, জ্বলে এধারে ওধারে।
তবু নিষ্প্রদীপ রাতে মিঞাকী দীপক
বাজে অবচেতনের হাজার সেতারে।
অশ্রুধারা রক্তস্রোত, বিনিদ্র পাবক
জ্বালে বিশ্ব স্বচ্ছ স্বপ্নে, অপরূপ দৃশ্য!
লুপ্তি পায় গানে গানে তামাম্ ঘাতক।

স্বপ্নের সেবক সব দেখে অন্য বিশ্ব ॥
৩১ নভেম্বর, ১৯৭১

তোমাকে দেখে স্পষ্ট হয়

তোমাকে দেখে স্পষ্ট হয় : স্যাঁত ভিক্তোয়ার চূড়া,
তোমার কথা মনে বাজায় উজ্জীবনী কোয়ার্টেট।
অথচ তুমি সর্বক্ষণ উপস্থিতও নয়!

বিচিত্র, না? কিন্তু তাই সত্য উপলব্ধি।
যদিচ মানি জীবনে কি যে ল্যাজা কোন্‌টা মুড়া
প্রত্যহই ঘুলিয়ে যায় কে যে পাঠায় ভেট!
কারণ দীন দিন-যাপন, অনিশ্চিত রুজি,

তাও বুঝি না, কিংবা বলো মানি না এই ক্ষয়।
কারণ দেখি সেই পাহাড় যেই না চোখ বুজি।

কান ঢাকলে 'নিখট ডীসে টৌয়নে' সদা সর্বত্রই শুনি।

শুনব জানি অনেক দিন— আমার কাল অবধি,—
কেমন কাল হবে কে জানে! প্রতিটি দিন শুনি।
১২ নভেম্বর, ১৯৭১

কোন্ চিতাবাঘ

বসে বসে কিংবা প্রায় শুয়ে শুয়ে বেচারা ভেবেই চলে—
না জানি সে কোন্ শ্বেত চিতাবাঘ, বনের বা শহরের,
তার হৃদ্‌কমলে ও মূল্যবান যকৃতে ও চোখের ভাঁটায়,
যা ছিল খুলির গোল সেই শূন্যাবর্তে পরম তৃপ্তিতে
ছলে বলে সব কিছু ভোজ সেরে আজও তৃপ্তিহীন।
তাই তো বেচারা ভাবে রাত্রি দিন মনের কোটরে,
ভাবে দেহেরও খাঁচার মধ্যে।

অথচ কতনা দিন রাত, কত সপ্তাহ বছর
কত যুগ, কত নবীন দশক, বিপন্ন শতক এ বেচারা দেখে শিখে
হিমশিম, তবু টিটে প্রাণ মুক্তিতে মেলাতে চায় রুজি
—কোন্ সে শতক বলো বিপন্ন বা পর্যুদস্ত নয়?
যদিচ কালের বিকাশ বা ইতিহাস অনিবার্য নদী।

বসে বসে ভাবে, কিন্তু তার সমস্ত গতর
সত্যি কি খেয়েছে চিতা? হয়তো বা নেকড়েই,
নাকি হায়েনাই পূতিগন্ধ? শেয়াল? ইঁদুর?
তাই—তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়?
ওহে বৃকোদর, ওহে ধর্মপুত্র, কৃষ্ণসখা ধনঞ্জয় আজ সব বুঝি।
এবং তুমিও, খুদকুঁড়া-ভোজী তুমি হে বিদুর।

শুয়ে শুয়ে কিংবা হেলে বসে বসে বেচারা ভেবেই চলে,
চিন্তার অজেয় ছলে বলে কৌশলে সে বোঝে
ব্যাধি তার আধির অধিক, মুমূর্ষু সে জন্ম থেকে
কর্মে মর্মে, তার মানবিক ধর্মে, তার সত্তার শেকড়েই ॥
১৩ নভেম্বর, ১৯৭১

রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে

হিমগিরি হ্রদেই তো[১] চিরকাল নদীর শৈশব,
পূর্ণরূপ পায় শ্যাম অন্ত্যজের বাংলায় বদ্বীপে গঙ্গায়,
পাণ্ডবে না কৌরবে না, সূর্যবংশে পদের[২] গৌরব।

মানস হ্রদের নীল আমাদের রক্তাক্ত সংজ্ঞায়,
দুর্গতির অন্ত নেই, তবু নীল অনন্ত সাগর,
তবু ভাগীরথী বয় ধীর পায়ে জানুতে জঙ্ঘায়,

অক্লান্তের শঙ্খরবে[৩] দিনরাত্রি সমানে জাগর
কপিলগুহায় যাত্রী সহস্র সহস্র মুখ খুঁজে,
সুন্দরীবনের বাঘ স্তব্ধ, ডোরে কুমীর হাঙর।
আজও চাই সকলেই, কেউ জেনে কেউ বা না বুঝে,
নামাই মানসগঙ্গা রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে,
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে সমতলে মন্দিরে গম্বুজে[৪]।

চাই অম্বুজা দীঘিতে মুক্ত সূর্যালোক মেশে,[৫]
জনপদে জীবনে ও জীবিকায় চাই সে বৈভব
যা শুধু সম্ভব যদি মৃত্যু আসে স্বয়ম্বরে হেসে,

যদি আশিবছরের বৈশাখীর সমে থামে প্রত্যেক শৈশব ॥

১৩ নভেম্বর, ১৯৭১

১ তুঙ্গ হিম হ্রদেই তো
২. যাদের
৩. ক্লান্তিহীন শঙ্খরবে
৪. তোরণে গম্বুজে
৫ "সূর্যালোক মেশে" স্থলে
"রবিরশ্মি যেন মেশে"

দীর্ঘ তার হিসাব-নিকাশ

প্রায় সারা জীবনটা ভেবেছিল বাঁচাই হয়নি,
আজ তার অন্তকালে মনে ভাবে, বেঁচেছে বুঝি-বা,
মাঝে মাঝে পেয়েছে সে স্তব্ধ নিশা আর দিব্য দিবা।

জীবনের মহানদী পাশে পাশে বয় বা বয় নি,
এ চিন্তায় স্রোত কোথা ? দীর্ঘ তার হিসাব-নিকাশ
আজও কি সে ভুল করে ? অন্তিমেও বিভ্রান্তি জাগায়

কারণ জীবন তার ক্রমান্বয়ে গঠন, বিকাশ,
বিশেষ সীমায় এক সার্থকতা, নান্দনিক প্রায় ।
সৃষ্টিময় লাবণ্য কি পায় নি সে বাস্তব জীবনে ?

নিজেকে, দোমনা ছন্দে, প্রশ্ন করে, সে কি মনে মনে
সান্ত্বনা রচনা করে ? যেহেতু দৈনিক বাঁচাটাই
বিড়ম্বনা, বিশৃঙ্খলা, দিন আনা দিন হানা মাত্র ?

শান্তি পাবে স্বপ্নের বাগানে, স্নিগ্ধ রোয়াকে চাটাই
পেতে, পাবে প্রত্যহের মৃত্যুমুখ হিরণ্ময় পাত্র ?
২০ নভেম্বর, ১৯৭১

অসম্পূর্ণ কবিতা—
বাংলায় বাংলায়

১

ক্লান্তি অশেষ, প্রভু তবু পলাতক্ !
তে হি নো দিবসা গতা ! আফ্‌শোশে লাভ ?
চতুর্দিকেই পাতকী এবং পাতক,
কভু সদ্ভাব কভু-বা অসদ্ভাব,
কাল যে সেবক আজকেই সে যে ঘাতক ।

তবু অভ্যাস স্বত চায় প্রভু ! ক্ষমা !
যদিও সে জানে প্রভুই হয়তো খাতক,
অথচ কোথায় প্রজ্ঞার নিজ নিয়ম,
কোথায় দাঁড়ি বা কোথায় বসবে কমা ।
প্রভুপাদ সব আজ বুভুক্ষু যম ?

পিছাব যে পথে মেলাবে কে কার ক্ষমা ?
পথের দুধারে ঘরে পথে নবজাতক !

২

নিতান্তই বাঙালি যে, এই প্রাচীন বিস্তৃত
লোকায়ত বাংলার ভূগোলে মনের ভাষার রক্ত-চলাচল—
অপটু শরীরে বটে— কিন্তু আজও, সদ্য উষায় উত্থিত
চৈতন্যে প্রবল।
অথচ কী দিন কী-বা রাত্রি আজ-স্ফীত
অনির্দিষ্ট অস্থির আবেগে গাঙ্গেয় বন্যায়
নৌকা কিংবা দেহমাত্র এ নদীর বা বদ্বীপের সমুদ্রের—
নিরুদ্দেশ ন্যায় ও অন্যায় কার মাৎস্যন্যায়ে, বোঝা যায়।

অথচ জীবন চায় চোখে চোখে স্বচ্ছ বোধ ;
চায় স্বস্থ প্রেম চায় সুস্থ ঘৃণা চায় মুক্ত ক্রোধ,
চায় রাবীন্দ্রিক সূর্যোদয়ে সত্যের রুদ্রের
দেশজের পূষনের—আমরা যা প্রায় ভুলি—
আবির্ভাব, আকাশে হৃদয়ে যেখানেই জীবন্ত ন্যগ্রোধ,
প্রতীক্ষায়, আস্তিক্যের প্রশ্নে প্রশ্নে স্পন্দমান,
যেমনটি শোনা যায় বাংলায় বাংলায় ছন্দময়।
এদেশে ওদেশে গঙ্গার তিস্তার পদ্মার মেঘনার জলে
কল্লোলে তন্ময় চরে, যার গান বয় কর্ণফুলি
ইছামতী আত্রাই অজয় যেন সব হাওয়ায় হাওয়ায়
জীবনস্মৃতিতে ছিন্নপত্রে পত্রে দীর্ঘ বহুব্যাপ্ত গান ॥

৩

বল কী হে, ডুবে আছ অগাধ সমুদ্রে, বিষাদে অতল ?
কিন্তু বিষাদ সমুদ্র হবে কোন্ ভ্রান্ত উপমায় ?
বল ক্লান্তি-খাত লেক্ তবে ? বেশ কথা। কিন্তু তারও পাড় দেখা যায়,
একদিকে যুক্তরাষ্ট্র অন্যদিকে বর্ষীয়ান যুক্তরাজ্য, অঙ্গে শ্বেতী গলাগলি প্রায়,
অবশ্য কখনও দেখি সতাতোর ভেদাভেদ স্বতই প্রবল।

ক্লান্তিকে ভাসাও তবে দৃশ্যাতীতে অতিকায় অস্থির নীলায় ?
এ কথাটা বোঝা যায়। কিন্তু তারও তলে নামে ডুবুরি বিজ্ঞান,
এপারে ওপারে করে যাতায়াত প্রাত্যহিক জীবন্ত হৃদয়, তাজাতাজা প্রাণ।
তাছাড়া সমুদ্রে এই আত্মলুপ্তি স্থায়ী কোথা, কত জেলে মাল্লা করে গান।
অধিকন্তু ঢেউয়ের কাজই তো হল দোল দিয়ে
আছড়িয়ে ছুঁড়ে তোলা এদিকে ওদিকে এর ওর গায়ে।

বিষাদ অগাধ দেখ, ক্লান্তিহীন অব্যয় আকাশে
নৈর্ব্যক্তিক, নিস্তরঙ্গ, অগাধ চোখের নীল, হৃদয়ে অক্ষয়,
অথচ যে সদাব্রত নিয়মে বিরাট সত্তা, যেন রহস্যের ব্রহ্মমহাশয়
পদার্থ-বিদ্যার রূপে স্বয়ংপ্রমাণ। কী-বা ভয় কী-বা বরাভয়
কিছু নেই অভ্রমৌলি আদি মৌলিক বিষাদে,
কালের মণ্ডূক! ভাবে ক্লান্তিতে সন্ত্রাসে
চঞ্চল সমুদ্রে তার বাসা বাঁধা
ভাবে সে অসূর্যম্পশ্যতা সাধে, নাই হল জয়পরাজয় ॥

৪

তবে বিরাম কোথা এ অন্বেষার? নৈরাশে এই বিশ্রাম।
স্নায়ুসংকটে দৈনিক, ক্রমিক দ্বৈতাদ্বৈতে
প্রাকৃতিক, আধিদৈবিক কী দুর্মরতা পাথরের।
মর্ত্যলোকের নীলিমা-মাটিতে কষ্টির এ কী প্রাণায়াম
যত ক্ষতি পারে, অন্তত মনে, বজ্রকুসুমে সইতে।
সইতে কি পারে? দেখি শুনি ভুগি, মনে হয় তার অবিরাম
জিজ্ঞাসাই এ জীবনী গড়েছে আনন্দজীবী কাতরের।
নদী বয় তার চেতনায়, তার মননশিখরে সমুদ্র,
রত্নাকর কি দিলে অমর্ত্য অপরূপ নবলাবণি?
কমল দিলে কে কামিনী? নাকি সে নীলকণ্ঠ যে রুদ্রই?
যেন-বা হামেরক্লাভিয়েরে, ঝড়ে সংগীতে জাগে অভিরাম
বধির মুক্তি, হাওয়া ভরে দেয় আকাশ মাটি ও সমুদ্র ॥

৫

বিংশশতকে জ্ঞানে কোনো ক্ষেত্রেই যে
নই ছিন্নভিন্ন বা অমানুষিক অদ্বৈতসন্ধানী।
সোঽহম্ অচেনা তাই, নিজেকেই নিজে
সম্বন্ধসংগীতে মাত্র খুঁজে পাই, মানুষই পরমতম প্রাণী।

এ জীবন বিচ্ছিন্ন বড়ই, মেলে মর্মের দোসর
একমাত্র অন্যের জীবনে লগ্ন কর্মে হৃদয়ে মানসে।
অতৃপ্তির সমধর্মিতায় যেন সারা বিশ্ব সহোদর
অথবা যমজই বুঝি— কৌতুক না—এক মনপ্রাণ সে।

গর্বিতের কথা হল ? তৃণাদপি। অপিচ যন্ত্রণা, সেই তো গৌরব
তাই তো সন্ত্রস্ত, আজ রৌরবের চৌদিকে কৌরব ?

৬

নরক প্রকাশ্য হোক, ইনফের্নো তখন
অঘমর্ষী উত্তরণ পুর্গাতোরিও-তে,
যেন হিমপদে চলে কুন্তীর নন্দন,

কুকুর পথের সঙ্গী শতপদক্ষতে
ক্ষান্তিহীন অভিযানে ধর্মের অহমে
পায়ে পায়ে বিড়ম্বিত, তবু কোনোমতে

ক্ষুরধার প্রগতি যে দুর্গম নিয়মে।
মাতা পত্নী ভ্রাতা বৃথা ডাকে, পাপক্ষয়ে
যেতে হয় পথ ভেঙে, রাজকীয় শ্রমে

দুহাতে তুষার ঠেলে নিজ মুণ্ড বয়ে
প্রকাশ্যে নরককুণ্ডে, ভাবে : উত্তরণ
পাবে মানবিক লোকে স্বর্গ আমরণ ॥

৭

কারণ জেনেছি পাই যে আঘাত সেও দুস্থ সভ্যতাবশত।

সহজে কোথায় মুক্তি, মানবজগতে কেন কোনো জগতেই ?
উদ্ভিদে পশুতে শূন্যে ফাঁকিটা কাটাতে পারো বটে,
কিন্তু ধনী বা গরিব ছুটি বেজায় নশ্বর হায় ! এবং বাধ্যত।
শান্তি চাই। তাই কটা জটাজূটে মুক্তি নেই, তাছাড়া সকলে
হত্যা সেরে হিমালয়ে যদি মজে অর্ধনগ্ন মগ্নতার ছলে
তাহলে কি শান্তি জোটে এদেশে ওদেশে ব্যক্তিতে সমাজে
কিংবা আন্তরিক স্বপ্নসাধ পাবে বস্তুসত্তা গাজনে ব্রতেই ?

সহজের স্বস্তি নেই সভ্য হৃদয়ের এই উভয় সংকটে,
সেখানে স্বপ্নও কাচ বস্তুতই, পাশ ফিরলে ভাঙে।
সভ্যতা কঠিন প্রভু, দেখ তার রূপায়িত প্রভাবের ফাঁস,
উভয়দিকেই তার গেরো। বসুধাবিস্তৃত অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণকে দেখে

—যেমন সূর্যাস্তে দেখি গত আর পরদিনের সূর্যোদয় রাঙে,
সেই যেমন কয়েকজনা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি গিয়েছেন দেখে বলে এঁকে—

শান্তির কর্মিষ্ঠ রূপে সংলগ্ন সভ্যতা গড়ে স্বপ্নে অস্থিতে মজ্জায়
অসুস্থের বা দুস্থের জিজীবিষা বেঁচে যায় ; স্বয়ম্‌প্রকাশ
অস্তিত্বের খোদাই অক্ষরে, সভ্যতার বীজকল্প পূর্বলেখে,
চেতনের অবচেতনের ইন্দ্রধনু প্রজ্ঞা গড়ে ।
আর গালবাদ্য বাজে
তখন চৈতন্যে কৈলাসের নৃত্যে ।
আর সভ্যতার কালদূত শক্র কটা পালায় লজ্জায় ॥

৮

তবুও কি অচেনাই সেই চিরচেনা পৃথিবীই ?
আগ্নেয় পাথরে আর আদিম জঙ্গলে
চতুর্দিক যেদিকে তাকাই কণ্টকিত মাটি এইখানে ।
যেন ভাবীকালে অন্য ইতিহাস অন্য ভূগোলের
ভূতাত্ত্বিক অস্থিবিশারদ চন্দ্রলোক-কুজলোক-বাসী
বিজ্ঞানীরা উত্তেজিত দলে দলে ছোটে বসে জ্ঞানানুসন্ধানে—
কারণ সমস্ত কিছু প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু
দঙ্গলে দঙ্গলে দন্তুর উদ্ভিদ হাসি
ছেয়ে ফেলে এই ভিড়ে ভিড়ে মরাঝরা অদ্ভুত জীবন,
হৃদয়ের প্রাকৃত ভ্রান্তিতে
গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি দুঃস্বপ্নের বনে—
উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্ষান্তি চায় মৃতের শান্তিতে ।

না, তা অসম্ভব মানি
জানি অবশ্যই নিশিপাওয়া অরণ্যেরও শেষ আছে ।
অপচেতা হৃদয়ের অপহৃত জীবনেরও ; কিন্তু কবে ও কোথায়
ঠিক বোঝা দায় নয় ? উত্তরপুরুষ[১] তোমরাই বলো ।
খর ঝোপে ঝাড়ে রক্তে পাথরে কাঁকরে শতবিধ স্বরচিত গাছে
থেকে থেকে ভিন্ন ভিন্ন ডাকে[২] উত্তাল পায়ের টলোমলো
ছিন্ন ভিন্ন নানা ছন্দে
দীর্ঘ দিনেরাতে পূতিগন্ধ ইতিহাসে, প্রাত্যহিক ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে

১· উত্তরপুরুষ ।
২· ভিন্ন ভিন্ন হিংস্র ডাকে

অথচ এখানে সর্বদা কি ছিল এই পাতালের মহাবন ?
ছিল এই বন্যতার আসন্ন আবাদ ?

জানি না কী লাভ পায়, কারা সেই মহাজন ?
বন্য চাষি কিংবা গ্রাম্য প্রতিবেশী পায় কিছু ভোজ্য পেয় স্বাদ ?
পায় কিছু স্বস্তি, কিন্তু জিজীবিষা
এই নববন্য বিভীষায়, এই হন্যে মানবের দ্বন্দ্বে ?
হতবুদ্ধি একা একা চলি বহুলোক,
দেখি বাক্-দগ্ধ[৩] মহাবন মনের কান্তারে।
এ কেমন বানপ্রস্থ, শেষ হবে কোন্ বৈতরিণী পারে
কার আদি কোন্ অন্তে, কার দেহমন প্রাণে কোন্ বনে
ক্রন্দসীর অশ্রুবাষ্পে জীবনের বপনে রোপণে ?
(পরে "এক উত্তরমীমাংসা"-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ)

৯

বৃদ্ধ জানে বহু বিপর্যয়
বন্যা খরা মারীর প্রকোপ
দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ অপচয়
শয়তানির মানা লুব্ধ টোপ
জীবনকে যা করে নয়ছয়।

শতভঙ্গ স্বদেশে নিবাস,
তিন হাজার বছরের গ্লানি
মর্মে মর্মে, প্রত্যহ নিশ্বাস
প্রশ্বাসে বাংলায় ভালো জানি।
তবু আস্থা হটায় নৈরাশ

থেকে থেকে, প্রায় প্রত্যহই।
চৈতন্যের ইতিহাস বই,
মাঝে মাঝে অশ্রুতে অথই
জলে পড়ে, জোয়ারে বা পাঁকে,
ফের তুলি বাঁকা কাঁধে বাঁকে

৩. বাক্-দগ্ধ-রুদ্ধ জগৎ

তিনহাজারি বহু বিপর্যয়।
জানি ব্যক্তি-সত্তাই সত্যের
দেহমনে আদিঅন্তে বয়,
নিয়ম যা মানবশর্তের
বৃদ্ধ এই ভূস্বর্গ-মর্ত্যের—

যতই না গুপ্তি আনে ভয় ॥

১০

বেদনা ? তার চেয়ে যে উদ্‌ভ্রান্তি
দিনরাত্রি আহত করে দারুণ।
ব্যথা বা শোক তখনই মানে ক্লান্তি,
রূপান্তরে বিষাদ মানে শান্তি
স্বচ্ছ যদি হয় কার্যকারণ।

হয়তো আজ এ কথা বলা যায়
ব্যথার পথে চাই আদি ও অন্ত,
যে পথে খোলা মননে চলা যায়।
কিন্তু কানা ধাঁধায় চলা দায়
ভ্রান্তিতেই যদি না আসে ক্লান্তি।

বেদনা নয়, এই যে উদ্‌ভ্রান্তি
তাতেই দিনরাত্রি সদা করুণ ॥

১১

আশা ছিল, তবে শংকাও ছিল বটে,
কারণ দৈত্য কোনোক্রমেই সুস্থ
অথবা স্বাস্থ্যচিকিৎস্য-মনা নয়।
আদিম পশু বা মেঘরৌদ্র বা বজ্রের
প্রাকৃত বিপাক দেখেছি হঠাৎ ঘটে,
কিন্তু মানুষ দেহেমনে হলে দুষ্ট
প্রাকৃত পশুরও অধম বিপর্যয়!
কোটি জীবনের সীমাহীন সহ্যের

শেষ পর্যায়ে জীবজগতের অতলে
অকথ্য তার অনাচার ছলে বলে—
ভাষাই পঙ্গু মানবিক মুখ ঢেকে।
বীরের রক্তে মাতার অশ্রুজলে
ভয়ভাবনা যে ছিল সে কথাও মানব,
অভাবিত ছিল বুঝি তার এই মাত্রা।
মানুষ আমরা নারকীকে কিসে জানব ?
তাই জীবনের বিশ্বকে বলি ডেকে :

অতলান্তিক জাহান্নমের যাত্রা ॥

১২

আবিশ্ব চৈতন্য আজ পঙ্গু, মূক— আকাশে সমুদ্র আজ খরা
যদিও সবাই জানে শতভঙ্গ এই বঙ্গ মনেপ্রাণে
মাঠে ঘাটে হাসিগানে শতরঙ্গে ভরা।
অথচ সর্বত্র ঘোরে প্রকাশ্যে প্রচ্ছন্নে ঘোরে নানান তক্ষক,
এই মানুষেরই ত্রিভুবনে আজও ঘোরে জল্লাদ বঞ্চক,
এপাশে ওপাশে ঘোরে লুব্ধ সরীসৃপ অপ্রাকৃত নানা জলুকা কঞ্চুক,
কোথাও বা অকালের টিরানোসোরাসদের সশস্ত্র প্রহরা,
যেন ধরা অবীচি আঁধারে তারই সরা।
কবিতারা অর্ধমৃত, পুন্নামের নগ্নদেহে শতসজ্জা জরা।

অথচ হৃদয় জানে ধ্রুবতারা সত্য ঘটাকাশে,
অর্জুনেরা স্থির জানে উলূপীর অমৃত পাতালে।
জানে কর্মরচনাই মানবিক, চিত্র খোদাই সংগীত কাব্য ভালোবাসা
জীবনের ইতিনৃত্য মননে ভঙ্গিতে তালে তালে।
বহু হাজার বছর ব্যেপে পশুকে মানুষ গড়ে মানুষেব আশা
বিশ্বকে গড়েছে নিজ বরাভয় মহাপ্রতিভাসে।

তবু তো লোরকার অন্ত অপঘাতে, ঘরে চড়াও হত্যায়
যদিও সে দক্ষ শিল্পী অসামান্য সংবেদনে
চেয়ে ছিল ভাবীকথকের দুঃখে— নাকি মৃত্যুঞ্জয় উল্লাসেই ?
যে অমৃত আজও কাঁপে প্রতিটি নিহত মুখে কবিতা নাটকে
সারাক্ষণ :

কামারাদা ! মৃত্যু হোক স্বাভাবিক, শয্যায়, সহজে
সাচ্ছল্যে স্বচ্ছ ও সমসমাজের কঠিন-কোমল
শিরস্ত্রাণ শিরোধানে। যেখানে নির্বিত্ত মাথা গোঁজে
অপ্রস্তুত অপমানে, আকস্মিক অন্ধকূপে ছুরিকার ছল
যেখানে বণিক বোনে রাজস্বলোভীর দলে মিশে
বাঘের বিকৃত বেগে, হাঙরের গুপ্তি দাঁতে, হানে
কেউটের কৌটিল্যে, সেখানে যে মনুষ্যত্ব নিজ বিষে
নীল হয় নিমেষে নিমেষে। নয় সেই অপঘাতে। —
কারখানায়, গার্ডার-চূড়ায়, ক্রেনে, মাস্তুলে, ফানেলে,
হাপরে, লাঙলে মৃত্যু আকস্মিকে, জীবনের দাক্ষিণ্যের হাতে
সার্থক সে মৃত্যু, তুঙ্গ নদীপুলে, রেলের টানেলে,
স্রষ্টা মৃত্যু তুচ্ছ নয়। তুচ্ছ নয় সম্পূর্ণ সমাজে
সত্তার সরল মৃত্যু যে যার আপন সুস্থ কাজে ॥

কিন্তু যদি সকলেই লোরকা না হই, বা সাকো ও ভানৎসেত্তি ?
হাজার হাজার নিগ্রো ? বা লক্ষ লক্ষ প্রাচ্য মানুষ ? এদেশে ওদেশে
গঙ্গায় পদ্মায় ভেসে ? কোটি কোটি চাষি ও মজুর ?

যদি শুধু আউসবিট্‌জ বুখেনবাল্‌ড্‌ নানাবিধ নগ্নবেশে
দেশে দেশে হন্যে দেয়, গরিব বা বহুবিত্ত বিশ্বময় ? নিকটসুদূর
পাশ্চাত্যে, দুর্গত প্রাচ্যে, বিশেষত হতভাগ্য একালের প্রাচ্যে
বারুদের দাহ্যে কিংবা শ্রাবণবন্যায় মড়কে আকালে ?

তাই বলে জিতে যাবে ওরাই কি সংবিতে সংক্রাম কিংবা
গোটা মানুষকে পৃথিবীকে পক্ষাঘাত হেনে ?
আর এরা মেনে নেবে পাঁচহাজার বছরের সভ্যতাসংগ্রামী
মানবিক মর্ত্যলভ্য সভ্যতার অপহন্তা গ্লানি ?
না না, জানি এরা জেনে শুনে বিশ্বে আজ গড়ে
জীবনের শিকড়ে আকাশে আমরণ পণে
বীরচেতা লক্ষ লক্ষ তরুণের সূচিকাভরণে দেহে মনে ॥

১৩

রক্তে তার আগুন-গলা মুক্তি
শক্তি তাকে পেতেই হবে হাতে,
লক্ষ মুখে লক্ষ হাতে জয়ী।

শান্তি আজ মরিয়া সংঘাতে
নীল হৃদয়ে সদা শক্তিময়ী ।

তাই কি চোখে ভর করেছে পাথর ?
দিন কি শুধু নেতির দাহে কাতর ?
হৃৎস্পন্দে হাঁপায় রাতে মাটি ?
আকাশ-জাগা স্বপ্ন শুধু খাঁটি ?
রক্তে তার আগুন-ঢালা শক্তি ?

যেখানে যাক শহর থেকে মাঠে
বিরাম নেই শূন্যে জেগে থাকার,
জীর্ণ মাটি মূর্তি গড়ে হাটে ।
দগ্ধ মাটি বানের জলে প্রাকার,
গড়েছে পাকা চৈতন্যে ভিত কি ?

তার কি পুড়ে খাক্ চোখের পাথার ?
গ্রামে শহরে নিজেই গড়ে মুক্তি ।
দুচোখে তার গড়ে তুলেছে পাথার
তার সবল হাতে কঠিন মুক্তি ।
চলে হাতের কাতার আর কাতার ॥

১৪

নীলে নীলে ক্লান্তি ডুবে যায় আর চৈতন্যে শরীর ।
পাড়ে পাড়ে ফস্ফর্ ছড়ায় নীলিমায় নিঃস্পন্দ বিহ্বল,
যে সহজ জাগৃতির ঘোরে শিশুর সংবিত শান্ত
ঘুমঘোরে জেগে থাকে নির্নিমেষ নন্দনে সংহৃত দান্ত
মায়ের আয়ুর বোধে । যেমনটি থাকে প্রতীক্ষায় স্থির
কৃষ্ণপক্ষ রাত্রিশেষে অস্পষ্ট আভায় । আর মৃদুমন্দ
আন্দোলন শুরু করে সমুদ্রের নিশ্চিতির অগাধ নীলিমা ।

চেতনের অবচেতনের এই যুগসন্ধিক্ষণে শরীরে চৈতন্য মেশে,
নিঃসঙ্গের ব্যথা ডুবে যায় নীলে নীল । এবং যদিও রুদ্ধ ছন্দ
তবু দোল দেয় সমুদ্রকে, তীরে তীরে, যোজনযোজন-ব্যাপী দেশে
এবং আমায়ও । আর ডুবে যায় বিনয়ের ব্যক্তিগত সীমা ॥

১৫

ইন্দ্রধনু ভাঙল কে ? সে ইন্দ্রনীলমণি
নীলআকাশে মিলিয়ে দিলে নয়নারাম আভা।
স্নিগ্ধ হল অগ্নিগিরি, এমন সে প্রতিভা
আকাশ মাটি যেই না হাতে বাঁধল শালবনি,
প্রাণসূর্য অশ্রু মুছে বিলিয়ে দিলে বিভা।
গণ্ডোয়ানা শত টিলায় জমাট হিম লাভা,
শান্ত আর শিষ্ট এক কিশোরকিশোরীর
দল মেতেছে নীলমণি-কে পরবে শত হাতে।
মস্তিপাওয়া হত্যা শেষ, ভারতীয় এ শরীর-
মনটা দেখি স্বস্থ হল স্মিত শরৎ-প্রাতে,
নতুন এক কর্মঠতা, ন্যায়নিয়মে ধনী,
আত্মঘাতী মানসে নবসংযুক্ত আভা ॥

১৬

কী বলব আর ? বাঁচাই যে গান বলা,
বাঁচাই কবিতা, প্রতিদিন তুমি শোনো।
মানসে মানসে অনন্ত পথে চলা
বৃথা কত দিন ক'বছর তুমি গোনো।

সে পথের শেষ জীবনের নীল তীরে
তোমার চলারই শেষে,
তোমার আমার একই পথ ঘুরে ফিরে
পাহাড়ে সাগরে একাকার এক দেশে ॥

মল্লার-ভেজা সবিতা

কবিতা এখন ফেরার, বিশ্বে কোথায় ?
এদিকে ওদিকে ভাঙাচোরা গ্রামশহরে।
তবু জাগ্রত দিনরাত ঘরে বাইরে
মাঠে জঙ্গলে মেঘনায় গাঙে সোঁতায়।

কবিতা কি শুধু ছাপার হরফে মেলে ?
কবিতার আদি রূপ কবিতার বাইরে—

বাঁচাই কবিতা, রুদ্র সে অবহেলে
মৃত্যুকে মারে জঙ্গলে গ্রামশহরে।

এই কবিতাই আসবে হয়তো হরফে
লেখায় ছাপায়, জীবনের মহাকবিতা।
সেই দিনে পাব মিশ্র আগুনে বরফে
নতুন দিনের মল্লার-ভেজা সবিতা ॥
২২ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাই আমাদের

আমরা বাংলার লোক,
বাংলাই আমাদের, এদের ওদের সবার জীবন।
আমাদের রক্তে ছন্দ, এই নদী ঘাট মাঠ
এই আমজাম বন ;
এই স্বচ্ছ রৌদ্রজলে অন্তরঙ্গ ঘরোয়া ভাষার
হাস্যস্নাত অশ্রুদীপ্ত পেশল বিস্তার।
চোখে কানে ঘ্রাণে প্রাণে দেহেমনে তাদের স্নায়ুতে
গঙ্গার পদ্মার হাসি একাকার, সমগ্র সত্তার
অজেয় আয়ুতে নিত্য মৃত্যুত্তীর্ণ দুঃখে হর্ষে
ছন্দে বর্ণে বেঁধে দেবে কোমল কঠিন স্পর্শে

যতই বর্বর হও, শক্তিলোভে কূট বুদ্ধি
আজ শতাধিক রাবীন্দ্রিক পুণ্যবর্ষে
তুমি পাবে কোথায় নিস্তার ?
২২ নভেম্বর, ১৯৭১

দীর্ঘায়ু-অন্তেই শ্রেষ্ঠ

দীর্ঘায়ু-অন্তেই শ্রেষ্ঠ ? সন্দেহ কি তাতে !
নিশ্চিত বটে এ তত্ত্ব। প্রশ্ন ওঠে তথ্যে।
দীর্ঘায়ুত্ব শুধু পাঁজি-গোনাই তুমি মানো ?
স্বল্প আয়ে আধিব্যাধি, ওষুধে ও পথ্যে

মন মানে না, নাকি আয়ুই ? আয়ত্ত দুই হাতে
কুলোয় না যে, মানুষ মাত্র, নই তো দেব-দানো।

তবে উপায় ? কড়ে আঙুলে বছর বছর গোনা ?
অসম্ভব। এখনও আছে আকাশ, মাটি, মাঠ,
পাহাড়, নদী, সমুদ্রও, ভোরের রাঙা সোনা,
নীল রাতের মেঘ বা চাঁদ কিংবা তারার হাট,
বৃষ্টি ঝরে আহা তরল শীতল-পাটি ঘরে।
দীর্ঘ প্রেমে পল্লবিত অমর মর্মরে।

কর্ম কীর্তি অফুরন্ত, নিত্য ধ্যানে বোনা।

জানলা খোলা চার দিকেই, দরাজ আজ কপাট ॥
২৩ এপ্রিল, ১৯৭২

সে কঠিন জয়

জীবনে জীবন দেবে ভাবো,—দেবে কাকে ?
এবং জীবন যদি দাও, তা সে কেমন জীবন ?
এ কি অহমিকা ? নাকি অসহায় সাধ ?

রৌদ্র বৃষ্টি বাতাসেরা করে যে বীজন
এক একাকার ডাকে তোমাকে আমাকে,
সে কি মুক্ত জীবনের পাহাড়ে অবাধ ?

জীবনে মরণ হানা মনে হয় সোজা—
দৈনন্দিন রচনার চেয়ে এই ব্যাপ্ত অন্ধ হত্যা,
ওরা তাই সাধে দেখ প্রাচ্য বিস্ময়।

শিল্পকে সংবেদন-কে ওরা ভাবে বোঝা,
জানে না মানসে কোথা কোন্ শক্তিমত্তা—
জীবনে জীবন দেওয়া সে কঠিন জয়।

সে কঠিন জয় শুধু গরিবেরই সয় ॥
১০ মে, ১৯৭২

মানুষ-খেকোর চেয়ে ভয়ানক

বনে জঙ্গলে গিয়েছি বটে, কিন্তু মানি, নিরাপত্তা রেখে,
শুধু দেখে, শুনে, শ্বাস টেনে, শুঁকে
ফিরেছি নিজের ঘরে, মানুষ-খেকোর তাগ্ গায়ে মনে নেই।
কোনোকালে শেরজঙ্ বা করবেট সাহেব নই,
যদিও পড়েছি মানুষ-খেকোরা নাকি স্বাভাবিক বাঘ নয়,
তারা নাকি অসুস্থ, জখম, জীবনের পায়ে পায়ে—
যত পিগসন্ টিরানোসোরার মতো মানুষ বা মানুষ-খেকোই,
অবলুপ্তি যার সমাসন্ন জীবনের বনে উপবনে জখম, অক্ষম।
এই নাকি জঙ্গলের আর মানুষেরও অমোঘ নিয়ম।

আমরা গ্রাম্যই বা শহুরে লোক অর্থাৎ মানুষ
আমরা, ডোরাকাটা ডোরা ধোয়া ফ্যাকাশে বা শাদা
খোঁড়া বা আরেক কারণে— হয়তো চৈতন্যেই আবাল্য জখম
মানুষ-খেকোর, একা কিংবা হাজার হাজার
আক্রমে আনত নই, যতই বাজারে রাজা উজিরেরা মাৎ করে,
যদিও বস্তুত পৈতৃক প্রাণের টানে আমরাও দপ্তরে ঘরে
শহরে বা গ্রামে পিছু নিই, হাত ধরি জীবনের,
নিজেরই জীবন এবং অন্যদেরও হাত,— ঐকতানে
আমরাও জঙ্গলে বনে জনপদে নিয়মের নীতি চাই—
বাল্য থেকে বার্ধক্যে কেউই যেন জখম থাকে না,
যাতে মানুষ-খেকোরা সব ধনে-প্রাণে লুপ্ত হয়
সারা দুনিয়ায় বনে জনপদে সমুদ্রে পাহাড়ে,
মেকঙের পাড়ে,—
করবেট সাহেবের মানুষ-খেকোরা সাজে আজ যেখানে মানুষ,
জাতব্যাঘ্র মানুষ-খেকোর চেয়ে ভয়ানক দুস্থ মনে-প্রাণে ॥
১২ মে, ১৯৭২

মৃত্যু চতুষ্পদক্ষেপে

আমাদের মৃত্যুতে কীই-বা আস্থা ? কেনই বা ?
মানুষের মনে বনে হিংস্রের শহরে কোথায় মানুষ,
কোনো জন্তু, পশুরাজ, বঙ্গ ব্যাঘ্র বা ঐরাবত
শেষ বানপ্রস্থে যম কিংবা পূষনের অমোঘ আহ্বান

যেমনটি নিয়মনিষ্ঠ যাত্রা করে একা একা, ক্লান্ত, তবু
একলব্য পদক্ষেপে, অন্তিম, যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে—
যেন তীর্থযাত্রা করে অনন্তসন্ধানে সাধু প্রাজ্ঞজন।
পা শিথিল, শ্লথমন্তা এলোমেলো চতুষ্পদক্ষেপে—
যে শৈথিল্য ন্যায্য, জৈব, স্বাভাবিক, নির্লোভ-শোভন।

আমাদের মৃত্যুতে কোথায় সেই প্রাকৃতিস্থ প্রাণীর সংগতি ?
সিমফনির শেষ তন্ত্রে উচ্চকিত যেন শেষ শব্দের আরতি,
যেন শরীর বা চৈতন্যের সব যন্ত্র একাকার এক একা অমোঘ শান্তিতে।
দেহযন্ত্র আমাদের শরীর সারেঙ্গি নয়, বেহালা বা পাখোয়াজ নয়,
আমাদের ক্ষান্তিতে কোথায় শান্তি, সেই পরিপূর্ণের আবৃত্ত
আস্তিক্যের উষাউষসীর মাথা কোথা ?

যেমন দক্ষিণ মেরু অভিযানে ছিল সেই ইংরেজ-জনের,
যে স্বতই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল বরফে বরফে অন্তের যাত্রায়
যাতে অন্যদের অভিযান গন্তব্যে পৌঁছতে পারে অভীষ্ট কুমেরু কেন্দ্রে।

আমাদের মৃত্যুতে জীবনে কোথায় বা আস্থা, উল্লসিত
সংগীত না হয় নেই, আত্মসম্ভ্রমই বা কোথা ? মানমর্যাদা
মোটামুটি, সত্যই কি আমাদের গোটা জীবনটাই তুচ্ছ ?
অনর্থক, অপ্রাকৃত, সবই বাজে, খেলো, সবটাই— জীবনের তথা মরণের ?
৭ জুন, ১৯৭২

হে উষা উষসী তবে তাই হোক

নিসর্গের গান শুনে নিসর্গের সঙ্গ খুঁজে এসে
শুনি গ্রাম নাকি আর সেই গ্রাম নেই কোনো আদর্শেই,
গরিবেরা সে গরিব নেই।
যেন বা শহর সেই ভূতভবিষ্যৎ আদর্শ শহর !
এবং মানুষ ? আমরা ও আমাদের জাতীয় বানর ছাড়া
কোথায় মানুষ ? সবাই বিকৃত স্বার্থান্ধ কুটিল— অবশ্য আমরা ছাড়া,
তুমি আমি সে আর ও ছাড়া—
হ্যাঁ তুমিও, ওইটুকু ভদ্রতাটা রাখি—
এ পাড়া ও পাড়া এ গ্রাম ও গ্রাম সর্বত্রই—

হ্যাঁ তা মফস্বলে গঞ্জেও বটে,
তবে কিনা আমরা ও আমাদের জ্ঞাতিবন্ধু ছাড়া।

গ্রামে আসি ছুটিছাটা পেলে, দিনগত কর্তব্যের দায় থেকে
ছাড়া পেলে, নিতান্ত স্বাস্থ্যের লোভে শ্লেষা বা অজীর্ণে ভুগে ভুগে
কিংবা পিতা পিতামহ কেউ সস্তা স্বর্ণযুগে ঘরবাড়ি
করেছেন তা কি শুধু স্বার্থে ? সস্তা দাঁও হেঁকে ?
না না, লোকেদের দুর্গতি মোচনে মুরুব্বির গোঁফদাড়ি
গাম্ভীর্যে ভরিয়ে বা প্রত্যহই ক্ষৌরি করে,
তাদেরই চরিয়ে ঘুঘু ছেড়ে তাদেরই সরিয়ে।
আর আজ ? মানুষ অত্যন্ত মন্দ বিশেষত গরিবেরা
যারা নাকি বোনে, ভানে, মুষ্টি খায়, ঠকে চেয়েচিন্তে, এধারে ওধারে
দেনার পাহাড়ে চড়ে প্রকৃতির দাস মানুষের ক্রীতদাস যত !
তা হতেও পারে, হয়তো বা দুদশটা ভালো মেলে
এদেশে ও বিদেশে নিশ্চয়—
আর বিশ্ব আজ নাকি মূলে এক, বেচায়-কেনায়
সর্বত্র সমানধর্মী।
কিন্তু আমরা কী ? আমরা দাঁড়াই কোথা ?
কোম্পানির দিন থেকে ভদ্রলোক—
আজকাল বাবু শব্দটা খারাপ লাগে !
মহারানি পরলোকে বহুকাল, আর আমরাও যেন কেন্নো জোঁক।
অথচ আমরা কী ? রামমোহন তো আমরাই
মহর্ষি বঙ্কিম, সকলেই বাবু বা সাহেব নই ?
এখনই না হয় আত্মার জরায় ঝামরাই।
মহত্ত্ব গায়েব করে এরা ছোটলোক
আমাদের অর্থ স্বস্তি শান্তি স্বত্ব অধিকার
সব ক্রোক্ করে খায়— রাগ নয় হিংসা নয়, পাঁচকথা বলি যে তা
ধরা যাক্ দুঃখ কষ্ট শোক।

তুমি তো পাহাড় নও, কীবা আত্মীয়তা ?
চোখের বিলাস মাত্র যদি বলি ? তবে
কিসের গৌরবে
এই অভ্যাসের সমর্থনে স্বকীয়তা
বিসর্জন দেবে বলো মানব স্বধর্মে ?
পাহাড়ে পাহাড়ে পাও, দেখ নীলে নীল
কিংবা ডোবে লাল কিংবা সূর্যাস্তে রক্তিম ?

সীমায় অসীম
নীলিমা বিস্তারে পাও সংলগ্ন নিখিল ?
গুরুর আলোয় কর্ম গুরু, শেষও কর্মে ?
তাহলে নন্দন বলো দুইই প্রাকৃতিকে
রাবীন্দ্রিকে বাঁধা কিংবা মানুষে প্রকৃতি ?
তাই স্বাভাবিক বটে, সৌন্দর্যে সম্প্রীতি
সম্ভাব্য মিলনে বাঁধো আবিশ্ব স্মৃতিকে,
মেলাও স্বধর্মে।
তাই পাহাড়ে আকাশে স্রোতে যাও মনে, যাও কর্মে।

মিলটনের ভ্রষ্টস্বর্গ চিত্রে তাই কর্মময় সংগতির রাগ,
রাজনীতি কাব্যময়-প্রাজ্ঞ এক ক্রোধ—

ভাগবত এই পৃথিবীর অপব্যবহার সর্বতোভদ্রের
বসুন্ধরা মাতাকে শোষণ !
আত্মহন্তার নির্বোধ পরধর্মে ভয়াবহ।
কেবলই বিয়োগ ভাগ কেবলই লুণ্ঠন দেশে দেশে—
হে মাতা পৃথিবী অবেশেষে আজ
কমবেশি এদেশে ওদেশে তোমার নির্বিঘ্ন ধৈর্য
চিরধীর সর্বংসহা স্নেহের গুণ্ঠন দেখ হল ছিন্নভিন্ন
অসংগতি জীর্ণশীর্ণ নির্বুদ্ধির লুব্ধের আঘাতে হরণে
অন্ধ অপব্যবহারে।
আজ বারে বারে ইশারা ঈশানে উঁকি দেয়,
তাই কি জ্ঞানের শ্রমে এবং বিভ্রমে বাধে,
একমাত্র পথ থাকে শূন্যে চরা গ্রহে গ্রহান্তরে,—
তাও তো জ্ঞানের সন্ধানে ভারসাম্য ভোলে
আর গুপ্তচর লোভের ধাক্কায় এই বাঁচে এই মরে।
তাই কি মিলটন সেই কবে স্বপ্নে স্বর্গ-উজ্জীবন সঙ্গে
দ্বিতীয়বারের অন্ধ চেষ্টা করে যান !
গোঁয়ার মিলটন ! আর তাঁর অসহায় ঈভা ও আদম !
পৃথিবী কি জগদ্ধদোহা তাই কাঁদে, সে কি হবে দগ্ধ
ভয়াবহ পরিপাটি ফলিত বিজ্ঞানে শূন্য মাত্র
আর মানুষের সন্ততিও ঘৃণ্য মাত্র,
ছাইমাটি হয়ে যাবে গ্রহের আগুনে শোধে জ্বলে, জলে ভেসে ?
আর প্রকৃতিই হয়ে যাবে অপ্রাকৃত বিভীষিকা যন্ত্রণায় শোকে

আর নিসর্গ পালাবে কল্পনার সপ্তম নরকে ? সর্বস্বই ক্রোক্ ?
তবে তাই হোক ? হে উষা উষসী, তাই হোক ?

মন তখনও অস্তমিত, শরীরে শুচি উষা
জাগিয়ে তোলে মননকে, ও চোখকে আর কানকে,
স্তব্ধ জাগা রাতের গায়ে আলোয় রাঙা ভূষা,
হাজার হাতে সাজায় নীল এ প্রান্তে ও প্রান্তে
মনকে যেন গোছায় স্মিত স্বয়ম্ভর শান্তি ।
একাত্মের নীল জগতে পর অথবা সুদূর
সান্নিধ্যে আপন মুখে হাসে চোখের কাছে ।
এখন ক্রূর সমস্যাও ক্লান্তিকর নয়,
কেন না নিজে ছড়িয়ে গিয়ে সহস্রেই বাঁচে,
মিলিয়ে দেয় বিতৃষ্ণা আর ক্লান্তি আর ভয় ।
তখন বাজে স্নায়ুতে নীল আলোকজয়ী সুর,
জাগায় সারা শরীরমনে বরাভয়ের ক্রান্তি ॥
২১ নভেম্বর, ১৯৭২

বৃন্দাবনীসারঙ্গে কি বাস্তব বিকার

দিন শুরু ভোর থেকে বৃন্দাবনীসারঙ্গ ধ্বনিতে ।

চতুর্দিকে কাছে দূরে মাঠে গাছতলাতে সঙ্গতে
যোজন-যোজন গ্রাম্য নিভৃতির তপস্যা-ভঙ্গতে
মনে হয় এই দেশে নাগরিক সংস্কৃতি-সংগীতে
আরণ্যক প্রতিবেশী গ্রাম্য কেউ নেই আশেপাশে ।

আকণ্ঠ ঘন্টায় বাজে মৃত্তিকার দূর্বাদলে ঘাসে
সমস্যাবর্জিত এক জীবনের প্রায় আদিবাসী
পরাজয়—রিক্ততায় দারিদ্র্যেই—অথচ প্রত্যাশী
নিশ্চয়ই এ ভূলুণ্ঠিত স্বজাতি-স্বজন দিনগত
সাচ্ছল্য স্বস্তির জীবনের স্বপ্ন দেখে, সম্ভবত
সঞ্চয়েরও দায়ভাগও রেখে গেছে উত্তরাধিকার ।

তবু এই বৃন্দাবনীসারঙ্গে কি বাস্তব বিকার

ঢেকে দেয় মানুষকেই অন্ধতায় অহিফেনাহত

আবিশ্ব সংগীতে কেন প্রকৃতি বা জীবনই শিকার ?
২৯ জুন, ১৯৭২

যাকে বলি ধুলো মাটি

যাকে বলি ধুলো মাটি, নদী, নালা খাল বিল,
সমুদ্র, সাতসমুদ্রই, মাথার আকাশ আর মহাকাশ সেই
—সারা বিশ্বকেই দেখি অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্যে,
বলি : ও তো জানি ঘাস, গাছ, পাখি, জন্তু, মাছ
দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ পোকা ও মাকড় ।

ভাগ্যে ওরা প্রতিহিংসা-পরায়ণ নয়—নাকি
প্রতিহিংস্র তারা, অজ্ঞানে বা জ্ঞানে ?
অন্তত আমরা তো সবাই ঐ সব-কেই তুচ্ছ,
অতি অসহায় ভাবি, কারণ তারা তো কেউ
বোমা ফেলে কামান বাগিয়ে তেড়ে
প্রমাণ হানে না, তারা যদি বলে তারা সকলেই
মর্তের রহস্যে ওতপ্রোত, প্রাণে-প্রাণে একাকার প্রায় ?

যদি তারা অকস্মাৎ দল বেঁধে মিছিলে মিছিলে
চরম দুঃস্বপ্ন হেনে জানায় দুরন্ত দাবি,
বিকট দুঃস্বপ্ন হানে, মৃত্যু একে-ওকে-তাকে
গোটা মানববিশ্বকে ?
বিপুল বীভৎস সে কী দীর্ঘ মৃত্যু মানববিশ্বের !
দিনে মন নিঃঝুম, ভূতুড়ে,
রাত্রে নিশিপাওয়া ঘুম ভেঙে যায়, জোড়া দিই শূন্য অবসাদে ।
দান্তের ইনফেরনো তথা বেদব্যাসী নরক প্রবাসে
ধর্মধ্বজ এমন দুঃস্বপ্ন নেই, যেন ফ্রানৎস্ কাফ্‌কার কল্পিত ।
শিশুপাঠ্য গালিভরা আপনি কী কন্ ?
দুর্গত বিশ্বের দুস্থ কম-বেশি, বেশি আর কম
বিচ্ছিন্ন মানুষ তাই কোন্ শহরে বা গ্রামে বলো
চলো-যাই-চলো-যাই বলি কোন্ গানে কার ধ্যানে ?
সংবেদনে সমবেত কর্মে যে নন্দন-রচনা ফোটাব

সে সুযোগ আমরা যে খুঁজি বহুকাল ধরে,—
ঠিক কথা, মনে হয় যেন চিরকাল ধরে চিরজীবী স্বপ্নে স্বপ্নে।
যে সুযোগ প্রায় সব হাতের মুঠোয় চৈতন্যের পাপড়িতে পাপড়িতে,
তা বুঝি শুধু অস্বাভাবিক অসহায় মৃত্যুর আড়তে জমা ?
তা নইলে কেন শুধু হত্যাকাণ্ডে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
দেশে দেশে কৃমি-কীট ঘোরে ওড়ে স্বর্ণময় মলভাণ্ড থেকে ?

অথচ আবিশ্ব চোখে প্রাণ দেখি, শান্ত প্রাণ, স্থির মন,
কিন্তু ক্ষমা নেই, বুঝি কোনো আর ক্ষমা নেই।
চতুর্দিকে স্তব্ধ বৃক্ষে অণীয়ান মহীয়ান স্তব্ধ গানে
রাখি মনপ্রাণ ফুলন্ত ফলন্ত পত্রময় বৃক্ষে বৃক্ষে।
সুতরাং হে মৈত্রেয়, আত্মসহোদর,
এসো, আমরাই স্তব্ধতা ছড়াই
আকাশে বাতাসে মাঠে সৃষ্টিময় জলে স্থলে
প্রতি লাল সন্ধ্যা প্রতি রক্তিম সকালে,
এবং শহরে গঞ্জে দুনিয়ার হাটে হাটে
বামে বা দক্ষিণে কোনো বাঁকা দাঁড়িপাল্লা কোনো দিকেই না হেলে ॥
১৪ জুলাই, ১৯৭২

অথচ

জরাই জীয়ায় চিত্তে বসন্ত বাহার,
অথচ শরীরে জরা, নিত্য নানা ব্যাধি।
অথচ বাসিন্দা মন শরীর সাগরে,
অমাবস্যা জোয়ারে বা পূর্ণ কোজাগরে।

হৃদয় পাঞ্চালী আর শরীর আহার—
নাকি শরীরেই সত্য, চৈতন্যেই আধি ?

অথচ মায়ার অন্ত নেই দিনেরাতে
ভয়রোঁর আলোয় কিংবা সাহানা সন্ধ্যাতে।

এ দ্বন্দ্বে কি ক্ষান্তি নেই ? ভাগ্যে নেই আজো
রাবীন্দ্রিক গানে বাজো, রে বাঁশরি বাজো—

তাই শুনি বর্ষে বর্ষে নিত্য কোজাগরে
কিংবা মাঘীপূর্ণিমায় চৈতন্য-সাগরে ॥
৩ অগস্ট, ১৯৭২

মনের দুপাশে

জানিই তো, আমাদের মনের দুপাশে
সর্বদাই কীর্তিনাশা বয়।
কখনও বান্ধব জল, অক্লান্ত বাতাসে
সুখশান্তি ভালোবাসা রয়।

ঘর বাঁধি, আশা গাঁথি জীবনের বরে
বাংলায়, স্বদেশে, কোথা ভয়!
অথচ জানাই আছে প্রকৃতির চরে
আকস্মিকে আসে বিপর্যয়।

কেন, কার কার্যকারণের নীলাকাশে
মেঘ মাতে মৃত্যুর ডম্বরে!
পাড় ভাঙে, পলি জমে এ পাশের চরে,
ডিঙি নৌকা বেয়ে লোকে ভাসে ॥
৬ অগস্ট, ১৯৭২

সিক্ত চোখেই স্বচ্ছ আলোক

মুশকিল! তুমি বাস কর হিমশিখরে,
ভাব সমতলে নেই কোনো ভেদাভেদ?
দেখ প্রাকৃতিক দৃশ্যে সবাই সহজে
বিভিন্ন তবু সমান, সকলে সজ্ঞান,
স্বাভাবিক, তাই তার বেশি নেই খেদ।
মানুষ সেখানে স্বভাবে পূর্ণ, তার ধ্যান
তাই সে চতুঃষষ্টি শিল্পে খোঁজে,
পূর্ণ ব্যক্তি, রুচির প্রগতি নান্দনিক,
তাই পায়ে ঝরে শুচি মননের স্বেদ।

মানবজন্ম আরম্ভ গুহা-শিখরে,
মানুষের তাই শৈশব শুচি মুক্তি।
তবুও যখন চূড়া দৈনিক গহ্বরে
ভেঙে ধূলিসাৎ, তখন আরেক চুক্তি !
তাই তো আমরা বলব,— ভ্রান্ত হে বণিক
সমতলে আর মানব না ভেদাভেদ,
শিখরে নদীতে সমতলে প্রান্তরে
একটি মর্ত্যে সকলে নান্দনিক,
হীরক রৌদ্রে এক হিমঝরা শীকরে।

প্রাকৃত আমরা, নিশ্চিত তাই সমধিক—
সিক্ত চোখেই স্বচ্ছ আলোক ঠিকরে ॥
১০ অগাস্ট, ১৯৭২

স্নায়ুতে চৈতন্যে মিলে এক নীরাজনে

মানুষে সে জীব্য চিরকাল। তাই দেশজ্ঞ নিসর্গে
দেখেছে সে মানবজীবন, যে পরিপ্রেক্ষিতে মন
সুন্দরেই করুণেই সকলকে দেখে প্রিয়জন
অন্তরঙ্গ বহুরূপে অজেয় অম্লান মরভর্গে।

অথচ সে ব্যক্তিমাত্র, অর্থাৎ নশ্বর, একা, জীব্যে
তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেই, শুধু ব্যক্তিগত।
নিজে নিজে ভাবে, বলে : ওহে পার্থ যেও না হে ক্লৈব্যে,
নিজের সীমান্তে মেনো আশাভঙ্গ, ক্লান্তি হবে গত।

তাই সে শহরে-গ্রামে দূরবিনে ও অণুবীক্ষণে
প্রাকৃতিক ব্যাপ্তি গড়ে সংগীতে নিসর্গে চিত্রে
মানবিক বিশ্বনৃত্যে বিস্তৃত ঘনিষ্ঠে ও বিচিত্রে
নিজের-অন্যের স্নায়ুতে চৈতন্যে মিলে এক নীরাজনে ॥
১৭ অগাস্ট, ১৯৭২

কৃশতী ব্যথায় ভরে

লজ্জাই মানি, তবু মনে হয় থেকে থেকে কোথা পালাই
যেখানে দ্বন্দ্ব সমাহৃত এক সমাজের[১] গানে ।
জানি তবু তাতে ঘুচবে না এই বালাই
—সে তো পালায় না, পলাতক এই সমাজে ।

তুষারে তপস্যা কার ? আজ বুঝি আকাশে হিমানী,
চতুর্দিকে শাদা মেঘ কুয়াশায় একফালি নীল ।
নীলকণ্ঠ যেন দিলে গৌরীর পাণ্ডুর ভালে চুমা,
জ্যোতিষ্ক নয়ন মেলে তাই বুঝি নির্নিমেষ উমা ।

হিমভোরে দিন আছে মেঘে মেঘে রৌদ্রে আছে জানি,
তৃতীয় নেত্রের খড়্গে কেটে গেল মেঘেরা ঊর্মিল ।

পৃথিবীর শ্রোণিভারে মেদুর টিলায় চেয়ে থাকি,
সারাটা দুপুর কাটে তিতির কূজন শুনে শুনে,
ভাবি কবে এই ধনী জনে জনে সৌহার্দ্য বিলাবে
এই রৌদ্র এই ছায়া[২] সুন্দরীকে দেখে ভাবি তাই ।

পশ্চিমা হাওয়ায় রৌদ্রে হেমন্তিকা বিরামবিহীন
কৃশতী ব্যথায় ভরে আগামীর অভিরাম দিন ॥

সেই নিশ্চিতি উঁকি দেয় নীলে, গোটা দেশে রাঙা পার্বণ,
যেন উৎসব বিশ্বব্যাপ্ত অর্ধশতক আয়াসে[৩] ।
সুখী শান্তির শিশিরোজ্জ্বল নির্ঝরে জাগে মাঠবন ।
প্রতি বসতিতে নটরাজ গায়, জনে জনে দেখে মায়া সে ॥

১· পরে সংশোধন "এক সম-সমাজের"
২· পরে সংশোধন "রৌদ্রখর ছায়াশ্রিত সুন্দরীকে"
৩· পরে সংশোধন "যেন উৎসব বিশ্বব্যাপ্ত দীর্ঘকালের আয়াসে"

এক উত্তরমীমাংসা

অচেনা তবুও কি সেই চিরচেনা পৃথিবীই ?
আগ্নেয় পাথরে আর আদিম জঙ্গলে
চতুর্দিক যেদিকে তাকাই কণ্টকিত মাটি এইখানে।
যেন ভাবীকালে অন্য ইতিহাস অন্য ভূগোলের
ভূতাত্ত্বিক মৃত্তিকার অস্থিবিশারদ চন্দ্রলোক-বাসী
বিজ্ঞানীরা উত্তেজিত বসে দলে দলে জ্ঞানানুসন্ধানে—
কারণ সমস্ত কিছু প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু
দঙ্গলে দঙ্গলে দন্তুর উদ্ভিদ হাসি
ছেয়ে ফেলে এই ভিড়ে ভিড়ে অদ্ভুত জীবন,
হৃদয়ের প্রাকৃত ভ্রান্তিতে
গায়ে-গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি দুঃস্বপ্নের বনে—
উচ্চাকাঙ্ক্ষা শান্তি চায় মৃতের শান্তিতে।

না, তা অসম্ভব মানি,
জানি অবশ্যই নিশিপাওয়া অরণ্যেরও শেষ আছে।
হৃদয়ের, জীবনেরও ; কিন্তু কবে ও কোথায়
ঠিক বোঝা দায় নয় ? উত্তরপুরুষ তোমারই বলো ?
খর ঝোপে ঝাড়ে রক্তে পাথরে কাঁকরে শতবিধ স্বরচিত গাছে,
থেকে থেকে ভিন্ন ভিন্ন হিংস্র ডাকে উত্তাল পায়ের টলোমলো
ছিন্নভিন্ন নানা ছন্দে
দীর্ঘ দিনে রাতে পূতিগন্ধ ইতিহাসে, প্রাত্যহিক ক্ষণে।

অথচ এখানে সর্বদা কি ছিল এই পাতালের মহাবন ?
ছিল বন্যতার আসন্ন আবাদ ?
জানি না কি লাভ পায়, কারা সেই মহাজন।
বন্য চাষি কিংবা গ্রাম্য প্রতিবেশী পায় কিছু ভোজ্য পেয় স্বাদ ?
পায় কিছু স্বস্তি, কিছু জিজীবিষা
এই বন্য বিভীষায়, এই বনে মানবের দ্বন্দ্বে ?
হতবুদ্ধি একা একা চলি বহুলোক,
দেখি বাক্-দগ্ধ-রুদ্ধ জগ্ধ মহাবন।
এ কেমন বানপ্রস্থ, শেষ হবে কবে কোথা
কার আদি কোন অন্তে, কার দেহমন প্রাণে, কোন্ বনে ?

ক্রন্দসীর অশ্রুবাষ্পে জীবনের বপনে রোপণে ?
অগস্ট ১৯৭২

দ্র. 'অসম্পূর্ণ কবিতা : বাংলায় বাংলায়।'

এদিকে ওইদিকে কপাট

অবচেতন ? না। চিনি না চেতনে তাকে।
চেতনও জানি যে স্বয়ং ফেরারি যুবক,
এখানে এখন আর পরক্ষণে দূর থেকে দূরে ডাকে।
যমজ দুজনে, আল্‌গা চেনার বিপাকে
মনে হয় যেন রামুশামু জোড়ে মনেরই আরেক রূপক।

একে যদি বলি চিনি, ও মুচকে হাসে,—
ও পালায় গুহাকন্দরে যদি টানি।
এ বড় মজার রঙ্গ। বুঝি না, ধরন-টা কিছু জানি।
মাঝে মাঝে কাবু করে অবশ্য সন্ত্রাসে,—
সবটা বলাও যায় না ভদ্রসমাজে সাধুর সকাশে !

এদের ভোলাতে পারে না কোনোই নেশা।
হয়তো বা পারো তুমি, ধন্বন্তরি !
অচেতন চালু করা যার জ্ঞানী পেশা,
নিরুদ্দেশের পারে পাঠাতে যে পারে দিবাশর্বরী,
ফলে একাকার জীবনমৃত্যু শান্তিমগ্ন এষা।

তবে সে প্রাজ্ঞ প্রহরগুলিকে নিয়ে যায়, যায় যবে,
তল্‌পিতল্‌পা সব কিছু তোলে, ভেঙে দেয় সব পাট।
কেন যে এতটা শুচিবায়ু ভয় এতখানি বৈভবে !
ফেলে যায় কড়িকাঠ আর খাটো খাট।
—এবং এদিকে আর ওইদিকে কপাট ॥
২৩ নভেম্বর, ১৯৭২

দুঃখ আমাদেরও পাথার

(সাহানা দেবীর গান থেকে)

দুঃখ ? আমাদেরও অসীম পাথার। ক্ষোভে আর রাগে
অশ্রুহীন প্রবালের দ্বীপ তাই শস্যহীন লাল ?
অসীমের অশ্রুভেজা নীলিমায় তাই বুঝি মাগে
ক্ষিপ্তপ্রায় ঘাতকেরা লক্ষ দ্বৈপায়নের কঙ্কাল।

কোথা ? কোন্ দেশে দেশে ? কবে ? সর্বদাই ও সর্বত্র।
আজ বেশি, কাল কম, কালকে সাজানো, আজ নগ্ন,
এখানে ওখানে, নানা বেশে, দেশে দেশে যত্রতত্র।
লক্ষ্যভেদ কেবা করে, কেবা করে কার উরুভগ্ন ?

দুঃখে কি আঁধার ভালো ? বিশ্বপ্রেম, মানববিজ্ঞান
আজ আলো-অন্ধকারে, সত্যাসত্যে সদসতে মেশা।
উন্নয়ন হয়ে পড়ে পাতালনিবাসী দেশে দেশে,
মুষ্টিমেয় শুদ্ধচিন্তা হয়ে ওঠে কূটচক্রে ধ্যান।

দূর থেকে শোনা যায় ক্ষিপ্ত ক্ষিপ্র চূড়ান্তের হ্রেষা।
সব পুরুষার্থ দোলে অসীম পাথারে রক্তে ভেসে ॥
১ ডিসেম্বর, ১৯৭২

ইতিহাস-স্থা শ্রেয়সী

ইতিহাস অতীতেই স্পষ্ট, সহজীব্য, দৃষ্টিগ্রাহ্য।
বিষাদের বর্তমানে ইতিহাস কোথা ?
বর্তমান অবান্তর, চেনাশোনা ছদ্মে গুপ্ত, মিশ্র, বাহ্য।
বিশ্বে বা বাংলায়, বলো, কোথায় অন্যথা ?

তাই তার চিরসত্য অগ্নিশুদ্ধ প্রেমে উজ্জীবন
খুঁজেছি, অর্জেছি চেতনায়।
ডালহৌসি বা আশেপাশে জীবিকার অগ্নিকে বীজন,
প্রেমের অক্ষয় আভা তীক্ষ্ণ বেদনায়

ক্ষণে ক্ষণে ধূম্রায়িত হয়। সে কি ক্ষণিকের ভুল ?
যেহেতু সুদূর সে প্রেয়সী
পাশাপাশি নৈকট্যেও মিশ্রে অগোচর, দূর ছবিছেঁড়া ফুল
আজ কোথায় সে, ইতিহাস-স্থা শ্রেয়সী ?
১ ডিসেম্বর, ১৯৭২

ষোড়শোপচারে

মৃত্যু নয়। শুধু বুঝি স্বয়ংসম্পূর্ণ এক
নিছক চৈতন্য সমাহিত ইন্দ্রিয়সমূহ
প্রায় যেন শৈশবের নিরালম্ব তূর্ণ এক
নির্বিকার সন্ন্যাসের যোগন্যস্ত রক্ষা-ব্যূহ।

তারপরে অজ্ঞাতেই দূর চৈত্যে উত্তরণ,
যেন শান্ত সুপ্তি শেষে উষসীর উন্মীলন।
শয্যাগত নাকে-চোখে সদ্য গত ও আগামী
একাকার, আর সেই একে শান্ত স্থির আমি।

স্নায়ুর শান্তির স্বত্বে শত সহস্র মুহূর্ত
স্বচ্ছ স্বাদু নীল হ্রদ, দেখে কিরাতে অন্তরে।
চৈতন্য কি বিচক্ষণ মাতৃসম ? নাকি ধূর্ত ?
ধন্বন্তরি অন্ধকার জাগে রাত্রির ফুৎকরে ?
কিম্বা অমাবস্যা যেন হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত
কোজাগরে নাকি রাসে বদ্ধ অদ্বৈতে অম্বরে
৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২

নৈঃসঙ্গ্যকে সংগীত উৎসবে

সভাসজ্ঞে নৈঃসঙ্গ্য সে খোঁজে।
পরক্ষণে ধাওয়া করে
চেনা ও অচেনা এ সঙ্গী ও সঙ্গী চেয়ে।
একাকিত্বে চায় জনতার মৌল সংলগ্নতা।
ময়দানে বা বাড়িতেই শুয়ে বসে ঘুরে বা ঠায় দাঁড়িয়েই,

সিনেমা, নাটক, খেলা, দেখে শুনে প্রত্যক্ষের পরোক্ষের
দ্বন্দ্বসমন্বয় খুঁজে পিপাসা মেটায়।

মেটে কি তা ? বাইরের পাওয়া জোটে ঘরে ?
কেন সে নিজের ঘরে, ভাড়া-করা তার চার দেয়ালে আটক ?

নৈঃসঙ্গ্যে সঙ্গত মেলে, একাকীর আসঙ্গআসনে যেন
সংগীতআসরে স্তূপীকৃত যন্ত্রের তিনপাশে।

সে যে চায় মাঠে পার্কে পায়ে পায়ে উচ্চকিত
বঙ্কিম মুখুজ্জে বা হীরেনবাবুর ঝড়ে,
যা আলি আকবরের বা নিখিলের যন্ত্রের নির্ঝরে
তন্ময় ঝঞ্ঝার বৈশাখী প্রপাত আকাশমাটিকে
শত হৃদয়কে ভরে।

কিন্তু সে তো ক্ষণিকের ? দীর্ঘায়ুর বর্ষে বর্ষে
ষড়্‌ঋতুর মাসে মাসে দৈনিক অম্বরে
কেন তার রেশ আজও চিরস্থায়ী নয় ?
কেন ছিন্ন এককের শুধু জোটে সংহতির মন্দাক্রান্ত ছন্দ ?
সর্বদা ত্রিনেত্রে কেন মুক্তদৃষ্টি স্থির নেই ?
কিবা দেহে কি অন্তরে সর্বাঙ্গে চৈতন্যে যেন শতচ্ছিন্ন
দক্ষজার স্নায়ুর জটিল দ্বন্দ্ব !

নৈঃসঙ্গ্যকে সংগীত উৎসবে নির্মাণের সঙ্গী করো, কবি
হবে মানবিকে মানসিকে সমুত্তীর্ণ ভালোমন্দ ॥
১০ ডিসেম্বর, ১৯৭২

ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ

অবশ্য লোকটি ভীরু, ঝঞ্ঝাট হ্যাঙ্গাম চিরকাল এড়ানো স্বভাব,
বীরত্ব মহত্ত্ব সবই জীবনের দুই পাশে কেটে ফেলে যায়।
নির্ঝঞ্ঝাট কল্পনায় ভয় নেই, বাস্তবের অভিজ্ঞ প্রভাব
প্রত্যহ সে দূরে রাখে কর্মের সকালে আর দুপুরে, সন্ধ্যায়,—
রাত্রেই সে মুক্তমনা, অন্ধকার সব ডাকে দেয় সে জবাব।

অথচ লোকটা কিছু দুষ্ট নয়, শুধু নিরাপত্তা রক্তে মর্মে,
সাহস সে মনে মানে, মনে-প্রাণে জানে বরাভয়।
বুদ্ধি তথা কল্পনায়, মুখ এঁটে হাত-পা টেনেছে স্বধর্মে—
স্থূল দীর্ঘজীবনের দোরগোড়ায় ধৃতরাষ্ট্র, শোনো হে সঞ্জয়,
স্বধর্ম বা পরধর্ম দুইই সত্য, মগ্ন যদি হও নিজ কর্মে।

পতিব্রতা গান্ধারীকে জানাই নি একেবারে নই দৃষ্টিহারা,
যদিও হয়েছে ইচ্ছা ওষ্ঠাগত, চোখে মুখে বরাঙ্গের করি জয়গান,
অথচ চকিত চোখে নিভৃত শয্যায় দেখেছি সে পার্বত্য দু নয়নের ধারা,
কোনোদিন অক্ষিতারা মেলে রেখে জানাই নি নারীকে সম্মান।

—ওরাই কি এক-ন্যূন শতপুত্র ? নীলাকাশে ও কি লক্ষ তারা ?
২ ফেব্রুআরি, ১৯৭৩

ফেব্রুআরির চতুর্দশপদী

এই তো কদিন—নাকি কয়মাস আগে ছিলে প্রতিরোধী-বীর,
ন্যায়ের সাহসে ছিল অজেয়ত্ব পাঞ্চজন্যে মুখের ফুৎকারে।
আজ কেন মুহ্যমান ? জীবনেই গ্লানি বটে। কিন্তু তোমাকে অস্থির
কিংবা পরাজিত ভাবা অসম্ভব, কারণ তখন এসেছিল দ্বারে
ঘরে ঘরে ইতিহাস নিজে। আর এখন কি জীবনের দৈনন্দিনে
নানান গ্লানিতে ইতিহাস লুপ্ত ? শুধু আছে মিথ্যা ? শুধু মাকড়সার জাল ?
শুধু বর্ধিষ্ণু কেউটেরা ? শুধু বৃশ্চিক ও রক্তার্ত জলুকা রাত্রে দিনে
গুপ্তিঘাতে সন্ত্রাস জাগাবে, লাগাবে ধ্বংসের দাঙ্গা কৌটিল্যে করাল ?

অসম্ভব। আদি যাই হোক, পরিণতি কালে এ যে অসহ এ অসম্ভব,
তুমিও কি অন্তরিন হবে ঘরে ও আপিসে, সদা মাথা হেঁট,
মুখ ক্লান্তি-ঢাকা, যেহেতু জীবন আজ প্রলুব্ধ আনত, ওঠে কলরব
স্বাভাবিক বা রসায়িত, যেন বা জীবন এক ধড়িবাজ পাচকের কেরামতি,
খাওয়ায় গরল, কারণ : জীবন নাকি হলাহল, দেয় শয়তানকে ভেট !
চিরজীবী ভাব কেন কটা বিষফোড়ার দাপট ? অমৃতে যে
স্বদেশের রক্তের সদ্‌গতি ॥

৩ ফেব্রুআরি, ১৯৭৩

যেমন সংগীত পায়

তাদের চুম্বনে তারা স্পষ্টতই খোঁজে চিরন্তন।
পায়ও, যেমন সংগীত পায়, অবশ্য প্রহর তরে।
আপাত-পূর্ণের ঢেউয়ে আশ্লেষের বেলাভূমি ভরে,
সে তীব্র পূর্ণতা যদি ক্ষান্তি মানে, শান্ত হয় অনন্ত চুম্বন।

দ্বৈতের বা দ্বান্দ্বিকের সমন্বয়ে আর ক্রমান্বয়ে
বুঝি এই কম্বুগ্রীবা প্রেমেরও প্রগতি!
ভিক্ষায় সম্মত কেবা? কেবা পাবে সাষ্টাঙ্গ সঙ্গতি
ক্ষয়িষ্ণু দৈনিক পত্রে চিরায়ুষ্মতীর অব্যয়ে।

অনিত্যের ত্রিসীমায় আনন্দের ব্যাপ্ত আলিঙ্গন,
তখনই মানবসত্তা জীবনের সম্পূর্ণ প্রণতি।

অথচ সবার নয়

স্বোপার্জিত স্বাভাবিক ক্লান্তি নয়। ক্লিন্ন দাসত্বের দৈনন্দিন গোলযোগে
বিশৃঙ্খলা ক্লান্তিকর, দুবেলা দুমুঠো দারিদ্র্যের চেয়ে বেশি।
যেমন দৈহিক কোনো গ্লানি নয়, মানসিক দুর্ব্যবস্থা রোগে
শুধু মন নয়, স্নায়ু নয়, কাবু হয় বাস্তবের রক্ত স্নায়ু পেশী।
কারণটা ব্যক্তিতে বুঝি নয়? দুই তিন চারে বহু শতে শতে?
হেতুটা কি আরো ফল্গু নর্দমায়, অথচ বিস্তৃত, দেশব্যাপী, খানিকটা আবিশ্ব?
চৈতন্য কি পঙ্গু, প্রায় অপহৃত? অথচ সবার নয়, তা হলে যে সর্বব্যাপী ক্ষতে
ঐক্য পেত বিশ্বজন, মানসে সবাই হত সমনিঃস্ব।
অথচ কেনই বা হবে সবাই সমান নিঃস্ব, স্নায়ু পেশী মনে প্রাণে চৈতন্যে
পঙ্গুর
লাঙ্গুল খসিয়ে মানুষ কি সিদ্ধির চূড়ায় উঠে হয়ে যাবে সর্বস্বের পতনে ভঙ্গুর?
২০ মার্চ, ১৯৭৩

সময়াভাব

সময়েরই টানাটানি, প্রত্যহই কিংকর্তব্যবিমূঢ়
নানা ভাবনা ভাবি আর বাস্তবিকে করি অপচয়
সময়েরই—ভাবনারও-বা, অথচ স্বভাবে নই রূঢ় ।
ভালো ভালো ইচ্ছা আর অক্ষমতা দুইই করে কালক্ষয় !
তবুও বস্তুত নিজে ত্রিকালের আদিবাসী ! নেই আমারই সময় !

অথচ লোকটা নই পলাতক, হয়তো বা ভীরু বা লাজুক,
মর্মে মর্মে বিনীতই, যে বিনয়ে জমে তার জেদ ।
বিশ্বের সংগীত তার হৃৎপিণ্ডে ভাবে সে, ভাবুক—
না ভেবে কীই বা লাভ ? নিত্য মর্মভেদ
যদি তাকে স্ব-স্বভাবে জীয়ায় তো নেই তার খেদ ।

অথবা খেদটা তার বিপুল বিশ্বের মহাকালে
সময়েরই স্বাস্থ্য ভাঙে আর থেকে থেকে মন ভাঙে,
অধৈর্য ঘনায় রাগে দুনিয়ার দুর্বোধ্য জঞ্জালে,
ঠেকেও শেখে না কিছু, শুভবুদ্ধি এখনও পাতালে,
অথচ মনের বনে মানবিক রঙে ঊষা রাঙে
প্রত্যহের আলো-অন্ধকারে বাঁধা হরগৌরী ধ্রুপদীর তালে ॥

৩০ এপ্রিল, ১৯৭৩

ত্রিকাল তার মোছায় মুখ

কপালে নেই দুঃখ-সুখ,
শুধুই আছে জ্বালা ।
যখনই খোঁজে ভূত বা ভাবী.
বর্তমানে ডোবে ।

ত্রিকাল তার মোছায় মুখ,
দোলে মুণ্ডমালা ।
জানায় ঘৃণা—নয় তা লোভে
কোটির একই দাবি ।

কেমন যেন পাগলা লোক,

সুখদুঃখ জানে,
কিন্তু জেনে মন না মানে।
এ কী অঘোরপন্থী!

পায় নি সে কি হর্ষ-শোক?
কে তার মন হানে?
ক্ষান্তি তার জুটবে প্রাণে?
কী তন্ত্রে সে যন্ত্রী?
১০ মে, ১৯৭৩

তবু তুমি আমাদেরই প্রতিনিধি

অন্যেরাই প্রশ্নাধীন, তুমি মুক্ত ক্রন্দসী-নিবাসী,
অথচ এ মর্ত্যের মানুষ, জানো সব কান্নাহাসি,
মানুষ যা মানে নিত্য এই জীবনের দৈনন্দিনে
ভাগ্যবান সুদিনে বা আপতিক মানবদুর্দিনে,
দোষে-গুণে রসাতলে নামে ওঠে জীবনে প্রবাসী।

তুমি দেখি একা বহু, হিমালয়ে বঙ্গোপসাগরে
মিলিত বিচিত্র দেশ, বৈশাখের রৌদ্র কোজাগরে
চৈতালিতে পৌষোৎসব, প্রাত্যহিকে অক্লান্ত বিস্ময়।

তুমি মহাব্যতিক্রম তবুও সবাই ভাবি তুমি
আমাদেরই প্রতিনিধি, প্রত্যেকের প্রাণের প্রতীক,
যদিও বঞ্চনা আর হীনমন্যতায়—শত ধিক!
পশুপাখিরাও বলে। এই মরস্বর্গে বরাভয়
তুমি শুধু, দীর্ঘায়ুর রাত্রিদিনে ক্লান্তিহীন জয়,
তোমাকেই জানি তাই আবিশ্ব আত্মীয় বঙ্গভূমি ॥
৩০ মে, ১৯৭৩

কাব্যচর্চা মাধুকরী, শিল্পই সন্ন্যাস

কবিতাই যদি করো পৃথিবীর মানদণ্ড, তবে হে কিশোর,
প্রত্যহ দক্ষজা অস্থি দেখো তিন চোখে, থেকো নৃত্যেই বিভোর।

হ্যাঁ, শিল্পে বাজার মন্দা, কবিতাও বাঁচে শুধু কঠিন সংবিতে।
তবে যদি গল্প বাঁধো, টেনে টেনে লম্বা পাকে রাঁধো উপন্যাস,
হয়তো পসার পাবে ; রোমাঞ্চের দিবাস্বপ্নে অসার অভ্যাস
যদি কিছু চর্চা করো, হয়তো পকেট ভরবে রাস্তার ফেরিতে।

কিঞ্চিৎ ঈশ্বর যদি ছাড়ো তাতে, কিছুটা বা ভারতীয়তার
কুহক দেখাতে পারো কুজ্ঝটিতে, বাটখারার যাবতীয় ভার
জুটবে তোমারই ভাগ্যে, সরকারি না হোক, দেখো সংবাদপত্রের
পদকে ভূষিত হবে, পুরস্কারও জুটে যাবে সাহিত্যসত্রের।

প্রবীণের কথা শোনো : কাব্যচর্চা মাধুকরী, শিল্পই সন্ন্যাস ;
এ পণ্যে ব্যবসা নেই, এ পসরা চলে না হে কারবারে চুরিতে।
তার চেয়ে নাকি ভালো নির্বুদ্ধি বিকারে ভেজা ভাবালু অভ্যাস ?
তবে কেন দৃপ্ত নৃত্যে তাল দাও চৈতন্যের গম্ভীর ভেরিতে ?
২ জুলাই, ১৯৭৩

এর চেয়ে ডুব দেওয়া ভালো

(অর্ঘ্য-কে)

এর চেয়ে ডুব দেওয়া ভালো, হোক্ জনগণে অস্পষ্টেই।

আপাত-চলার মধ্যে ঘরে পথে ভেসে কোথা গতি ?
এ চেনা জগতে চিনে কিবা লাভ কেবা নব্য কে অসভ্য ?

তার চেয়ে চলো ডুবি পৃথিবীর মানদণ্ড সমুদ্রে, কষ্টেই,
অন্তত সেখানে নেই মানবিক গৃধ্নুর দুর্মতি,
সেখানে সহজ সরল আজও হয়তো বা আছে কিছু লভ্য !

সেখানে সনাক্তকারী গ্লানি নেই, অন্তত তা করা যায় আশা,
বিশেষ ও নির্বিশেষে সেইখানে কোলাকুলি কিছুটা সমান।

সেখানে যে বোঝা যায় জীবনের আশা আর মানুষের ভাষা
বঞ্চিতের অপ্রকৃত অসহায় গরিষ্ঠের সত্যের প্রমাণ—
কখনও বা লাল রাগ কখনও বা আশাআকাঙ্ক্ষায় স্তব্ধ ছলো ছলো

চলো যাই, সেই অশ্রুনদীর সুদূর পারে চলো ॥
৮ জুলাই, ১৯৭৩

সবাই চায় পাদানি

চিনি তো অনেক ক্লান্তি লক্ষ লক্ষ মানুষে যা পায়।
বোঝা যাক বা না যাক কম বেশি যায় চেনা জানা,
আমিও জেনেছি তাই দীর্ঘকাল, আজীবন প্রায়,
দিনকে যে শ্লথ করে, অন্ধকারে দিয়ে যায় হানা।

ধর্মীয় বলেন শুনি জীবনেই মৃত্যুর নিশানা।
তা বলুন। কিন্তু কে এ একেশ্বরবাদী অন্ত চায়?

একার মনের ক্লান্তি, মুমূর্ষার একা দেহে গ্লানি
—লাখো লাখো একা দেহে একা মনে বেঁচে বেঁচে মরা,
সমাধান চেয়ে আশা এই গোটা মহাদেশ ব্যেপে।

বেতারের তার স্বরে রোজকার কাগুজে খবরে
এ যন্ত্রণা বেমালুম বিজ্ঞাপনে কালি দেয় লেপে।

পোড়া দেশ? তাই বটে, দুঃখশোক বৃথাই বাখানি।
রামরাজ্যে বেনেরা বাবুরা চায় সবাই পাদানি ॥
১৪ জুলাই, ১৯৭৩

মহৎ শিল্পের শ্রম

অথচ সে বুদ্ধিমান, জাগতিক, নিজেও সে রচয়িতা বটে,
নামডাকও অর্জেছে সে, ক্ষিপ্রপটু কলমের স্বকীয় এলেমে,
কুঁড়ে নয়, দ্রুত লেখে বাঁহাতে ডানহাতে, পারে, বেশি না ঘেমেই,
লুচির মতো পারে সংবাদের তাল-ফেরতা বাঁয়ার সংকটে

পার হতে অবলীলাক্রমে। সে যে ফাউন্‌টেনের কর্তৃত্ব আয়ত্ত
করেছে তা সহজেই বোঝা যায়। অথচ বন্ধু ও বিদগ্ধ জনেরা,
আমাদেরই মতো যাঁরা ক্ষিপ্র আর পটু সাহিত্য শক্তির ভক্ত—
তাঁরা সব হঠাৎ লজ্জিত ক্ষুব্ধ, সকলেরই মনে হয় vera

Incessu patuit dea অর্থাৎ যথার্থই দেবতা যিনি
তাঁর চলনেই বোঝা যায় স্বর্গমর্ত্যব্যাপী দেবী বটে তিনি।

সাহিত্য বা শিল্পকর্ম যে দৈবত বিনিদ্র আয়ত দুই চোখে
ক্লান্তিহীন রূপ পায়, সত্য পায়, কুৎসা বা কেচ্ছায় নয়, সত্য
নান্দনিক সত্তা পায় নিবিষ্ট শিল্পের ধ্যানে, নয় ফাঁকা ঝোঁকে।

মহৎ শিল্পের শ্রম দেখতে বুঝতে চাও যদি, হতে হবে মনে
প্রাণে সম্ভ্রান্ত ও সর্বদাই ইমানের ভক্ত।
তবে বুঝবে চুরাশি বছর ক্রমান্বয়ে কী শ্রম কী বীর মহত্ত্ব।
১৪ অগস্ট, ১৯৭৩

অষ্টপদী ঘৃণা

নিসর্গে কি মানবজীবন একমাত্র বার্ধক্যের স্বাভাবিক রোগে
নিজ সম্পূর্ণতা পায়, মৃত্যু ছাড়া, সর্বতোভাবেই? বলো হে সঞ্জয়।
ধরনধারণ দেখে আর শুনে, আর সর্বত্রই কমবেশি ভুক্তভোগে
মনে হয় শতকরা নব্বুই বা নিরানব্বুইয়ের সন্দেহ সংশয়।

অবশ্য আবিশ্ব আজ ইতরতা আর নির্বুদ্ধিতা চতুর প্রাবল্যে,
বস্তুত দৌর্বল্যে—শুধু মানুষের মন—দেহ না; সসাগরা
পৃথিবীকে বিষায় যে, সে তো ওই
নির্বুদ্ধি কারণে আর হয়তো বা ধর্মীয় ভাষার ঢঙে বললে
বলতে হয়, অতিবুদ্ধি মুখ্য পাপে সকলেই প্রত্যক্ষে পরোক্ষে দায়ী
আর প্রায় সকলেই মুড়িমুড়কি খই ॥
২২ অগাস্ট, ১৯৭৩

এতদিন পরেও কি বর্ণচোরা খাকি

সপ্তাশ্চর্য ? বাঁচাটাই অষ্টম আশ্চর্য নাকি ?
অন্তত চৈতন্যে আজ অভাগা এ দুস্থ দেশে ?

আমাদের সাধ কম—সাধ্যও যে নেই, বাকি
নিয়ে চলে কতকাল ? ভিন্ন ভেকে ভিন্ন বেশে
অসীম ক্লান্তির জরা বওয়া ছাড়া গত্যন্তর
শুনি আর নেই নাকি, মানবিক প্রশ্নোত্তর
ওরা বলে পণ্ডশ্রম, আশা করা নাকি ফাঁকি।

তাহলে চৈতন্য কেন বীজকম্প্র থরোথরো
মনের মাটিতে দেহে অন্তহীন সদাব্রতে
শুধুমাত্র অপচয় কি পশ্চিমে কিবা পুবে ?
সান্ত্বনা কোথায় পরলোকযাত্রী এ ভারতে ?
পাপ কিংবা পুণ্যে দুঃখকষ্ট নাকি উচ্চতর
যেখানে সকলে আজ এক পঙ্কে থাকে ডুবে।

গায়ে এতদিন পরেও কি বর্ণচোরা খাকি ?
২৮ অগাস্ট, ১৯৭৩

ঈশাবাস্য দিবানিশা

দৃশ্যটা পালটেছে এই আদিতে রৈবিক প্রকৃতিতে।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধ হওয়া এ ঊষরে বড়ই দুরূহ,
সর্বত্রই চক্রান্তের দৃশ্যাদৃশ্যে শতলুব্ধ ব্যূহ
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ধায় চৈতন্যের বাজারি সংগীতে।

নিসর্গের কী-বা দোষ ? দেশে আর অনেক বিদেশে
রবিরশ্মি ম্লান তাই।
জীবনের অজেয় গৌরবে
আনন্দ দুর্লভ সত্তা, প্রকৃতির স্বভাব-বৈভবে
অন্ধ কিংবা ক্রূর লোভ পরবশ গ্লানির আশ্লেষে।

অথচ ভূর্ভুবস্ব-ই আজও এক সত্য ইতিহাসে,

ভাষান্তরে আরণ্যকে। তবু কেন এই বিবমিষা ?
সনাতন অশ্বত্থ বা শালপিয়াল বা আমজামঘাসে
হন্যে তাড়িয়াল দল ভাঙে ঈশাবাস্য দিবানিশা ॥
২৭ নভেম্বর, ১৯৭৩

কেন ভগ্ন ধর্ম ধরি

ন্যায়শাস্ত্র ঠিকই বলে, ন্যায্যকথা, মর্মে মর্মে—
সামাজিক জীব আমরা, কেন মনে প্রাণে কর্মে
কল্পনার লতাকেই চেতনার সর্বাঙ্গে জড়াই ?

মনুষ্যই জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জন্তু, লিখি, পড়ি এবং পড়াই
সে তো ঐ সামাজিকতার জন্যে মানবিক সমাজেরই ধর্মে

তাহলে কেন-বা এই ধরনটা ? যেন বা অদ্ভুত এক নৃতাত্ত্বিক কূর্মবর্মে
একা একা প্রত্যেকেই স্বয়ম্ভর, যদি না তা পালটিয়ে গড়াই ?
কেন এই বড় বড় থেকে ছোট ভ্রান্তির বিলাস আজকেও করি ?
কেন এই বিচ্ছিন্নের ভগ্নধর্ম ধরি ?

কেন নেই উনিশশো তিয়াত্তরে মানুষের মনের বড়াই ?
২৯ নভেম্বর, ১৯৭৩

অদ্বৈতে নদীর সিদ্ধি

তুমিই এনেছ প্রেম আমাদের শ্মশান-কান্তারে,
বিড়ম্বিত দেহমনে প্রত্যহের যে পরিপূর্ণতা,
তার তারা ধ্রুব আজ, চোখে চোখে ভরুক শূন্যতা ;
আজ হোক নিত্যদিন প্রেমের ভাস্বর পারাপারে

নির্ভীক অভ্যাস, নিত্য শুভাচারে যেন ফিরে ফিরে
নিষ্ঠুর লোভের শূন্য ভ'রে দিই আস্তিক সঙ্গতে,
দেশে দেশে ফুলে ফলে কর্মিষ্ঠের মুহূর্তে শাশ্বতে
অদ্বৈতে নদীর সিদ্ধি, রোপণে বপনে দুই তীরে ॥
১৯৫৭

খরতোয়া

আমাকে আপন জেনো, খরতোয়া ; স্মৃতি হয়ে যবে
বন্যাস্রোতে ভেসে যাব পুড়ে উড়ে কালের গোবিতে,
আমাকে হাওয়ার বাষ্পে ভারতীয় ঝুলন উৎসবে
বৈশাখীতে বৈকালীতে নবান্নের হিমার্দ্র রবিতে

নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মেনো, আর যবে দৃষ্টিহীন আমি
অন্ধকারে জ্যোৎস্নাপ্রভ নীলিমায় তোমার শরীরে
চোখ খুলে তাকাব না, জেনো, সেইদিনও অন্তর্যামী
আমার সহস্রতারা স্মিতহাস্য তোমার শিশিরে ।

যবে নদী ঘুরে যায়, তখনও যে বালির বিপাকে,
জানো, ধারাজল চলে দিগন্তের কপিল সাগরে ।
তখনও নতুন চাষ আমার অতীত বাঁকে বাঁকে,
আমারই স্মৃতির পলি তোমার মসৃণ বালুচরে ॥
১৯৫৭

সর্বদাই সর্বংসহা

তোমাকে কী দিই বলো ?
প্রতিটি রাত্রিতে তুমিই আকাশ, ঘুম,
অবচেতনের মুক্তি, পাশে জেগে থাকা ।
সবই তো তোমাকে ছুঁয়ে,
দিনগুলি যেমন সূর্যের
—তোমাকে যা দিই—
তাও তোমারই তো, চেয়ে মেগে রাখা ।

যেমন বাজাই এক কালেরই বিজয়গান ত্রিকাল তূর্যের ।

ভালোবাসি, সেই কথা তোমাকে বলেছি বহুবার
আকাশ যেমন বলে, আর
মাটি শোনে রৌদ্রে মেঘে,
আর, অন্ধকারে নিত্যকাল ।

তুমিও শিউরে ওঠো, হাওয়ায় হাওয়ায়
বর্ষে বর্ষে মাটির মতন,
সর্বদাই সূর্যে সর্বংসহা ॥
১৯৫৯

দৃশ্যাবলী

ওফেলিয়ারও আগে

১

দিগন্ত-জোড়া ধানের খেতের বুকে
আজ দুরন্ত বাতাসে সবুজ সাগরে।
আমারও মনের নীলে নীল ভরাডুবি।

যতদূর চাই
সরস সতেজ মাঠ,
সে সবুজে চরে একটি পাটলী গরু,
ল্যাজ-ঝোলা দুটি ফিঙে পিঠে ব'সে ভাবে
চিকনকালোর ভাবনা।

দেখতে পেলুম আদিম ঋজু ছেলে
রক্তজবা পরিয়ে দিলে কষ্টি মেয়ের কানে।
চাঁপার আড়ে, আরেক মেয়ে···
কেমন চোখে তাকিয়ে থাকে ওই ছেলেটির দিকে।
অসীম দেখার মধ্যে হঠাৎ থামে
এক পলকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের খোঁপার লালকরবী
হাওয়ায় হাওয়ায় ছিঁড়ে ওড়ায় কুচি কুচি একটিবার না চেয়ে,
ঠোঁটে আবেগ অস্ফুট কার নামে।

বলরাম কেউ পার্বণকালে গ্রামে ফেরবার তাড়ায়
ফেলে চলে গেছে সোনার কাস্তে তারায় খচিত মাঠে।
দশদিন ব্যেপে খুঁজবে পাড়ায় পাড়ায় ॥
১৯৩২।৩৩

২

পাশের বাড়ির ফুলবাগানে
ফুটল সন্ধ্যামণি।
নাই যদি বা তাকাই, তবু চুপটি চেয়ে থাকে।
তাই তো ওকে ভালোবাসি সহজ শান্ত মনে।

শুভ্র শাড়ির কালো পাড়ে পাড়ে ঘেরা
আলতায় আঁকা ক্ষিপ্র পায়ের চলা
কোন্ ঘরে গিয়ে মেনেছিল অবসান,
মনটা আমার সে ঠিকানা খুঁজে মরে।

রাত দুপ্রহরে সংবিতে কোন্ সম্মোহ ঢেউ তুলে
দুলে দুলে চলে দুরন্ত রেলগাড়ি,
অসীম ঘুমের আকাশে সে যেন বুকচাপা ধূমকেতু।

শচীন তখন আবেগে খাতায় লেখে :
অশেষ আমার অমাবস্যায় তুমিই একটি তারা,
আমার মনের শাল অরণ্যে একটি স্বপ্নযূথী।
লেখা শেষ করে ভুবনডাঙায় শচীন ভাবে :
দুবোনের মাঝে দামিনী ভালো কি ললিতা ভালো।

দু'জনেই তারা দোহার জোগাল ক্লান্তিবিহীন আখরে।
তারপরে কেন কখন কোথায়
ছিঁড়ে গেল সেই সূর্যপূজার অনন্ত দুই তার।
সঠিক জানি না, শুনেছি আখর ঘৃণায় হঠাৎ থাক্।
দেখেছি দুজনে দুই ঘরে যায়, মৃদঙ্গ নির্বাক্ ॥

৩

মনোমন্দিরে বসানো সহজ,
স্বপ্নে আসন পেতে।
খড়ের চালায় রাখবে কোথায় ওকে ?
বিদ্যায়তনে হয়েছিল দুটো কথা।
তাও হল ছেঁদা গাজনতলায়
এঁদো পুকুরের শীতে।
পাঁচ কথা জেনো বলবেই পাঁচ লোকে।

রাঙা ফালি পথ ফ্যাকাশে সুদূর চাঁদের আলোয়,
ধু-ধু করে খালি মাঠ,
একা তালগাছ ভাবনা মাথায় শূন্যে তাকায়
এক চোখে ঢুলু ঢুলু।
থেকে থেকে বুনো দম্‌কা হাওয়ায় আঁচলে পাঞ্জাবিতে,
বাধায় হুলুস্থুলু উচ্চকণ্ঠে ত্রিকালেশ্বর হেঁকে।

তালের মাথা দোলায় ঘন পাতা,
শালের শাখা বাজায় করতালি,
খেজুর-কাঁটা শূন্যে লড়াই করে,
হাজার খানেক বর্শাফলক ধরে,
পাগলা হাওয়ায় বাঁশ ঝাড়েরা নাচে,
আম্‌লা পাতায় হালকা নাচের নেশা।
একলা বোবা কলাবৌয়ের মাথাটা খালি দেখছি
শতচ্ছিন্ন বেশে ॥
১৯৩২। ৩৩

"ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে বহুবছরের প্রশ্ন"

জন্ম ৭-৪-১৭৭০

ছিল না তো তন্দ্রাচ্ছন্ন আমার অন্তর,
অথচ ছিল না কোনও মানবিক ভয়,
তাই কি ভেবেছি তাকে সূর্যের মৎসর
কখনও করবে না মর্ত্য, সে চির অক্ষয় ?

আজ তার গতি নেই কেন স্পন্দহীন,
আজ সে বধির, মূক, নেই সে নয়ন,
মর্ত্যের আহ্নিক চক্রে ঘোরে রাত্রিদিন।
সঙ্গী তার শিলা, মাটি, সমুদ্র ও বন।
৭ এপ্রিল, ১৯৭০

জর্মান গণতন্ত্রের জন্য

Goethe-র একটি কথা আমি মনে করে রেখেছি, সেটা শাদাসিধা কিন্তু বড়ই গভীর :
Entbehren sollst du, sollst entbehren.

—রবীন্দ্রনাথ

প্রকৃতি ? সে বটে নির্মম
ভালোতে এবং মন্দেও ।
প্রসাদ কি কিছু পায় কম
তবু নেই কোনো সন্দেহ
জাই হিল্‌ফ্রাইখ্ উন্‌ড্ গুট্[২]
য়েনের গেআনেটেন্ হ্বেজেন্[৪]
প্রেমিক এবং সদাশয়
আগামীতে গড়েছে যে মূর্তি ।

সূর্য ? সে সত্যই দীপ্ত
চাঁদিনীর আর জ্যোৎস্নার
দুষ্ট অশিষ্ট ক্ষিপ্ত ?
এডেল্ জাই ডের্ মেন্‌শ্[১]
জাই উন্‌স্ আইন্ ফর্‌বিল্‌ড্[৩]
মানুষই সত্য মহীয়ান
স্বপ্ন যে করে নির্মাণ

মুস্ এস্ জাইন্ ?[৫] তাই হোক ।
অমর যে এই স্ফূর্তি :
জী ইম্ কর্ ডের্ এঙ্গেল্ ষ্টেন্ ।[৭]
কার্ল এবং লুড্‌হ্বিখ্
সেবাষ্টি আন, বের্টোল্‌ট্,
স্বপ্ন বাঁচায় দুনিয়ায়—
এদিকে যতই চলে জবাই
ততই স্বপ্ন গড়ে বীর ।

তবু মন নিশ্চিত ধীর
জীট্ মান্ ইঃ রে ফানেন্ হ্বেন্[৬]
তাই ওরা মেতেছে সবাই
য়োহান্ এবং হুলফ্‌গাং
হাইন্‌রিখ্, আন্না, টোমাস—
দুনিয়ার স্বপ্ন বাঁচার
যতই ছড়ায় সন্ত্রাস,

তাই এই লাঞ্ছিত সূর্যে
তাই তো এ তালনারিকেল
ম্রিয়মান তবু উদ্‌বেল
স্বতই ছেড়েছি, মিল্লিওনেন্ ![৮]
ছেড়েছি হতাশ হৃদয়ের

ছায়ায় আমরা দূর পূর্বে
আশায় ছেড়েছি দাহশয্যা,
জাইড্ উম্‌শ্ লুংগেন ! ফ্রয়েডে[৯]
দীর্ঘ দাস্যের লজ্জা ।

তাই উন্‌ডের্ ডের্ লিন্‌ডেন্[১০]
শুনি প্রান্তরে বাংলায়
চলি হিম উত্তরে তাই
রিক্তশিখরে ঐ পাইনে
বীঠোফেন যে বধির, তূর্যে
মাইন্ গুটের্ কামেরাড্ ![১৩]

আন্ ডের্ হাইডের[১১] গান !
ভাগ্য যখন সাধে বাদ
টান্‌ডারাডাই[১২] তানানা !
প্রতীক নিশান ঝলসায় ।
আবার বাজায় বুঝি সাম ॥

১· Edel sei der mensch ২· Sei hilfreich und gut ৩· Sei uns ein Norbild ৪· Jener jeahneten wesan ! ৫· Muss es sein? ৬· Sicht man ihre Fahnen wehn. ৭· Sie im chor der Engel stehn. ৮· Millionen. ৯· Seid umschlungen ! Freude ! ১০· Under der Linden ১১· An der heide. ১২· Tandaradei ১৩· Mein guter kamerad !

সূচিপত্র

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সত্তর বছরে

যাঁকে চেনা মনের একটি জয়,
মানবিক বড় অভিজ্ঞতা।
আশ্চর্য সে মন, ব্যাপ্তি যার সর্বদিকে,
শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সংগীতে, অথচ
প্রত্যহের জীবনসম্ভোগে—এমন কি জর্দাপানে,
ধূমপানেও কিংবা ধূমপান ছেড়ে! অসামান্যে সাধারণ।

এ মনের বিপরীত মামুলি বিজ্ঞতা ;
এ প্রাজ্ঞের জগতে যা স্থান তার যোগ্য বিশেষজ্ঞ
মাহাত্ম্যের কেল্লা নেই, অবারিত দ্বার।
মানের ভারিক্কি আত্মপ্রীতি নেই, উদাস উদার ;
সরকারি বা সাংবাদিক জেল্লা নেই,
নেই দুনিয়ার কিছু বা কাউকে বর্জনের নীতি।
সকল বিষয় আর মানুষের নির্বিশেষ সন্ন্যস্ত সম্প্রীতি,
প্রথম বাঙালি এই বিশ্বমানবের বক্ষে কেউ কিছু নয় ব্রাত্য।

কৌতূহল অন্তহীন, দুর্গম শূন্যের তত্ত্বে
তথা নিরপেক্ষ দৈনন্দিনে
জিজ্ঞাসা প্রখর সদা জ্ঞানে জ্ঞানে।
জানিনা এ অতি-মস্তিষ্কের জটিলতা
কোথায় পেয়েছে তার আত্মভোলা, বেহিসাবী,
নির্বিকার, সাত্ত্বিক প্রসাদ।
অথচ হৃদয়বত্তা এখানে দুর্লভ কি নির্বোধ কিবা মূর্খে,
এখানে যে দিন যায় সস্তা বেচে কিনে সফলে বিফলে
প্রতিদিন একই রসাতলে,
তাই আমাদের আজন্ম উদ্‌ভ্রান্ত অবসাদ, কূট ঘৃণা, লুব্ধ দুঃশীলতা।
আমাদেরই কলকাতায় এ জাতক আশৈশব প্রতিভায় অগ্নিময়,

সত্তরের জন্মদিনে তাই জরা শুধু কেশাগ্রেই ক্ষান্ত
অমর্ত্য শিশুর শতায়ুই খুব স্বাভাবিক ॥

১৯৬৪

একি এ মৃত্যুর আলো

একি এ মৃত্যুর আলো ? জ্যোৎস্নারাতে কলুষের গ্লানি।
ভয় পাও ? মানবিক মন চায় মৌলিক সত্তার
কলুষিত মধ্যরাত্রি ? নাকি চায় প্রাগুষার শান্তি ?

শান্তি কি কেবলমাত্র জীবনমৃত্যুর ঘোলা ক্লান্তি ?
দীর্ঘ ইতিহাস তবে শুধুমাত্র হৃদয়বত্তার
আর মনীষার অতিকায় প্রেত ? শুধু প্রত্নপ্রাণী ?

আলো প্রায় অন্ধকার, তাও শুচি অন্ধকার নয়,
যেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, ধূর্ত পক্ষপাতে জীবন্মৃত,
গ্লানির ক্লান্তিতে পঙ্গু, মূঢ়, একা, মূলত আত্মহা।

অথচ অর্জুন চায় মনুষ্যত্বে যেন তার হয়
সম্পূর্ণতা, স্বাভাবিক দুঃখে শোকে হর্ষে সমুত্থিত,
চায় চেনা পৃথ্বী হোক্ নীলাকাশে নিত্য প্রাণবহা,

চায় প্রাণ মানবিক স্বভাবে, সুভদ্রা সর্বংসহা
পৃথিবীর মানদণ্ডে বিরাজ করুক বরাভয়।
মানুষ বা জন্তু কেবা চায় বলো সর্বস্বে প্রলয় ?
২৩ মার্চ, ১৯৭৪

নরলোকে লগ্ন সমাহূত

যে মর্ত্যে সকলে বাঁচি, সে মর্ত্যে কারা অধীশ্বর ?
আমরাই, মানুষেরা। কত শত বর্ষকাল ব্যেপে
তারাই মানুষ, তাই জানে তারা সকলে ঈশ্বর।

সে সত্য কি ধূলিসাৎ কতিপয় চোরা পদক্ষেপে ?

রংপা-র লাথিতে আর গুপ্তি-হানা হিসাবে দুহাতে
বিকাবে বিশ্বের পণ্য স্বদেশে বিদেশে কতকাল ?
সজ্জন সকলে জানে, তবু কেন যে যার গুহাতে
কেউবা গুরুজি খোঁজে, মহাশ্রমে কেউবা জঞ্জাল।

অথচ প্রকৃতি কিংবা রবিদীপ্ত স্বপ্ন গান জ্ঞান
চিরকাল যেন ঐ দুয়ারে বা বাগানে প্রস্তুত,
স্বাগত-স্বাগত ডাকে অজেয় সংলগ্ন সেই ধ্যান
পরস্পর চৈতন্যে চৈতন্যে বাঁধা, এবং বস্তুত
এক বিশ্বময় ব্যক্তিতে বিস্তৃত ; আদম্-উদ্যান
পাপ-ক্ষয়ে মুক্তি-স্নাত, নরলোকে লগ্ন সমাহূত ॥

৬ জুন, ১৯৭৪

বৃদ্ধেরও হঠাৎ বুঝি মিতা জুটে যায়

জানি না যৌবন আজ কিবা ঠিক ভাবে।
শুধু বুঝি : জ্বালা তার তীব্র,
ঝনঝনাও শুনি বুঝি
মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন কিংখাবে,
দেখি চোখ অন্ধকার তারাজ্বলা প্রেমে,
কিংবা ঘৃণাভরে দীপ্র।

পাহাড় বুঝি এ নয়, একি এক নদী ?
মাঝে মাঝে পাড় ভাঙে,
চর তোলে জলে,
টলোমলো করে বুঝি মস্‌নদ বা গদিই।
বৃদ্ধেরও হঠাৎ বুঝি মিতা জুটে যায়
চরে চরে, এই তিনপুরুষের দলে ॥

৯ জুন, ১৯৭৪

চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর

পুরাণ পড়েছে, তাই বালকটি স্বচ্ছ প্রশ্ন করে :
দাদন্দা ! এই কি প্রলয় ?
হিমালয় ডুববে কি বঙ্গোপসাগরে ?
হরগৌরী-ধোয়া জলে পাবো বলো কেমন আশ্রয় ?

বলি : ছবি আঁকো দাদা, প্রলয়ের পতন-উত্থান
আকাশ-পাতালে জোড়া, পূর্বে ও পশ্চিমে
আগ্নেয়গিরির শোনো-দেখ ওই গান,
উত্তর-দক্ষিণ-জোড়া অগ্নিঢালা হিম।

বালকটি, তুলি মুখে, ক্ষণকাল ভাবে স্থিরধীর।

আর তারপরে আচম্বিতে ক্ষিপ্র টানে টানে—
পিকাসো স্তম্ভিত হন—শতায়ুর কাছাকাছি মোড়ে,—
বালকের দৃষ্টি স্থির, মনেপ্রাণে, যেন গোটা শরীরেই,
গের্নিকার পরে,
চিত্ররূপ ধরে এই মত্ত পৃথিবীর ॥

৯ জুন, ১৯৭৪

এক লক্ষ্যে খুঁজি

কালের রথের রশি, প্রায় প্রত্যহই,
চৈতন্যের চৌরঙ্গি বা অন্ধ গলি-ঘুঁজি
এ পথে সে পথে টানি, মননে স্নায়ুতে
—প্রায় প্রত্যহই আর প্রায় সর্বত্রই।

মনে হয় সেই ভারি চাকা নিত্য বই,
টান পড়ে মাঝে মাঝে নশ্বর আয়ুতে—
বিদ্যা বলো, বুদ্ধি বলো, জীবনের পুঁজি
সব কিছু অভিনব এক লক্ষ্যে খুঁজি।

মাঝে মাঝে হাওয়া খুঁজি ? হাওয়া অন্ধকূপে ।
তখন কি মহাদেশে দম বন্ধ প্রায় ?
অথবা ড্রেনের গর্তে কটু-গন্ধ গ্যাসে
হাবুডুবু খাওয়া আর পাঁক-পচা স্তূপে
কিংবা গোটা দেশব্যাপী নর্দমার ব্যাসে
খুন বা খারাবি নয়, দৃষ্টি অন্ধ প্রায়,
সুদীর্ঘ বেঘোরে ঘোরা আর কাজ করা—

কিন্তু কিবা কাজ ? বাঁচা ? প্রাত্যহিকে মরা ?

১০ জুন, ১৯৭৪

অসম্পূর্ণ বর্তমানে

রাজেশ্বর রাওয়ের সম্মানে

না, এ ক্রূর যুদ্ধ নয়, অস্ত্রশস্ত্র বোমারুই নেই ।
এ শুধু স্থানীয় জীর্ণ প্রকৃতির মত্ত প্রতিবাদ,

আশুলোভে দুষ্টবুদ্ধি আমাদেরই অর্থাৎ স্থানীয় উঞ্ছবুদ্ধি ?
আমাদেরই কৃতকর্মফল ।
গাছপালা বন বা বাগান
সমস্তই শতবর্ষাধিক হত্যাযজ্ঞে মুমূর্ষু বিরল
জরাজীর্ণ হরিতের, মৃত্তিকার, পাথরের প্রতিবাদ—
আকাশেরই যেন এক নকসালি মেজাজ, রাগ । তাই মহাকাশ
নীলাম্বর হয়ে যায় ধূলার উন্মাদ নটনৃত্য, উদ্দাম, নিঃশ্বাসরোধী,
চোখ অন্ধ, চলৎশক্তি স্তম্ভিত, অনড় । পরমুহূর্তেই
ঝড়, ঘূর্ণিঝড় ।
আকাশের, পৃথিবীর উন্মাদ আবেগ
এই পুবে, এই বা দক্ষিণে, বায়বী ঐশানী প্রায় অষ্টদিকে,
কিংবা বুঝি আকাশপাতাল জুড়ে দুনিয়ার দশদিকেই ।
উচ্চে নিচে, পাতালে আকাশে সর্বত্র ক্রন্দসী-লোভী,
আর নিচে বেগের আবর্তে যেন বা উলূপী ক্রুদ্ধ,
অর্জুন অর্জুন ডাকে, অঝোর কান্নায় ।
তারপরে খোলো জানালাদুয়ার ।
আহা কী আরাম, শান্তি, স্তব্ধ, মোলায়েম ।

আকাশ বাতাস
যেন বা লুব্ধতা যেন উন্মত্ততা ঝেড়ে মুছে স্নাত সভ্য
শান্ত পূর্ণ মানবসমাজ।

সে মানব সে সমাজ মনেপ্রাণে দেখি দশদিকে।
স্বপ্নে ? তা বটে তো। কিন্তু ভ্রূণ বর্তমানে বাস্তবিকও বটে॥

১০ জুন, ১৯৭৪

আকাশ পৃথিবী শান্তি

১
অনেক টিলার মধ্যে হঠাৎ বালি-ধারা,
অথচ মরুর রিক্ত চেহারাই এখানে ওখানে—
যদিও প্রাচীন মরু নয়, দেড় শতাব্দী খানেক,
মানুষেরই গড়া গোবি অথবা সাহারা
—কথায় কথাই বাড়ে উৎপ্রেক্ষা পরে কত ভেক্ !
মাতা মাটিকেই হত্যা করে লোকে অজ্ঞানে সজ্ঞানে।

২
মাঝে মাঝে আঁধি অনুরাগে রাগে ক্ষ্যাপে মাটি
আকাশে বাতাসে, যেন দশভুজা মাতে।
পুবের ত্রিশূল নীলে পাহাড় উধাও ধূলা-মেঘের সংঘাতে।
নৈঋতের মেঘে-মেদুর মেদিনী মেলে দেয় তার দেহ,
পূর্ণ নারীর এলানো শরীরে সংহৃত প্রেমস্নেহ।
তাই কি খোদাই অথচ কোমল, লম্বিত, পরিপাটি ?

বৃষ্টি ? বৃষ্টি মাধুরী ছড়ায়, ধূলাগ্লানি সব ভ্রান্তি,
বস্তুতই এ পাকা জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আষাঢ়ের ক্ষান্তি
দেখ, ঘ্রাণ টানো, আকাশ পৃথিবী অবিচ্ছিন্ন শান্তি॥

১১ জুন, ১৯৭৪

আষাঢ়ের এপারে ওইপারে

প্রত্যহ এ দিনকাটাও-বাদ মুমূর্ষরি স্বাদ মুখে আনে !

ঘুমন্ত সাগরে নীলস্বপ্নোত্থিত ইউটোপিয়ায়
আর থেকে থেকে আচম্বিতে জাগরণে
যেন এক বেঘোর নৈরাশ ।

কোনো আশার সন্ধানে সামগানে যদিবা জীয়ায়
জাগ্রত সত্তার ভাষা দেহেমনে সদ্য সারস্বত লাস্যে,
পাণ্ডুর ভোরের ব্যাপ্ত লাল আলো শুচি হাস্যে
ছুঁড়ে দেয় ভাড়াকরা ঘরে আরেক সংজ্ঞাতে
আমাদের মৃত্যুহীন রৈবিক প্রভাতে ।

হয়তো কখনো—বস্তুত প্রায়ই—কারো মনে হয়
আবার সারাটা দিন সেই পাপপুণ্যক্ষয় !
আর নইলে পকেটে বা ব্যাংকে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় ।

হ্যাঁ, রোজ না হোক্, প্রায়ই প্রাণধারণের গ্লানি
ক্লান্ত করে, তাই আত্মপ্রকাশের বাণী
কণ্ঠাগত যদি হয়,—তাও ব্যর্থ নয় ।
তবু যেন সূচিকাভরণ
আজীবন আমরণ সদ্যসূর্যে আকাশে জাগায় মৃন্ময়ে চিন্ময় !

আর রবীন্দ্রনাথের স্থিতধী বিরাট দৃষ্টি
দেখা যায় চতুর্দিকে এখানে ওখানে মনে মনে,
ভুবনডাঙার মাঠে ব্যাপ্ত রৌদ্রে কোপাইতে বৃষ্টিজলে
চতুর্দিকে যথার্থই নানা মৌল শিলাইদায় শান্তিনিকেতনে,
কি উত্তর কি দক্ষিণ অয়নের এই ধীর এই ক্ষিপ্র
প্রান্তরের সূর্যোদয়ে আলাপে বিস্তারে,
শহরের ভাঙাচোরা ঘরে, সমতলে পাহাড়ে বা গ্রামে
তেপান্তরে অটল পাহাড়ে অক্লান্ত নির্ভয়
সংগীতের অন্তরস্থ ইতি-প্রত্যয়ের দেহে-মনে
এই দীপ্র এই স্নিগ্ধ দীপকে মল্লারে

আষাঢ়ের এপারে-ওপারে
বৈশাখীতে আগামী শ্রাবণে ॥

১৩ জুন, ১৯৭৪

কেন আত্মউপন্যাস ফাঁদি

তাহলে কি কিছুতেই কোনো আশা নেই ?
কি করে তা সম্ভব, জানো কি ?
যদি বলো জানাবার কিছু নেই, ভাষা নেই,—
তবে অতি মানুষের দেশে যাও, দৈত্য বা দানো কি ?

ও কথা বলাই মানে ফল্গু আশা আছে,
মনের আলস্যে শুধু যায় না তা বলা ।
কিঞ্চিৎ নাটক মাত্র, পাত্র নিজে, পাছে
অহংকারে ভেঙে যায় গলা ।

তার চেয়ে ভালো হবে, এসো কিছু কাঁদি,
মেনে নিই—এ অবমাননা ।
উপন্যাস-ও কল্পনাই, কেন আত্মউপন্যাস ফাঁদি !
তার চেয়ে বুক বেঁধে বাঁচাই ভালো না ?

১৪ জুন, ১৯৭৪

সুজলা সুফলা

শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের স্বমুখে বর্ণনা

সুজলা সুফলা সেই মলয়শীতলা ধরণীভরণী
বন্দনীয় মাতৃভূমি ঋষি (ও হাকিম) বঙ্কিমচন্দ্রের
সেই গণ-স্তোত্রগান এখনও হয়তো আনন্দের
শীর্ষ-চূড়ে কোনো সভায় স্বয়ম্ রবিঠাকুরের
সুরে সর্বাঙ্গ শিহরে অচৈতন্য শব্দব্রহ্মে ধনী
সমকণ্ঠে ওঠে সহস্রের গান, পাশের দূরের
দেহেমনে সমভাব, মৈত্রী—রাখীবন্ধনে শপথে ।

সে গান প্রাণের রন্ধ্রে, মন জাগে ধ্রুবছন্দে, গানে
ভাবের সমুদ্র থেকে ভাষা ওঠে দোঁহে একাকার,
যেমন অন্তরে দেহ জাগে, দেহে স্বপ্নের প্রয়াণে
ভাষা ওঠে সফেন চঞ্চল নৃত্যে। পরমুহূর্তে আবার
কাশীমিত্রঘাটে দেখ, যিনি ভব্য সুশোভন সদা
অসামান্য দিব্যকান্তি কবি, আমাদের ভাগ্য গণি,
নগ্নবক্ষে সদ্যস্নাত !—সুখদা বরদা দেশে, পথে ॥

১৫ জুন, ১৯৭৪

নয়নাভিরাম নীলে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া

গ্রামীণ উদ্বেগ তীব্র, মেঘ হাওয়া ছোটে প্রত্যহই,
আমজাম ঝরে যায়। কিন্তু কী বিচিত্র ঘনশ্যাম
রঙের বাহার আনে বেগের উল্লাসে
চোখের নন্দনে আর স্বেদাক্ত শরীরে
আমাদেরই বিলাসী আরাম !

শহুরের ত্বকে কিন্তু সংবেদ্যতা কই ?
কখন ? কোথায় বৃষ্টি ? মাঠখেত ভাসে
অন্তত দু'ঘণ্টা-টাক, লাঙল হাজির ধীরে ধীরে,
মৃত্যুহীন আশা জাগে,—যদি বিধি নাই হন বাম।

মেঘের ঐশ্বর্য দেখে ভিন্ লোকের ভিন্ন প্রতিক্রিয়া,
কারো পেশি তৈরি হয়, কোনো যক্ষ ভাবে কোথা আয়তনয়না
ওদিকে পাহাড় যেন শ্রোণিভারাদলসশয়না,
নয়নাভিরাম নীলে কেবা যক্ষ কোথা তার প্রিয়া !
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, সুখ তাই দুখজাগানিয়া।

ভিজে হাওয়া ওঠে, নামে, ক্ষ্যাপে, ছোটে মেঘ অবিরাম।
মাঠে খেতে শোনা যায় ; বহুত বহুত আজ কাম্ ॥

১৬ জুন, ১৯৭৪

মন্ত্রী মশা'

ব্রেখটের উত্তরাধিকার মানি,
মস্ত লেখক, মানুষও বীরত্বপূর্ণ :—
সেই যে বলেন :
জেনারেল ! তোমার ঐ ট্যাংকটা জবরগাড়ি বটে,
একাই ছাতু করতে পারে
একশো মানুষকে।
কিন্তু ওর একটি দুর্বলতা ;
ওকে চালাবার জন্যে লাগে মানুষ।

মন্ত্রী মশা', তোমার হুকুমবরদার রেলগাড়ি জবর।
বাতাসের মতো জোরালো ওর ছুট, ভারও বইতে পারে
রাজধানীর হাতির চেয়ে বেশি,
কিন্তু ওর ওই একটি গলদ :
ওকে চালাতে গেলে মানুষ লাগে, মজুর লাগে।
রেললাইনে রেলগাড়ি চালায় মানুষেই।
সিদ্ধান্তের সময়টা সে ভুল করতে পারে
এলোমেলো নেতৃত্বে।
কিন্তু সে মানুষ, ও মন্ত্রী মশা' !
সেও তোমারই মতো, তোমার বাপ-ছেলের মতো
বাঁচতে চায়॥

১৬ জুন, ১৯৭৪

হাসির নেই কোনোই অধিকার

হাসির নেই কোনোই অধিকার,
অথচ তবু হাসতে হয় চোখের জলের ভয়ে
ভয় নিজেকে, যেমন কৃতদার
নিজেই হয় প্রশ্নময় যুগল-সংশয়ে।

কিংবা মিতা অথবা কমরেড়ে
সত্তা খোঁজে প্রত্যয়ের লোভে।

দেয়ালে চিড়, তখন রেড়্-এড়ে
পর্দা নামে নৈরাশ্যে ক্ষোভে।

এ দল থেকে ও দলে ভেড়ে, গড়ে,
আবার আশা ভাঙে দলীয়তায়—
চোট্ লাগে লাল ললাটে, আর পড়ে
কী নীরক্ত ছায়া স্বকীয়তায়।

আমার নেই কোনোই অধিকার,
হাসিরও নেই,—কেই বা হাসে কাকে ?
যে জঙ্গলে প্রায় সবাই শিকার,
সে বনে কোন্ হরিণ বাঘ-ডাকে ?

১৭ জুন, ১৯৭৪

সর্বত্র আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

প্রাচীন শরীরে মন আজও অবচীন,
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে হর্ষ আজ তাই দুখজাগানিয়া।
মন আজও অবিজিত, যদিও দুনিয়া
অনেকাংশে ইতর, কুটিল, অন্ধ, মূলে বুদ্ধিহীন।

তা সে এই ভূতপূর্ব রাজধানী, আমাদের এ কলকাতাই,
অথবা হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থ, পাঠান মোগল কিংবা লাট
কার্জনের কবন্ধ শখের
ইল্লিনয়াদিল্লি হোক, শত ছদ্মবেশি, স্বদেশি যখের
আর বিদেশি ভূতের লীলাক্ষেত্র, সর্বত্র, সবাই
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, কেউ বা শিকারি আর কেউ বা শিকার।

শহরে বটেই, গ্রামে দূর গ্রামান্তরে, ঝরাকাটা মরা বনে
সর্বত্র দুর্দশা স্থূল প্রকাশ্যে, গোপনে।
সর্বত্র কম বা বেশি প্রচ্ছন্নে প্রকাশ্যে জীবন্ত বিকার,
তা সে কম বা বেশিই হোক্ স্বকীয় স্বকীয়া কিংবা পর পরকীয়া।

প্রথম আষাঢ় দিনে সবাই বিরহী যক্ষ ? ওগো দুখজাগানিয়া
এসো ঘুম ভাঙানিয়া।

১৯ জুন, ১৯৭৪

এখানে জীবনমৃত্যু নাঙ্গারূপে

এখানে জীবনমৃত্যু যথার্থই অনেকটা নাঙ্গা-রূপে চলে।
বন বা বাগান দুইই মরা, মাঠ প্রান্তর উলঙ্গ।
গ্রাম্যজন বাসে গ্রাম্য, মনে-প্রাণে নকল শহুরে।
মনে ভাবে তারাও তো শহরের,—আমাদের আশাভঙ্গ
বিশতিরিশ বছর পরে তারাও ভুগবে, ঠিকা জীবিকার পথে ঘুরে ঘুরে
তিন পুরুষ শহরেরই মতো দলে দলে।

আজন্ম শহুরে লোক বয়সে যে দেখেছি প্রচুর,
শহর বস্তুত সভ্য শহর কোথায় ? শুধুই শহরতলি।
আর গ্রাম ? একপক্ষে মৃতপ্রায়, অন্যপক্ষে শহুরের দূর
সাধ আহ্লাদের লোভে হতে চায় মফস্বল শহরের গলি,
—কলকাতাও মফস্বল প্রাদেশিক রাজধানীই, সাম্রাজ্যের বলি !

অবশ্য শহরে বন্ধুবান্ধব অনেক্, নানা বয়সের,
কিছু শিল্পসাহিত্যের, কিছু রাজনীতির তীব্র মুখর সন্ধ্যায়,—
সীরিয়স বা আড্ডায় যা স্বাভাবিক ! নানান রসের
রম্য কিম্বা তিক্ত আলোচনা। আর দশটা ছটা জীবিকা-ধান্দায়,
অভ্যস্ত জীবনে একদিকে স্পষ্টতর, অন্যদিকে নানা গৌণ
আকর্ষণে কেটে যেত (শব্দটা সাহেবি !), সম্প্রতি জীবন মৌন,
আরো কষ্টকর, অভাব ও দুশ্চারিত্র্য নিত্য প্রাত্যহিকে।

বয়সে মুশ্‌কিল বড়, এগোলে বা পিছোলেও সেই চর।
জল নেই, জল যদি হয় ; তাহলে বন্যাই।
লড়ায়ে যে রুখবে, তার সদবুদ্ধি কোথায় ? কোথা অস্ত্র ?
তাই বলি সহকর্মী শোনো সবে শিবসদাগর !
জানো কি তোমার আজ নেই তিন, কোনো একটিও কন্যাই।

দুঃখের লোভের রূপ আরো সোজা আরো যে বিবস্ত্র
আকাশে বাতাসে মেঘে সূর্যে জ্যোৎস্নায় মন
তাই সহজিয়া ব্যথায় জাগর ॥

সময় খারাপ

হাওয়ায় কলুষ, জল সংক্রামে দূষিত,
খেতে অতিসার বনজঙ্গল কাটা।
ভারতরত্ন ! যতই পদ্মভূষিত
লাখে লাখে করো, দেশের কপাল ফাটা।

ইয়াংকিডুড্‌ল বলে : ‘দেব সব দুধভাত।’
বলে : ‘গোটা দেশ একাই করব ক্রোক,
শ্বেতসিংহেরা ফোঁপাক মাথায় হাত,
থেকে থেকে হোক জাপ জার্ম্যান শোক।’

অথচ নরকে গড়ে তোলা যায় স্বর্গ,
যেমন করেছে রুশেরা মনস্থির।
গৃধ্নুর মাথা কেটে দেবে শেষ খড়্গ
মানুষেরই শুভবুদ্ধি, তাই সে বীর।

হয়তো সময়বিশেষে রাস্তা তির্যক,
যেমন লেনিন সেই হেনডরস্‌নকে
ফাঁসির মঞ্চে তুলে নামালেন পঙ্কে,
যে সমর্থন অন্তে সদর্থক।

পরন্তু, সাধারণত, চক্ষুকর্ণ
খুলে রেখো : কেবা পিসিঙ্গার বা পিগ্‌সন্‌ !
হোক পশ্চিমা, হোক না শ্বেতাভবর্ণ।
সময় খারাপ, হাতে রেখো অনুবীক্ষণ ॥

শিকার সে ব্যাপক হন্যের

অবজ্ঞা ? বিরাগ ? রাগও বটে হয় মাঝে মাঝে।

কিন্তু দায়িত্ব একার নয় ; সাধারণত অন্যের,
দশের, দেশের, বিদেশেরও, কমবেশি প্রায় বিশ্বব্যাপ্ত।
মানি, এও হার বটে, স্থৈর্য যদি চ্যুত হয় ঝাঁজে,
রাগে—অনেকাংশে রাগে, যেহেতু অনেকে রপ্ত,
রপ্ত আজও প্রকাশ্যতায়। লক্ষ্য তাই অন্ত করা যত জঘন্যের।

দায় সকলেরই, সান্ত্বনাও তাই। নিশ্চয়ই, আরো অনেকের—
মোটামুটি যাকে বলে—প্রতিক্রিয়া, এরই সমগোত্র।
কিন্তু এই অনেকের বুঝি সঙ্ঘ নেই, সক্ষম সমিতি,
অন্তত এদেশে। আর এক বা কয়েক ব্যক্তি হাজার একের
ভগ্নাংশই, পূর্ণ সংখ্যা নয়। ফলে, ব্যাপ্ত হয় না প্রমিতি।

প্রকৃতিতে তাই অপচয়। আশা তবু রচে যায় স্বধর্মের নিত্য স্তোত্র।

তথাকথিত সভ্যতা বা পণ্য ব্যবসা যে নির্লজ্জ, স্বার্থে বা লোভে, বন্যের
অনেক অধম, যেহেতু অসুস্থ বন্যোত্তর, অনেকের বা একের
—অর্থাৎ নিজের বা নিজেদের, অনেকেরই।
জানি বৈকি, নিজেই যে শিকার সে ব্যাপক হন্যের ॥

২৬ জুন, ১৯৭৪

শোনা যায় সেই মানুষই

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল কি ? সারাদিন অনাবৃষ্টি,
থেকে থেকে কোথা ভিজা হাওয়া ওঠে সে কোন্ দিগন্তরে।
মনের হরিষে নিদ্রা যে হবে, সেই রিম্‌ঝিম্ কোথা !

প্রত্যহ বালি ধুলোর ঘূর্ণি ঢেকে দেয় ! এ কী রিষ্টি !
কুয়ায় ফাটল, গ্রামে গ্রামান্তে বালিঢাকা মরা সোঁতা—
আকাশ-পৃথিবী লুব্ধের মূঢ় খরায় ও বানে মরে।

এ বৈপরীত্যে আশাও পালায়, দেশি দেবদেবী বাম,
তাঁরাও শুনেছি সাম্যের সাম গান, ও পান্ প্রচুর
শুভবুদ্ধি যে দেশে পূজারী কোটি মানবিক সেই দেশে,

অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিই নিয়মের অবিরাম
নিয়ন্ত্রণের জ্ঞানে বিজ্ঞানে যে জগতে হবে দূর,
দ্বৈতাদ্বৈতে মানুষই যে গড়ে দেবতা মানববেশে।

শোনা যায় সেই মানুষই আনছে ধনুর্ভঙ্গে সীতা,
যিনি লাজে ক্ষোভে কখনও হন না মর্ত্যান্তর্হিতা ॥

২৬ জুন, ১৯৭৪

আর ভাঙে চর

এখন হওয়াই ভালো সেই বুড়ো শিবসদাগর,
নামেই যা সদাগর, বৃদ্ধ দেহে জরা।
মনেপ্রাণে যৌবনের ওরে সবুজ ওরে অবুঝ আশা!

এ পাশে ও পাশে যেন পক্ককেশ বালি
আর নানা ধরনের চড়া, কদাচিৎ জলা, বক, চখাচখি
আর শরবন, কোথাও বা ছোট বাঁকা স্রোতধারা—
সেইখানে সমুচিত চৈতন্যের বাসা।

—তিন কন্যে চরে চরে বসেন বসান
এক কন্যে হঠাৎ হঠাৎ বাপের বাড়ি যান
আদ্যিকালের অন্য দুজন বর্তমানে খাওয়ান আর খান।

তিনটে বয়সে মিলে বাঁচি বর্তমানে,
কত কি জমেছে জানি দীর্ঘকাল থেকে,
খুঁজে পাওয়াটাই শক্ত, কোথায় কি ঢেকে
রেখেছি বা রেখেছে কে, গেল কোথা, মেলে না সন্ধানে।

অথবা হঠাৎ মেলে, অসময়ে যখন সাগর
ঘুম ঠেলে জেগে ওঠে, ঢেউ তোলে, আর ভাঙে চর ॥

২৮ জুন, ১৯৭৪

অতৃপ্তি নৈর্ব্যক্তিক প্রায়

বাল্যে নাকি ছিল অন্তর্মুখ তার মন,
কৈশোরেই ব্যক্তিগতভাবে উদাসীন,
প্রথম যৌবনে নানাজ্ঞানে দ্বিধাহীন,
অকাল প্রৌঢ়ত্বে তাই ক্ষিপ্র আরোহণ !

তারপরে যত পরিণতি ছোটে তত
দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু নিত্য নিজ আবিষ্কারে
নবনব দিগন্তরে শৈশবেরই মতো
আনন্দের রূপান্তর, কখনও ধিক্কারে
শিল্পের চুম্বকের লগ্ন ঘোরে ত্রিভুবনে,
মেলায় স্বতই-ভোগী সন্ন্যাসীশ্রমণে ।

অথচ অতৃপ্ত প্রশ্ন আত্মপরে, তবে
সে জিজ্ঞাসা ব্যক্তিতেও নৈর্ব্যক্তিক প্রায় ।
তাই তার দিন-রাত্রি ঊষায় সন্ধ্যায়--
হরগৌরী, যন্ত্রণারই নন্দিত বৈভবে ॥

১ জুলাই, ১৯৭৪

কোটি কোটি জন প্রত্যেকে সৎ নেতা

আকাশে মুক্তি ! অথচ আকাশই ঘোরতর অপচেতা,
হাতে তার নানা রঙের ধনুর বাহার ।
উড়নচণ্ডী, যেন বা নিজেই সব করে পানাহার,
হেরে-যাওয়া ভাবে পৃথিবীর বুকে জেতা ।

তাই যদি হয়, এত শক্তিই ধরে যদি শত হাতে

তাহলে নিজের বিরাট শূন্যে ফাটায় না কেন বোমা !
মহাআণবিক সে বিস্ফোরণে পৃথিবী যে প্রতিলোমা,
সেই দুর্যোগে হয়তো বা হত ধ্বংস সে সংঘাতে।

কিংবা, যেহেতু মহাকাশ নয় জীব-মানুষের মর্ত্য,
বিপরীত হত : যত শয়তান পালাত বাইরে,—নরকে,
সেখানে জ্বলত যথোচিতভাবে, দুলত চরম চড়কে।
তারপরে—তারও পরে আছে নাকি ? সবেরই কি সেই শর্ত ?

জানি না সঠিক, থাক বা না-থাক, শেষ হত হারা-জেতা
বর্তমানের গোরে বা শ্মশানে, স্বদেশে কিংবা বিদেশে—
শতদেশে-দেশে উঠত বাঁচত হেসে,
খাটতও কত কোটি কোটি জন.প্রত্যেকে সৎ নেতা ॥

১১ জুলাই, ১৯৭৪

জীবনে চাও প্রাণ

তোমার মাটি দুর্মর, তাই তোমার সত্তা
হার মানে না, বাঁচে ত্রিকাল ব্যেপে।
শত্রু বন্ধু, মানবিক ও প্রাকৃতিক বা কিছু,—
আকাশে মাথা তোলার কাল, আর রেখো না নিচু
প্রাণ বিকিয়ে ধান চেওনা, দু এক পালি মেপে।
নতুন ক'রে শপথ তোলো, নিজেই তুমি কর্তা।

জল মেলে না, মিললে জোটে অসাবধান বান।
আইন বড় দুচোখ-কানা, ছেনাল সর্বনেশে।
নরসমাজ বানর নয়, শুধুই একপেশে,
মানের দায় মাথায় রাখো, জীবনে চাও প্রাণ।
বিশ পুরুষে যা করেছ আত্মভোলা হেসে,
এবার তাকে শোধন করো, স্বাধীন করো মান ॥

১৪ জুলাই, ১৯৭৪

অথচ আশাই

মানি, আজ থেকে অনেকেই, মনে হয়, মানি
ক্লান্তির মুহূর্তে, মনে আজ যেন কোনো ভাষা নেই,
জীবনের প্রাত্যহিকে আজ অনেকেরই আশা নেই।

অথচ আশাই শুনি মানবিক ধর্ম, সত্তা, বাণী।

তাহলে এ দ্বৈতে, দ্বন্দ্বে, কিবা হবে চিন্তা, অনুভূতি ?

এই দীর্ঘ সভ্যতার, জীবন-স্বপ্নের স্মৃতি শ্রুতি
যদি আজ নাই থাকে এ ভারতে, এই ভূ-ভারতে
ভূমিজ ও সত্যে সৎ ? তাহলে কি কেনা সদসতে
জীবনধারণ বা জীবিকাই পালন করাবে ভাবো ?

মড়কে না, প্রচ্ছন্নে না, পাশার সভায়, নরকের
নগ্নদাহে সমাধান চাও ! আর সেই ধর্মের বকের
মতো ওঠো অগ্নিকুণ্ডে, আর উজ্জীবনে ডোবো, নাবো ॥

১৫ জুলাই, ১৯৭৪

শহুরে গোয়ালে

শহুরে গোয়ালে, উপমায় নয়, বাস্তবে করি বাস !
গরু মোষ আর মানুষ জাতীয় কত যে আজব জীব !
পাড়ায় পাড়ায় ফালি জায়গায় ঘ্রাণে কানে সন্ত্রাস
আর যন্ত্রণা হানে সারাদিন স্ত্রীপুরুষ আর ক্লীব,

আর, বালক বা বয়স্য যুবা প্রায় তোলে হুল্লোড়,
নানা সাজে দেখ মাঝে মাঝে নানা প্রণয়ের তোড়জোড় ।
কেউবা তরল স্ফূর্তিতে মেতে ধন্য করেন ধরাতল,
কাদায় ধুলোয় এক ঘুম দিয়ে লাগান্ মদির কোন্দল !

আর, সারাদিন গৃহহীন ঘোরে খেদানো কয়েক পাল
জারজ কুকুর, খুঁজে মরে কলকাত্তাই জঞ্জাল ।

আর বস্তি. বা রাজপথে শানে গাড়িবারান্দাবাসী
সেরে যায় প্রাতঃ-নৈশ-কৃত্য। কি আসে কান্না ? হাসি ?

১৬ জুলাই, ১৯৭৪

শ্রাবণ-আকাশে

শ্রাবণ-আকাশে নানান্ মেঘের গঠন রঙ্গে
আলোর শতেক সুরসপ্তকে নয়নাভিরাম বর্ণভঙ্গে
বিরাট পটের পলকে পলকে বহুরূপী এই চিত্ররচনা
অনড় করে যে জানালার ছাদে রোয়াকে যেখানে থাকি।

কিন্তু ওরা যে নিজের ভাষায় কাঁদো কাঁদো সুরে বলে
কি যেন সেকালে বলেছেন সেই খনা !
দোহ্‌দা মাটিতে কালো গেরি কই ? এখনও যে পোড়া খাকি !
লাঙল কোথায় চলে আহা কাদা-জলে !

আত্মীয় নই, শুধু দূর মিতা। কি বলি ? এদের চোখে
চিত্র-বাহার আরেক ধারার অন্যরকম গড়ন।

সহাবস্থান প্রাণে মনে চাই,
পরন্তু নেই আপাতত সেই সহজীবন ও মরণ।
দান দাতব্যে ভূদানের রোখে
সেতু তো গড়ে না, অমিত্র থাকে অক্ষরগোনা ভাষা।

তবু উভয়েরই মুক্তি-বাঁধার একটিই আছে ধরন।
বিশ্বাস তাই ? হ্যাঁ, তাই একটি আশা।

১৯ জুলাই, ১৯৭৪

চৌদ্দ পা

আকাশ কি বাঁধা যায় সাম্রাজ্যের নব্য যন্ত্রে তন্ত্রে ?
কাছে দূরে বাহাদুর দিগ্বিজয়ী জলে শূন্যে যাও ?
কত বাঁও পার হবে ক্রন্দসীতে উচ্চাশার মন্ত্রে,
কার ছন্দে অন্তহীন নীলিমার হাওয়ায় উধাও ?

মর্ত্যে সব কিছু জানা ? হয়ে গেল মানবতা জেতা ?
নরলোকে হেরে কিংবা হারাজেতা নাই মানো, জানো
ভাবো প্রৌঢ় ঘুড়িয়াল তুমি বিশ্বে ঘড়িয়াল নেতা,
অথচ অস্থির সদা, মানুষ না, অপোগণ্ড দানো ।

তার চেয়ে নিজের পাড়ায় বোসো, করো ন্যায্যত কারবার-
চাল গম ডাল নুন তেল টুকিটাকি বা কাপড় ।
অল্পে তুষ্ট হয়ে নিজ নিজ পিঠে লাগাও চাপড়,
নিজের সীমায় বাঁচো, রেশারেশি করবে জেরবার ।

আকাশকে বৃথা চেষ্টা মুষ্টিবদ্ধ দুহাতে ঘেরবার ।
তাতে কি আমরাই হব ছোট পোকা, তুমিই মাকড় ?

রামরাজ্য গল্পকথা

দেবকিনন্দন নই, গোবর্ধন কোথায় আঙুলে ?
পূতনা হাজারে আজ যত্রতত্র ঘোরে শতরূপে ।
সামান্য মানুষ মাত্র, মন্দির না, শুধু ফুলে, ধূপে
আমরা লৌকিক জীব, দেবতা সাজাব কাকে ভুলে ?

বানরবাহিনী নই, সেতুবন্ধ সাধ্যের অতীত,
পবন-নন্দন নেই চতুর্দশপুরুষের কুলে,
যে আনবে বিশল্যকরণী, দশানন হবে ভীত !
কিন্তু সে গোঁয়ার, তাই তাকায় না বিশচোখ তুলে ।

তবে বিশশতকের আমাদের ভেঙেছে পুরাণ
এখন সম্বলমাত্র মনন ও শ্রম ও সততা
এবং মিলিত নিষ্ঠা (যে দৃষ্টান্তে ছিল হনুমান) ।

রামরাজ্য গল্পকথা, সত্য শুধু সীতা শুচিব্রতা,
পৃথিবীর সৎকন্যা, সর্বথাই করুণা মমতা।

এবং মূলত আমরা দেশে দেশে সীতারই সন্তান।

২১ জুলাই, ১৯৭৪

এ অন্ধকারে কি দেখ সুরঙ্গমা

এই আমাদের ক্লান্তি কি পাবে ক্ষমা ?
ক্ষমা কে করবে ? তারাও ক্লান্ত নয় কি ?
এমন কি যাকে জড়পিণ্ডই বলো,
মনে হয় সেই পাহাড় ঝর্ণা নদীও
ক্লান্তির দাহে ঝুরুঝুরু বালিচড়া।
পূর্ণিমা চাঁদে ও কারা জমায় অমা ?

এত নির্বোধ এতই কুটিল, যদিও
নিজেই হয়তো জানবে না গোটা আয়ুতে,
কোনোদিন চোখ করবে না ছলোছলো।
অমাবস্যা এ নির্জন ভার বয় কি ?
একক রাত্রি একযোগে ভাঙাগড়া
করবে কি নবজীবনের শুচি বায়ুতে ?

আর কি ত্রিকাল কাকেও দেবে না ক্ষমা ?
এ অন্ধকারে কি দেখ সুরঙ্গমা ?
২৫ জুলাই, ১৯৭৪

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু

বলবে কাকে : ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু ?
একালে সেই প্রভুকে দেখা শক্ত,
কারণ বুঝি শতেক প্রভুর কয়েক লাখ ভক্ত।
একালে বুঝি ক্লান্তিটাই অন্যায় ? তা হতেই পারে, তবু

তোমার আমার কয়েকজনার মানস রাবীন্দ্রিক
ভাষাই খোঁজে, যদিও সেই মহাপুরুষ একক মাহাত্ম্যে
অতুলনীয়, যেন বা অতিমানব, নৈরাত্ম্যে
স্বাধীন তিনি। একালে বুঝি কেউই নেই সেই রকম কেন্দ্রিক!

অথচ জানি—কে না জানে—গোটা মানসে, তাই উচিত কাম্য,
বিশেষ করে সাম্প্রতিক জীবনে ছন্নছাড়া—
গোটা দেশটা ছিন্নমস্তা, তোড়জোড়েরই তাড়া,
কবে শতেকে দশ মানুষ মান্‌বে শ্রমে সাম্য ॥

২ অগস্ট, ১৯৭৪

তবে তো বাস্তব হবে

সে বলে : এ কাজে কোনো লাভক্ষতি হারজিত নেই
এ কেবল কাজ কিংবা কাজ-কাজ সৃষ্টি, নেই ছুটি।
সে বলে : কাজেই খেলা জমে, দুয়ে বিপরীত নেই,
অভিন্নহৃদয় দুই মিলে গেলে তবে এক জুটি।

কলের গর্জনে আর উচ্চচূড়ে কপোত-কূজনে
ক্রমগ্রন্থি দৃঢ় থাক্—বৃহত্তর একান্নবর্তিতা
লক্ষজনে, শতজনে, দশজনে—তবেই দুজনে
অচিরেই সত্য হবে বহু প্রাজ্ঞ ভাষণ বক্তৃতা।

তবে তো বাস্তব হবে দুস্থ রুগ্ন বিবিক্ত ভুবনে
দেশে দেশে সর্বস্তরে দীর্ঘজীবী মানবিক মিতা ॥

৫ অগস্ট, ১৯৭৪

সত্য আজ লেনিনেরই

ক্ষমা নেই ? প্রাক্-নরক এই অবসাদে ?

কিবা দিন কিবা রাত্রি কিবা রবিবার
প্রত্যহই ছিন্নমস্তা, বস্তা বস্তা-ক্লান্তি
বিলি করে, ফেরি করে, ঢাকে গুপ্তি খাদে।

এ ক্লান্তির হার মানে হাজার ধিক্কার,
আত্মপর চেনা দায়, আকাশেও ভ্রান্তি।

অথচ সহ্যের শক্তি জাড্যে সীমাহীন,
তিক্ত হাস্যমুখে বলে, মানব অজেয়··
জীবশ্রেষ্ঠ বটে, কেবা তার সমকক্ষ ?

দেশেরই দুর্দিন ? সত্য। জানি পক্ষাপক্ষ।

অবশ্য সম্প্রতি মাত্রা দুস্থ, ঘৃণ্য, হেয়।
প্রায় সকলেই বলে : কী ঘোর দুর্দিন !

তাহলে ? দুর্দিন হবে কী করে সুদিন ?
চেষ্টার অসাধ্য তা কি ? শ্রেয়ই তো প্রেয় ?

সত্য আজ লেনিনেরই। অসার রুদিন্॥

৮ অগাস্ট, ১৯৭৪

প্রাত্যহিক মানবজীবন

তবুও লাবণ্যে বলো একী পূর্ণ প্রাণ !

সে যে বড় দায় নাকি মহাদায়িত্বই—
থেকে থেকে মহাশূন্যে রাত্রিদিনে মিলিত আভায়
আর রাত্রিব্যাপী লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রে বা চাঁদিনীতে
আর কখনও বা জমে যাওয়া সারারাত্রি কারফিউড় মেঘে,

যেন বা আবিশ্ব এই প্রকৃতিই রবীন্দ্রসাধনা ?
নয় সাধারণ্যে দিনগত বাস্তবেই সত্য মনোভাব ?
মৃত্তিকার দ্বৈত উভচর আরাধনা ?
শূন্যভাঙা পূর্ণে শুধু শুনি ধ্রুব গান ?
তবু শূন্য শূন্য নয়—
ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন,
একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে এসো মিলি সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

দিনগত পাপক্ষয়—পাপ কার ? যতই নিষ্ঠুর হোক
প্রাত্যহিক মৃত্যু শতবেশে
যত গ্লানি যত লজ্জা দুঃখশোক
নানা ছলে ছড়াক না আপাতত হতাহত দেশে,
তবুও মানব না গ্লানি এই হোক দেশব্যাপী রোখ,
গোটা বিশ্বে প্রকৃতিস্থ হব ব্যর্থ কান্না ছিঁড়ে হেসে।

তাই শূন্য শূন্য নয়।
তাই ব্যথাময় বাষ্পে পূর্ণ রক্তাক্ত গগন।
একা একা এ অগ্নিতে বহুলোক দীপ্তগীতে
জ্বলি জ্বালি—যদি শূন্য পূর্ণ অংশুমালী হয়,
যদি তবে সৃষ্টি তূর্ণ কথা কয়
নন্দিত ষড়্ঋতু-সমাগমে—
স্বপ্নের যা প্রকৃতই প্রাত্যহিক মানবজীবন ॥

২৬ অগাস্ট, ১৯৭৪

যেন বিশ্ব লেনিনের বিশ্ব

প্রাচী যদি প্রতীচিতে সংগীতসংগতি পায় তবে বাহুবদ্ধ,
সংগত তা হবেই তো, দুয়ে মিলে দুই নয়, রূপ পাবে বিংশতির ঘরে।

তখন কি মানুষের প্রায়-অনাদ্যন্ত সমতাবিকাশ নিতান্তই সমাজের
জৈবকাল ব্যেপে
যা দিয়েছে মানুষকে দেহভঙ্গে মনোরঙ্গে স্বতস্ফূর্ত শ্রমে ছন্দে সদ্য
কর্মের আবেগে রূপ পাবে হাতে পায়ে বুকে ঘাড়ে সর্বাঙ্গে যা ঝরে
শ্রমসংহতিতে শুদ্ধ ভৈরবী বা কানাড়া বা তোড়ী সেই হরিদাস সুরে
তানসেনি স্বরে

অথবা ঝঙ্কৃত শততন্ত্রী আলাপে বিস্তারে, উল্লাসে বা কান্না বুকে চেপে—
তখন বোঝাই যায় চৈতন্যে নিমগ্ন—কিম্বা উর্ধ্বায়িত সত্যে বিশ্ব সদা
এক বিশ্ব,
মূলতই যেন বিশ্ব লেনিনের বিশ্ব আজ জীবনের সর্বদেশে সর্বস্তরে।

ফলে, কেউই যেন দেহে মনে দুস্থ নয়, কারণ কেউই আর নেই নিঃস্ব ॥
২৯ অগাস্ট, ১৯৭৪

হয়তো বা বেঁচে যাবে

বার্ধক্যও উপভোগ্য, অন্তত বাল্য বা যৌবনের চেয়ে।
আমরাও বিলক্ষণ বুঝি, তাই বলি তোমাদের
হক্ কথাই। কিন্তু মানি ইতিহাসে কালাপানি বেয়ে,
অথবা, বরঞ্চ বলি শাদা কালো উভ-পানি খেয়ে
ডুবডুবু হয় সব কৃষ্ণ ও কাদের।

শহরে দুর্বহ দিন রাত্রি, যদি নিরুদ্দেশ হই নিঃস্ব গ্রামে,
সেখানেও অর্থমনর্থম্ হানে দৈনিক চাবুক।
অথচ নন্দনতত্ত্বে কথঞ্চিৎ পারদর্শী—সুনামে দুর্নামে,
কেউ কেউ বলে শুনি ভুল। কারণটা ? সর্বদাই বামে

দাক্ষিণ্য ঝরে না, আর যদিই-বা ঝরে, তাতে চিন্তা স্বাভাবিক।

হয়তো-বা অতলান্ত সাগরের ঝড়ে ঝড়ে বেঁচে যাবে সাহসী নাবিক॥
৩০ অগস্ট, ১৯৭৪

দৈনন্দিনে ফাঁসির চড়কে

স্বয়ং ব্রহ্মাই, দেখি, কি আর করেন! তাই ক্লান্ত, নিরুপায়!
মনস্থির করে শ্বাসরুদ্ধ করে যান উলটো প্রাণায়ামে,—
স্বগতোক্তি করলেন কি : কি আর করার আছে? পরলোকে হায়
আমি কি একটাও ঘর পাব যার দ্বারে আছে খিল?
যেখানে 'প্রবেশ নিষেধ' নোটিস দেওয়া-ও সম্ভব, সমস্ত নিখিল
যেখানে অর্গলবদ্ধ? সেই লোকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কোনোক্রমে
ঢুকে পড়তে পারবেনই না। কারণ? কারণ নগ্ন নব্য দিবালোকে,
কারণ দেবতারা সব বড় কাবু সদা অন্নজলের অভাবে
এবং শ্বাসের কষ্টে—যেহেতু বায়ুই দুষ্থ স্বর্গীয় নরকে।

কোথায় সুরাহা? ভাবো। দেখ প্রতিযোগী শত লুব্ধের স্বভাবে
কোথায় পাঁঠার পাল যায় আসে—পিছু পিছু একচক্ষু দানো।
চোখ রেখো, মাথা স্থির, পেশীও প্রস্তুত—ঠিক লগ্নে হানো।

চেরাপুনজি কাঁদে দেখ নিরশ্রু একালে বিশ্বব্যাপ্ত সাহারায়।
ওদিকে বিশ্বের কত লাখ ঝোলে, দোলেও কি দৈনন্দিনে ফাঁসির চড়কে
৩০ অগস্ট, ১৯৭৪

আসন্ন সমঝোতা

পার পাবে ভাবো পাশা খেলে খেলে?
গুপ্ত কীটের চাতুরি চেলে?
দেখো, শেষ হাতে তুমি কুপোকাৎ!
ন্যায় মাৎ করে দেবে অবহেলে!

ভুল ভাবো তুমি চার হাতে পায়ে
—কিংবা ল্যাজে ও চতুষ্পদে।
মুনাফার লোভে পশুরাও মাতে?
অজ্ঞানে মরে স্বখাত খদে?

আমরা না হয় জনসাধারণ (সাধারণ),
বাঁচা-মরা ভাবো তোমার হাতে ?
ভালোমানুষের রাগ অকারণ
ফাটে না, কিন্তু যখন রাগে
তখন যে দাহ্ বর্ষণ করে
শত্রুরা তাতে গর্তে ভাগে !

আমাদের রাগে ঘনায় একতা—
'তুচ্ছ জনতা', ভাবছ ঘরে ?
কিংবা গদিতে ? চোরা দপ্তরে ?

আসন্ন দেখ শেষ সমঝোতা ॥

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

ভুল, স্থূল, ভুল

দীর্ঘায়ু ? তা বটে,
দীর্ঘায়ুর দুঃখও বিপুল ।

অনাত্মীয় স্বার্থের চর্চায়
আমাদের সকলেরই কম-বেশি অনেক পাতক ।
লক্ষ লক্ষ অপ্রাকৃত মৃত্যুর করচায়
বাঁচা-মরা লেখে একই ভুল ।
সব কিছু সবারই খাতক—
দীর্ঘকাল ধরে তার পরম্পরা রটে, আর সর্বত্রই ঘটে

মানুষ কি খ্যাতনামা সেই দুটি পাখি ? যেন দুই জাতি ।
তাই মানো এই বিশ্ব বিস্তৃত ও বিখ্যাত পিপুল ?

একা একা খায় আর অন্যকে ঠোকরায়, গান গায়
আর মারে স্বজাতিকে ধার-করা লাথি ।
যেন শুধু তারাই স্নাতক আর দুনিয়া ইস্কুল !
আর, বাকি সব শ্মশানের চাখানায় বেঞ্চি চৌকি টুল !

ধোঁয়ায় দূষিত শতাব্দীরা তাই বুঝি মরে, ঝরে, উড়ে যায়

ইতিহাস কেন এই কলুষিত ভুল, স্থূল ভুল ?
২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

এ যাত্রার

এ যাত্রার ক্ষান্তি নেই, সেই তার এক পুরুষার্থ।

যারা এই পথ ধরে, জেনো তারা অনিবার্য ছন্দে
গূঢ় মহাকাব্যে কিংবা নাট্যে মাতে, যন্ত্রণা-আনন্দে
একাকার, যেহেতু একটিই নৃত্য—স্বার্থেও পরার্থ।

সুতরাং নাগরিক বা গ্রামীণ গ্লানির যাথার্থ্য
যা প্রায় সবার পরিচিত, প্রায় দেখি ক্ষণে ক্ষণে
নির্বিত্ত বা কোটিপতি বস্তিতে প্রাসাদে উপবনে।
সে গ্লানিও—সারথি বলেন : সাময়িক, জেনো পার্থ !

অর্থাৎ, এ যাত্রায় যে ক্ষান্তি নেই, পদাতিক বা বিহঙ্গ
যেই হই, সারাটা জীবন এক বৈপ্লবিক গতি,
ক্রমান্বয়ে রক্তস্পন্দে অশান্তিতে স্বীয় স্বপ্ন শান্তি—
শত শত অমানুষিক মানুষ, যত মূষিক দুর্মতি
খেলাক না অর্থের অনর্থে শত হস্তে ভুলভ্রান্তি।

তবু আশাভঙ্গে ক্রান্তি ক্রমান্বয়ে ভরে শত রঙ্গ ॥
১৭ অক্টোবর, ১৯৭৪

স্বখাত কাদায় মরে

বিরক্তিই ছয়প্রহর, নৈরাশ্য সর্বদা পরিহার,
প্রেমেই মানায় রাগ, চৈতন্যে জাগ্রত নটরাজ।
ঘৃণা জ্বলে ত্রিচূড়ায়, মননে যে কৈলাসবিহার।

শুধু নিজ নিজ গ্রামে বা শহরে আবিশ্ববিরাজ
স্বায়ত্তেরই আত্মদান, তা নইলে যে সব অসম্ভব—

আবাল্য চৈতন্যে জানি, তা নইলে যে অন্তিম জরায়।
সারাটা জীবন পণ্ড, মন্দাকিনী পঙ্কিল চড়ায়।

মুক্ত মনে প্রেমে মাত্র সম্ভব যে কুমারসম্ভব।

প্রেমেই বিরক্তি তীব্র, তাই ঘৃণা তাই এত ক্রোধ ;—
কোটিতে কেন যে দশ মাথা ভাবে শেষ হবে রাম !
তাদের মূষিকমন্য দাক্ষিণ্যে বা মূলত নির্বোধ
অতিলোভে—ভাষান্তরে—কার্পণ্যে বিধিই হয় বাম !
স্বখাত কাদায় মরে, অন্তেও যে মনুষ্যত্বহীন !

গতকাল কিংবা আজও না হলেও আসন্ন সে দিন ॥
৪ নভেম্বর, ১৯৭৪

আত্মজীবনীই কল্পনা যে

বালকটিকে যে ঠিক মনে আছে, তা কি করেই বা বলি ?
আত্মজীবনীই কল্পনা যে, শিল্পও যে ছলাকলা তলে তলে হয়।
মাঘের হিমেল হাওয়া ঝরায় যে বৈশাখের কলি
আমের মুকুলে গন্ধে, তাও বুঝি আত্মকল্প স্মৃতি-বিপর্যয়।

গল্পও শুনেছি বটে, শৈশবে বা বাল্যে ও কৈশোরে
কি বলেছি কি করেছি ; কিন্তু তা সবই তো ভরাট বাড়িতে
অনেকের প্রশ্রয় কাহিনী। স্নিগ্ধ সেই স্মৃতিঘোরে
ভিড়েও নিঃসঙ্গ শিশু পৌঁছে গেল মোহানার নিঃশঙ্ক* খাড়ি-তে।

অনেক প্রীতিতে আর আরেক নৈঃসঙ্গ্যে ফাঁকা দুঃসাহসী মানসিকতায়
ভীরু সে বাস্তবে ভাসা পূর্ণেশূন্যে পানকৌড়ি ডোবা আর ভাসা !
বাস্তবের স্থলে কিংবা জলে আশা আর আশারিক্ততায়
ব্যক্তিতে ও নৈর্ব্যক্তিকে নৈরাশের পারাপারে ক্ষয়হীন আশা !
১২ নভেম্বর, ১৯৭৪

*পাঠান্তর 'প্রান্তিক'।

একালে দেয়ালিরও বাহার কম

একালে দেয়ালিরও বাহার কম,
বাহার খেলো আর বহর বেশি,
খরচা প্রবল, তবে অনির্দিষ্ট
প্রতিটি বছরেই এবং রেষারেষি,
সব ব্যাপারেই ইষ্টানিষ্ট।
দিয়েগো গার্থিয়া যেমন পরদেশি।

হারজিতের প্রকাশ তাই ছাড়ায় মাত্রা।
বিশ্বপ্রেম বুঝি ব্যবসামাত্র ?
হাওয়াই রথে কেন এ পদযাত্রা ?
শঠের শাঠ্যেই শেঠি অমাত্য
ভরায় যে পারে সেই গোপন পাত্র।
বাকিরা অর্থাৎ জনতা ব্রাত্য।

মানুষ আমরাই, আমরা স্বদেশ—
এ দেশে এবং অনেক বিদেশে।
বাইরে দেয়ালি হোক না ম্লান,
মানি না ভাগ্যকে, সে বড় একপেশে—
কেউ বা উপোসী, কারো বা সরেশ
স্ফীতোদর ! তারা জানে না গান ॥

১৫ নভেম্বর, ১৯৭৪

প্রেম এক বর্ম

নিসর্গের উচ্চাবচ সংহতির তরঙ্গে যে গতির আয়তি,
প্রহরে প্রহরে আর নিত্য নবরঙ্গে,
একাকার প্রকৃতির প্রণয় সে নন্দনে আরতি
হরগৌরী ভারতীয় মূর্তি পায় প্রাণময় সেই নটরাজের আভঙ্গে।

দৈনিক জীবনযাত্রা মানবিকে খুঁজে পায় নিজ সত্তা-গড়া ব্যূহ
—অনেকাংশে তারই সৃষ্টি কর্ম।
আর মাঝে মাঝে হয়তো বা ধসায় শিখর, আর উহ

তখনই তো পূর্ণিমার অমাবস্যা বৃত্ত গড়ে আঁকে প্রাণ দেয়
কারণ সে দ্বৈতাদ্বৈতে দ্বন্দ্বোত্তর প্রেম এক প্রাণময় বর্ম ॥
২ ডিসেম্বর, ১৯৮৪

প্রভাতের মানসের হ্রদে নীলনলিনীতে

হঠাৎ সাজেন গৌরী জবা-নেত্রী ! ত্রিলোচন নিজে তাতে ভস্ম,
মানে—প্রায় ভস্ম, অন্তে সম্বৃতই, নইলে যে একা হয়ে যান হিমকন্যা,
তাহলে যে প্রভাতের মানসের হ্রদে নীলনলিনীতে উতরোল বন্যা,
দক্ষের যজ্ঞান্তে স্বচ্ছ শুভ্রে তাই হিমানীও জাগে সূর্যস্পশ্য ।

ত্রিচক্ষুর উর্ধ্ব নেত্রে পঞ্চশর প্রত্যাহত যে প্রেম-সন্ত্রাসে,
যে প্রেম বিস্তৃত সারা বিশ্বময়—কেবা জানে তার আদি-অন্ত,
সে বিশ্বে সততা সত্য মৈত্রী সত্য বিশ্বব্যাপ্ত প্রেমের সন্ন্যাসে ।
সে বিশ্বে কোথায় পণ্য-লোভ, ক্রূর হত্যা ? সেই বিশ্বে চিরসত্য
মানসবসন্ত ॥
৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৪

তাই আশা যুক্তিযুক্ত

এ যেন বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, রচে নব্য নব্য কুরুক্ষেত্র ।
ভূগোলে ও ইতিহাসে, অস্থিসার অতীতে না, দৈনিকের
বর্তমানে, আর যেন দেখা যায় সমাসন্ন ভবিষ্যতে ।

একালের মানুষ যে, কোথায় চক্র বা কোথায় ত্রিনেত্র ?
মহাদক্ষযজ্ঞ কোথা ! জলে স্থলে ধ্বংস নৃত্য, মাভৈ মাভৈ
হে কিরাত, হে অর্জুন ! নাকি নারায়ণী সৈনিকের
পদযাত্রা শতকর্মে, নিত্য মানবীয় মনীষার কর্মে, ধর্মে
সত্যসেবী, মিথ্যা ভেদাভেদ ভেঙে মাতে কর্মব্রতে ?

বিশ্ব করে একাকার, বিশ্বে সকলেই মানব স্বধর্মে,
ফলে মিলে যায় বিজয়ার আলিঙ্গন ও যুদ্ধের হৈ হৈ ।

এ যেন বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচে নিত্য নূতন পুরাণ,
যেন নবজাতকেরা গড়ে পিতৃপুরুষের ইতিহাস ।

রেষারেষি লোভ পায় ঐ অতলান্ত কালীয় বিনাশ।

তাই আশা চেতনায় যুক্তিযুক্ত। বিংশোত্তর বিশ্বে বাঁচে প্রাণ ॥
৮ ফেব্রুআরি, ১৯৭৫

স্বয়ম্ভরের শান্তি

গোটা দেশটাই থেকে থেকে যায় ভিজে!
অথচ কেউই মুছতে পারে না জল—
অন্তত নয় সবার জন্যে। নিজে?
সঠিক জানে না কি যে হবে ফলাফল।

তারপরে কিবা বিচিত্র যদি খরা
লাখো লাখো ঘরে তোলে ফাঁকা হাহাকার,
যখন বাঁচাই হয়ে যায় প্রায় মরা,
রেডিও-তে টেপে ধরে কান্নার বাহার।

অথচ কোন্ না ত্রিশচল্লিশ শতক
এই কাঁদা, মরা, তবুও অবাক! বাঁচা
কিছুতে থামে না, খালি শুধে যায় রাজার বেণের খাতক,
কিছুতে ভাঙে না পাতকের সোনা খাঁচা।

কি বলো? এবার ভাঙবে কি? না, না আণবিকে
খাঁচা ভাঙা ছাড়ো, ওতে কোথা হবে ক্ষান্তি?
গৌণকে কেন মুখ্যে চাপাবে মানবিকে?
মানুষ তো চায় স্বয়ম্ভরের শান্তি ॥
১৭ ফেব্রুআরি, ১৯৭৫

একটি সরল প্রশ্ন

ত্রয়োদশীর চাঁদ চলে মাঠে ও পাহাড়ে
কুঁড়ে ও কোঠাতে বাগানে হৃদয়ে।
বিদেশে শুনি চাঁদ এনেছে দখলে
মানুষ না হোক, তবু আসলে নকলে।

মানবজীবন নয় বিদেশবিজয়ে—
বাহা রে ! আহা রে ! কম্‌লি না ছাড়ে ।

দিনের কাজে সাঁঝে কম্‌লিদের দেখি,
তখন মানি মনে হয়তো মুখেও বা—
কোথাও আছে এক কুটিল গোলযোগ !
দু দশ টাকা ফেলে কুড়ায় তোবা তোবা !
যদিও সমাধান পায় না দুর্ভোগ—
আচ্ছা সবটাই শ্রেণীবৈষম্যে কি ?
২২ ফেব্রুআরি, ১৯৭৫

যখন বলেন তিক্তসুরে

আত্মীয়বন্ধুরা আর অনাত্মীয় ভদ্রলোকেরাও
যখন বলেন তিক্ত সুরে : এই শহর বা গ্রামে
দীনদুখীজন সব ইদানীং লোভী ও অসৎ !
কারণ আমরাই বাবু, হয়তো বা নিমচাঁদী ভাষ্যে
বাব্বীও—অর্থাৎ মহিলারা, আমরাই সৎ ও মহৎ,
তখনও কপালজোরে দুস্থেরা তো করে না ঘেরাও—
কারণ ? কপালজোরে আমরাই যে জন্ম-ভাগ্যবান,
কারণ আমরাই শুধু ভদ্রলোক স্বনামে বেনামে
কলকাতায় মফস্বলে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে,
সচ্ছলতা সকলের নাই থাক, বাবু বটে হাস্যে লাস্যে ।

সাহেবী যুগের কিংবা আরো আগে নবাবী দিনের
আমরাই গরিবী ছেড়ে চাকুরির নির্বিঘ্ন কল্যাণে
কেউবা বাগিয়ে বসি জমি—জোতদারি, হাতটানে
ভদ্রলোক আছি আজও এই মর্ত্যে যে ভাগ্যহীনের
পালের কল্যাণে তারা, শ্রমিকেরা বেঁচে থাক্, থাক্, আহা বেচারারা !
নিন্দনীয় হয় শুধু যেই ভাবে তারা সর্বহারা !
সুতরাং—সুতরাং কিবা বলি, রাগ মনে প্রাণে
কোথা সে দাপট গেল আমাদেরই দীনহীন গানে ?
২২ ফেব্রুআরি, ১৯৭৫

কেন স্বস্ব তন্ত্রে থামে

এ জীবনে বহু খরা, নইলে প্রচণ্ড বন্যা ! এ জীবনে কেউ পঙ্গু অতিভোজে,
আবার সংখ্যায় বহু মানুষের অর্ধাহার কিংবা অনাহার কিংবা রাস্তায় আহার,
কারো কারো দৃষ্টি স্বচ্ছ, কে ভালো কে মন্দ মনে বোঝে,
তবে তারা স্থাণু, তারা যেন বা অক্ষম বৈঠকে মিটিঙে বসে খোঁজে
কি সুরাহা, আর ভাবে কোন্ দেশে মুক্ত হাওয়া, উদয়াস্তে প্রাণের বাহার !

আমাদের চিরাভ্যস্ত কলকাতায় উদয়াস্তে সূর্যও হাঁপায়
হাওয়ায় কলুষ, আর জলে স্থলে ? সর্বত্রই লোভে পাপ তথৈবচ,
অধিকন্তু অতিভিড়, নানা পরিকল্পনায় দুর্গতির ভিড়কে ফাঁপায় ।
তবু সেই চিরচেনা, যেন কোনো আজন্ম বান্ধবী দেবযানী তার কচ
খোঁজে, কিন্তু কোথা ? তার সর্বাঙ্গে চৈতন্যে কলকাতার কর্কশ ক্রকচ ।

এবং শহরতলি কিংবা স্ফীত মফস্বল শহরে বা শোকাতুরা পলাতক গ্রামে
একই সে অস্বাস্থ্য—কি শরীরে কি চৈতন্যে, যেন কোনো মন নেই,
ভাষা নেই ।
তাই আশার সময়ে হয়তো বা নিজেকেই বেচে কিনে কারো কারো মনে হয়
কোনো আশা নেই !
মনে হয় শিল্প কাব্য গান প্রত্যঙ্গের জীবনে সৌন্দর্য যেন শুধু আলো
জাগে সন্ধ্যা নামে ।
—কোথা জাগে, কত দূরে ? কোথা অতি লোভে মত্ত কুরুক্ষেত্র নেই
লুব্ধ পাশা নেই ?
কোথা সেই ঐক্যতান ? কেন ভলগা কেন লেনা কেন গঙ্গাপদ্মা
আজও স্বস্ব তন্ত্রে থামে ?

২৮ ফেব্রুআরি, ১৯৭৫

আহা ! তখনই তো শিল্প মুক্ত

তাই বটে, অভ্যাসের প্রায় দাস । ধরেছ প্রায়শঃ ঠিক,
যেখানে সকলে দাস, অভ্যাসে বা অভ্যস্ত অভাবে ।

মানুষ এখনও বুঝি স্বয়ং সত্তার স্বাধীন স্বভাবে
সম্পূর্ণতা সংগ্রহে অক্ষম । তাই চায় কাব্যও সটীক ।

তাই তাকায় এ ওর মুখে। হেতু ? সম্বন্ধ-সম্পাত
আজও যে মানবমনে, জীবনেও বিচ্ছিন্নের রাশিফল !

অথচ মনন চায় বিদগ্ধ সভ্যতা নিষ্কম্প-নিবাত,
চায় এই অনিকেত অসম্পূর্ণ সমাজের এ শিকল
ছিন্ন হোক সত্তা চায় খণ্ডিত মনের গ্লানি, এ কলুষ
দীর্ণ, চূর্ণ ফেলে দিক অতলান্ত নীল ভঙ্গিল তরঙ্গে।

আর, বিশ্বের মানবলোক সংহৃত করবে তার পেলব-পরুষ
—স্বার্থে আর স্বার্থের উত্তীর্ণ অর্থে ; সৌন্দর্যে ত্রিভঙ্গে
এক বিশ্বে মন হবে শৃঙ্খলবিচ্ছিন্ন অখণ্ড সংগীত।

আহা ! তখনই তো শিল্প মুক্ত, শিল্পীগণ যোগীজনোচিত ॥
১২ মার্চ, ১৯৭৫

কারয়েল্

লোহাজং টিলা ত্বরিতে উৎরে, লালমাটি মেখে পায়ে
পাহাড়তলির হাট থেকে ফেরে, যাবে শালবনি গাঁয়ে।
লাল পাড় বুনে লাল হল তাঁত, ওকি খুশি দম্পতি ?
তাদেরই সন্ধ্যা তাদেরই আকাশ রাঙায় অতনুরতি।

পাহাড়তলির তুঙ্গ ত্রিচূড় বাবুডিতে তিন-মাথা,
পাশের গ্রামের সংসারে যেন ত্রিবিধ ঐক্যে গাঁথা।
জামরুয়া ফেরে কৃষাণ-কৃষাণী, ফসল-পাকানো গতি,
তাদেরই সন্ধ্যা তাদেরই আকাশ রাঙায় অতনুরতি।

এই নিসর্গ আমাদের বাঁধে সাধারণ্যের গানে,
তোমার ঘরোয়া সংহৃতি দাও সন্ধ্যার সম্মানে—
কেবা তাঁতি চাষি কেইবা মজুর একাকার সম্প্রতি,
তাদেরই সন্ধ্যা তাদেরই আকাশ রাঙায় অতনুরতি ॥
১৯৪৮

কলকাতায় লোকসভার প্রথম নির্বাচনের পরে

মানুষের কৌতূহল অনেক রকম, পথে পথে ঘোরে,
খুঁজে ফেরে নির্বাচনী ইস্তাহার :
পাঁচ বছর আগের
দেয়ালে দেয়ালে খোঁজে ঘোর মনোযোগে
পাঁচটি বছর আগে সেবারের ইস্তাহার।
বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কালে
দেয়ালে দেয়ালে কোথায় সে হাজার হাজার
ইস্তাহার !
কাগজ কোথায় ঝরে ওড়ে পড়ে
চুনকামে মুছে যায়, পাঁচটি বছরে
কত সাধ কত আশা কত না নৈরাশ ঘুচে যায় !
সময় তো কম নয় পাঁচটি বছর—
সেদিনের সদ্যোজাত আজ কত কথা জানে
হাঁটে, কিন্ডের-বাগানে লেখাপড়া শেখে।

কয় বছর আগের নির্বাচনী ইস্তাহারে
খুঁজে ফেরে খেয়ালি লোকটি পূর্বাপর সত্যের প্রস্তুতি,
উদাসীন মাসে বসন্তবাহার যবে শোনা যায়
পথে পথে শিমুলে কিংশুকে।
কারণ প্রকৃতি তার সত্যবাদী প্রাণের কৌতুকে
পাতা ফুল পরাগ ওড়ায়, আর লিখে যায় প্রতিশ্রুতি
নতুন নতুন অন্তহীন জীবন বিস্তারে ॥

কান্নাহাসির ইতিহাস থেকে কয়েকটি ছড়া

দিল্লী যাত্রা

হায় দুয়োরানি ! এই কি কপালে মিলল ছলে !
সুয়োরানি শেষে বেগেবউ দিয়ে করলে মাৎ,
কাশ্মীরি চালে লুফে নিলে বালখিল্যদলে !
দেখ দুয়োরানি, সুয়োরানি চলে রাজপ্রাসাদ।

দক্ষিণে বামে

বুরিদানী গাধা মরেছে দাঁড়িয়ে, শুনেছি বটে।
দক্ষিণেবামে একী টানাটানি! হয় নাকাল,
ডিগবাজি খায়, ভিরমি লাগায়, খবর রটে,
ছেলেরা পালায়, বেহুঁশ নহুষ দেশের দুলাল।

পুবে বুল্‌বুল্

"সাত ভাই চম্পা, জাগো রে!
কেন বোন পারুল, ডাকো রে?"
"বাংলার মেয়ে আমি, পুবে বুল্‌বুল্—"
"সত্যের রাজকোর্টে ভাঙবে সে ভুল।"

জয়ের প্রকাশ

জয়ের প্রকাশ এই যদি হয়,
দেশে ঘোর দুর্যোগ, নারায়ণ!
এতে মার্কস-কে ধরবে অক্ষয়
স্বর্গে অনিদ্রারোগ, নারায়ণ।

কত ভাই

বুলাভাই, ভল্লভাই শালাভাই, আর
পাত্তাভাই তাই তাই নাচে বারবার :
এদিকে করেছে বটে সকলই পাচার,
বলে : মামাবাড়ি বাছা হবেন নাচার ॥

১৯৩৭

জানোয়ারির কাহিনী

(১)

ছোট ছেলে নাচে ধেই ধেই, বলে : 'ছেলেমানুষ!'
বলে নেচে নেচে : 'চারবছর কি পাঁচবছর।'
বলে : 'নেচে চাই ইয়াংকিডুডল, চাই ফানুস,
পেলে বেঁচে যাই চারবছর কি পাঁচবছর।'

'দুর্ভিক্ষের স্লোগান বুঝি না দুর্মূল্যেও
জোগান কমে না, ধেই ধেই আমি ছেলেমানুষ !'
বলে : 'পচা চাল খাই-নেকো, সেই রব তুললেও
আমার কানে তা যায় না এলে বা বেলে মানুষ ।

'পাঁচটি বছর যদি পাই আমি হব বড়ো,
হাড়ের পাহাড়ে কান্নার কড়ি করি জড়ো ।'
পাঁচ বছরে বা চার বছরেই এই প্রতাপ !
ন-দশে না জানি কি হবেরে ভাই ! বাপ্‌রে বাপ্‌ ।

(২)

পার্লামেন্ট্ কোথায় সেই টেম্‌স নদীর ধারে,
আবার দেখ কুরুক্ষেত্রে এই যমুনার পারে ।
বোল্‌স্‌-সাহেবের কোলাকুলি, কত না সং দেশে,
কংগ্রেস তো ওয়াশিংটনে, আবার কংগ্রেসে !
রামরাজ্য-সভায় জনগণ দেখে যা ম্যাজিক !
বাবু সাজেন কৃষক প্রজা, নিদারুণ সামাজিক ।

(৩)

এত নাক উঁচু, গলাই যায় না শোনা,
স্বতন্ত্র চুলে পালক যায় না গোনা,
নিজবাসভূমে পরবাসী, সদা চাল,
আকাশের ছাদে ভাঙবে তার কপাল ।

(৪)

কুবের আলয় ছাড়ি, উত্তরে আমার বাড়ি
ছিনু শিবঠাকুরের ষাঁড়,
আমাকে আনল কিনে কোনো অপরাধ বিনে,
কোথায় রে কৈলাস পাহাড় !
বড়বাজারের গলি, অসহায় বসি, চলি,
বেঁধে দিলে কোথা থেকে জোড় :
কাস্তে দিয়ে যদি দড়ি কাটো তবে কেটে পড়ি
এক ছুটে লালবাজার মোড় ॥
১৯৫২

বামেতর

বামেই হেলেন দেবী, দাক্ষিণ্যের সুসাম্যে সর্বদা
বামে তাঁর পক্ষপাত, জীবধাত্রী বাগ্‌দেবী বরদা
ত্রিনয়নী ভ্রূকুটিতে মারেন সরোষে বামেতরে।
অবশ্য বোঝে না মূর্খ বামেতর কখন সে মরে॥

এলার্জি

অবাক সবাই ভাবি কী অধ্যবসায়,
বাক্‌দেবীকে করে দিলে মুমূর্ষু মশায়!
কীর্তিনাশা লেখা ছাপে কীর্তির আর্‌জিতে,
জানে না বাক্‌দেবীর দুস্থ তারই এলার্জিতে॥

স্বাধীন সংস্কৃতি

কোথা পুত্তলিকা ? ভোজবাজিতে কঙ্কাল
দিকে দিকে সংস্কৃতির সাজে দ্বারপাল।
শিল্পী সাহিত্যিক সব পাপোশে বাহিরে।
সরস্বতী কেঁদে যান : ত্রাহিরে ত্রাহিরে॥

পাঁচসিকে

সিদ্ধান্ত যেই না হল, বিরাট দপ্তর
খোলা হল, দপ্তরিও ষাট কি সত্তর,
লক্ষ লক্ষ টাকা গেল এদিকে ওদিকে,
অধিকর্তা ডিম দেন কুল্লে পাঁচ সিকে॥

পেনসন্‌

এ চাকুরি ও চাকুরি, তবু কর্তা কন :
মাহিনার পরিবর্তে চাই না পেনসন্‌।
শুনেছি বেকার সবে পরলোকে স্বর্গে।
কর্তার নরকে লোভ—কমপক্ষে মর্গে॥

জমিদারিলোপ

আদিতে লেঠেল বংশ, দুপুরুষে গণ্ডেরিয়া-রাজ,
পিতাকে সভ্যতা দিলে হাজারি সুন্দরী মমতাজ ।
বহু জমি বেচে দিয়ে সম্প্রতি ভূদানে দেন খোয়া
লক্ষ বিঘা, তারপরে হন বুঝি শেয়ারে বুর্জোয়া !

Quantity Changing into Quality

গরিবেই চুরি করে, তাই খায় আর পরে বটে,
নিদেন জমায় পয়সা । তাঁর নামে মিথ্যা কথা রটে
নিষ্কাম সাধক তিনি, দশকোটি টাকা ব্যবসায়,
বিশ লাখ খরচা তাঁর, বাকি সব দেশেরই সেবায় ॥

সেনরাজ

বঙ্গ ছেড়ে গেছিলেন যে লক্ষ্মণ সেন
কতকাল পরে ফের সদরে ফেরেন !
আশুলোভে তোষামোদে করে যান স্তব,
দপ্তরে গদিতে তৈলে বৈদ্যকুলোদ্ভব ॥

পুনশ্চ সেনবংশ

কেউ বলে গুপ্তরাজবংশ, কেউ সেন
—অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেন, নয় লাউসেন ।
কপোত কপোতী নন, আসেন বসেন
উচ্চবৃক্ষচূড়ে যত শকুন ও শ্যেন ॥

জানি, তবু বলব না

বাংলা কি জানি না ওরে ! চোপ খবরদার !
জানি, তবু বলব না তা ; খিদ্‌মদ্‌গার
বাবুর্চিরা ইংরাজিই বলে, ওরে পাজি !
চেষ্টার অসাধ্য নেই, বলি ইংরাজি ॥
১৯৫৫

Beware the Jabberwock, my son!

নিবাস আজব এই কলকাতা শহরে,
ফেটে ছিঁড়ে পচে আজ ওসারে ও বহরে।
মোটা রোগা নানা পেট
পায় কত শত ভেট,
বাকি যারা কেউ মারে কেউ মরে হায়রে॥
১৯৬৭

আপিসে বা বাড়িতে ঢুকো না

ট্যাশ গরু নয় ; শুধু ছোঁয়াছুঁয়ি চায় না,
আলগোছে ভালোবাসা এই তার বায়না।
সুতরাং যাও যদি আপিসে বা বাড়িতে
ঢুকো না, আলাপ কোরো নিরাপদ গাড়িতে॥

রামগরুড়ের ছানা

ধৃতরাষ্ট্র আজ রামগরুড়ের ছানা,
হাতে সে হস্তিনা নেই, মস্তি-ও যে মানা।
চোখ বুজে ভেবে যান মাথামুণ্ডুহীন,
চুইং-গম্ ছেড়ে নাকি চোষেন কুইনিন॥

তেজারতি শর্ত

লোক ভালো ? হবেও বা। কিবা তার অর্থ,
ভালো মন্দ যদি হয় তেজারতি শর্ত ?
বেচাকেনা গুপ্তি করে মনুষ্যত্ব জমে ?
অসত্য কোথায় কবে সৎ মতিভ্রমে ?

নিজে মার্কস, স্বয়ং লেনিন

অজয় বিজয় ছার ! নিজে মার্কস, স্বয়ং লেনিন
জলাতঙ্ক রোগী দেখে ঘাট হয়ে গেছে বাবা বলে
আমোদ প্রমোদ পরিহার করে দেখি যান চলে
সহিষ্ণুর রাজ্যে—কালরাত্রি হবে ভোর একদিন॥

খেল্ চলে সর্বত্র, ভাই-হে

এ তো বড় রঙ্গ ! দেখ খেল্ চলে সর্বত্র, ভাই-হে !
দিল্লি বলে, ভঙ্গবঙ্গে ধনেপ্রাণে নিহত সবাই।
পিকিং বেতারে নাকি বাবুদের করেছে জবাই।
এদিকে অমুক দেখে তমুকের তমশুকে সি-আই-এ ॥
১৭ মার্চ, ১৯৭০

ধোলাই ঝালাই

এ বলে ধোলাই দেব, ও বলে ঝালাই,
বক্ষ জাপটে থাকে প্রাণের বালাই।
চতুর্দিকে কী উদ্‌ভ্রান্তি !
কারো বা মালাই শান্তি !
পালাই পালাই বলে কানাই বলাই ॥

কোথায় এদের ডেরা

এদিকে ওদিকে কোথায় এদের ডেরা ?
দূর বর্কলিতে, মার্কিনী কেম্‌ব্রিজে
আগুন লাগায় সে-ও কি নক্‌সালেরা ?
রং ছোঁড়ে ? কপি নয়, কপ্ যায় ভিজে ?

দায়ী কে ? না, ঐ কম্যুনিস্টি

হেসেছেন সেই কবে আমাদের লীলাময় রায়—
বানে ভাসে দেশ, দায়ী কে ? না ঐ কম্যুনিস্টি !
তারাই আবার দায়ী, যদি দেশে না হয় বৃষ্টি !
—এখন সবাই নক্‌সাল বলে চারদিকে চায়।
এবারও বলুন আমাদের প্রিয় লীলাময় রায় ॥

বড়ে খান্ ছোটে খান্—১৯৭১

বড়ে খান্ দিবানিশি পাশে রাখে আয়না,
আর চোখ রাঙিয়ে সে ধমকায় নিজেকে—
কেন ছায়া তারই মতো ! কেন মুখটা বেঁকে ?
লাফায় হাঁপায় ভাঙে । অদ্ভুত বায়না ।

বলে : ওটা আরবী না উর্দু বা ফারশি,
তাই গোটা চেহারাটা ভীষণ দেখাচ্ছে !
বলে : চাই স্বতন্ত্র হত্যার আরশি—
বড়ে খান্ চেঁচাচ্ছে, খাচ্ছে ও নাচছে ।
খান্‌শাহী আরশি বা বাঙালির আয়না,
ওহে বড়ে শা'ব এক চিজ, বৃথা বায়না ।
দেখ ক্ষেপে নাচছে ও লাশ্ তুলে খাচ্ছে ।
বড়ে খান্ ছোটে খান্ হাঁকে : হম্ হায়েনা ॥

জয়ের প্রকাশ খোঁজে

এখনও কি গোটা দেশ ম'রে ম'রে বাঁচে ?
থেকে থেকে মেতে ওঠে আবার ঝিমায় ?
দুঃখের অবধি চায়, দুইহাতে যাচে ?
জয়ের প্রকাশ খোঁজে মধুর বীমায় ?
২৮ এপ্রিল, ১৯৭৪

সূচিপত্র

উত্তরে থাকো মৌন

উত্তরে তুমি সর্বদা থাকো মৌন ।

হয়তো বা ভাবো । সঠিক বলাই শক্ত ।
কেন তুমি ভাবো : এ আকৃতি শুধু যৌন ?

হতে পারে তাই । আবার মাধুরী মমতাও জেনো সত্য
কেন তুমি বাছো কোন্‌টা মুখ্য গৌণ ?
তা কি খুঁজে পাবে ? এই প্রেম অবিভক্ত ।

বিশ্বেই বাঁচে চৈতন্যের প্রণয়—
মানবিক গানে, আমাদেরই দোতারায় ।
তাই তো তোমার সঙ্গে একাত্মতায়
নামকীর্তনে আত্মদানের প্রলয় ।

আমার ঈপ্সা সদাজাগ্রত, চিরায়ুষ্মতী তন্বী !
তাই আদিকাল থেকে বাঁচি অনুরক্ত ।

তুমিই ধাতুতে হিম হৃদয়ের বহ্নি ।
তুমিই প্রাণের সত্তা, সূর্যে সত্য ॥
এপ্রিল, ১৯৭৫

দ্রষ্টব্য : 'আমার হৃদয়ে বাঁচে' গ্রন্থের অন্তর্গত "কেন তুমি ভাব" নামাঙ্কিত পাঠান্তর ।

আপাতত গ্লানির বর্ষায়

একি ক্ষয়িষ্ণুতা ? নাকি চৈতন্যেই অতিসার রোগী ?
দিনরাত্রি বিরাগ, বিতৃষ্ণা ? কদাচিৎ প্রতিবাদ ?
জানি, ব্যক্তিগত নয়, দেশ, দুনিয়াই ভুক্তভোগী,
প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষেই,—বিবিক্তিরই মানসে বিবাদ ?

নবযুবকের মুখে বোলচাল উড়োভাবে শুনি,
আধা দেশি, কিছু মিশ্র দো-আঁশলা বিদেশি বা আজগুবি ।
কত সান্ধ্য তরলতা ! (অস্তমিত আমাদের রবি ?)

উচ্চণ্ড বেসুরে কানে মনে-প্রাণে শুকনো সুরধুনী ?

এ রকম দুর্বিপাকে মাঝে মাঝে হয়তো বা ঘটে
—কোনো দৈব কারণে না, নিতান্তই মানবত্বে হেয়,
অর্থমনর্থমে ঘৃণ্য মুনাফায় মেদের সংকটে—
সত্তার কর্কটে ভোগে, ভুলে যায় কিবা শ্রেয় প্রেয়।

পরন্তু মানুষ তো, তাই জীবনেই দায়িত্ব অর্শায়—
আসন্ন শরতে, বা নবান্নে, আপাতত গ্লানির বর্ষায় ॥
৯ জুলাই, ১৯৭৫

স্বপ্ন দিনমান

তোমাকে আমি কত বছর জানি ?
জান না তা কি ? বহু দশক পার
হয়েছি, তুমি জান সে পারাবার।

ভুল হল কি ? ভূবিদ্যার ভুল !
লবণ-জল নয় তো চোখে, তার
সঙ্গে ছিল তুঙ্গ পর্বত।

ছিল সাম্য আর মৈত্রী, কতবার
বীর প্রয়াসে লক্ষ ভগীরথ
প্রাণ-গঙ্গা নামাল, দিলে প্রাণ—

তোমাকে আমি কত বছর জানি ?
লক্ষ কেন ? ষাট-কোটির গান !
তাই তো আজও শুনি সে রূপবাণী।

তুমিই জান, তোমারই সন্ধান
জাগিয়ে রাখে স্বপ্ন দিনমান ॥
জুন-জুলাই, ১৯৭৫

শ্রাবণের দৃষ্টি ঘ্রাণ প্রাণ

একি শুধু অলস নন্দনতত্ত্ব ? তা হতেও পারে বা ।
অবশ্য এখানে বাঁচা—বাঁচার লড়াই
বর্ষার আরম্ভ থেকে শরতেও মৃত্তিকার সেবা ।
হেমন্তেও জের তার, কোনোবার শ্রমের বড়াই
বাস্তবে সফল হয়, কোনোবার ন জানন্তি দেবাঃ ।

অথচ নন্দিত হই তাও সত্য । পরোক্ষে উদাস,
প্রত্যক্ষের সাধ কম । যেমন মেয়েরা, বালিকা-বালক
পিতামহ-মহী সেই মহীদাস বংশের ভূদাস,
সমর্থ চাষির সঙ্গে সহযোগী,—অত্যন্ত রোগা-রোগা
ধেনুর পালক—
ইচ্ছাটা প্রবল বাপঠাকুরদার মতো হবে লাঙল বা
গো যান-চালক ।

অবশ্য এরাও—ঠিক আমরাই যেমন,
সহজেই শহরের লোভে আনচান—
যে লোভ এ স্নিগ্ধ হাওয়া ও মেঘে-রৌদ্রে বেশ স্বচ্ছ ।
কেউ বা সিন্দুকে ঢুকি, কেউ করি প্রচ্ছন্নে চালান
অথচ স্বভাবটাই লুব্ধ, তবে অভ্যাসে গয়ং-গচ্ছ ।

তবু এই আষাঢ়ের দৃশ্যে শ্রাব্যে ভরে ওঠে
শ্রাবণের দৃষ্টি ঘ্রাণ প্রাণ ॥

২২ জুলাই, ১৯৭৫

বন-চারি

কেন বা আশ্চর্য হও ? মজুরিতে লোভ স্বাভাবিক,
যদি না মালিক হয় নিজে রাজমিস্ত্রি বা ছুতোর ।
অনেকেই আটঘণ্টা ছয় করে—তাও কী মন্থর ?
দুস্থের পরগনা দীর্ঘকাল ধরে । কাকে বলে কেবা ধিক্ ?

খড়কুটো জ্বেলে খায় একবেলা—বন কাটে তারা ?
শাল ও পলাশ বা গম্‌হার শিশু আম জাম বন ?

প্রচণ্ড খাদ্যের ঘাটতি, অধিকাংশ জন ভাগ্যহারা।
ফলে, শিশুরা অকালে দুস্থ, আর ক্ষণিক যৌবন।
মধ্যবয়সীরা তাই অকাল জরায় হয় কাবু।
অথচ শহরে দেখ বৃদ্ধ সাজে খুবই ফুলবাবু।

তবু জলমাটি ভালো, শহরে কলুষ নীলাকাশ
এখানে এখনও দেখ সভ্যতার সুযোগে দুর্যোগে
সংক্রামিত কাবু বটে, তবু আজও এদেশে দুর্ভোগে
কিছুটা আদিম স্বস্তি, কিছু স্বচ্ছ নিশ্বাসপ্রশ্বাস ॥
৩-৪ অগস্ট, ১৯৭৫

মানুষের দেশ ! স্বয়ং প্রকৃতি

মনের কোঠায় সর্বদা পূর্বে-পশ্চিমে
উদয়ে অস্তে দিগন্ত-লাল আকাশ।
দশদিক দেখে দুই চোখ ভরে অসীমে,
মর্ত্যের সীমা চোখের মণিতে, যেমন ন্যায্য প্রত্যাশ।

আজন্ম-চেনা বটে কলকাতা প্রায়শ যে শতরঙ্গ,
বিস্তৃত দেশে তাই (বা তবুও) তৃপ্তি।
যতই না আশাভঙ্গ করুক, তবুও এ রণেভঙ্গ
কেবা দেবে ? কোথা পাব এ নীলের দীপ্তি ?

কমে গেছে বটে শাল পিয়ালের অরণ্য—
বড়ো-বিদ্যায় বিশারদদেরই দায়িত্ব,
চাষ-বাস কেনা-বেচা সবেতেই জঘন্য।
তবু ভারতের রোগা মাটি দৃঢ়, হারায়নি তার স্থায়িত্ব।

তবু সজ্জনে দেখে পশ্চিম-পুব এক লালে অনন্য।
মানুষের দেশ ! প্রাচীন কীর্তি ! স্বয়ং প্রকৃতি সৌন্দর্যেও ধন্য ॥
৬ অগস্ট, ১৯৭৫

লুব্ধ পদলেহী জয়

লোভে শক্তি সর্বদা ভীষণ, ঘৃণ্য কলুষ এ কালে।

অবশ্য শক্তিই সর্বদা উত্থানে-পতনে চৌচির,—
বুঝি একমাত্র শিল্পে সাহিত্যে মননে শক্তি স্থির,
প্রেমে বা মৈত্রীতে শান্ত নম্র দৃঢ় ধ্রুপদী চৌতালে।

বুঝি মহা রাবীন্দ্রিক সব স্রষ্টা আজীবন ব্যেপে
সুন্দরকে গড়ে যান, গেয়ে যান, লিখে এঁকে যান।
তাই তাঁরা আদি অন্তে রসায়নে পান পরিত্রাণ।

শক্তিতে সর্বদা ভয়, লোভ ডোবে ভয়ংকরে খেপে।

অধিকন্তু, শক্তিধর বাজিকরও ভুলে যায় নীতি,
বিশেষত, লুব্ধতায় অর্থ, রাজ্য, ব্যাবসা, প্রভাব
ইত্যাদির লোভ আর মানবিক চূড়ান্ত অভাব।

আর তাই নৃশংসতা হয়ে ওঠে স্বভাবেরই রীতি।

পণ্যবুদ্ধি রাজশক্তি কর্দমাক্ত সর্পিল নির্দয়,
নীতি-রীতি-ভঙ্গে বীর লুব্ধ পদলেহী খোঁজে জয় ॥
২০-২৫ অগাস্ট, ১৯৭৫

ছন্দে পঁচাত্তর

দ্বান্দ্বিকের জয় পরাজয়
বৃদ্ধ হাড়ে উত্তরণহীন ?

আশা কোথা লুকোয় প্রত্যহ ?
মুক্তিযুদ্ধ কেন হয় ব্যর্থ ?
নানা স্থানে গুপ্তি অহরহ—
সত্য কেন থেকে থেকে দ্ব্যর্থ !

ভলগায় যে কয় কোটি প্রাণ
আত্মদানে জ্বালাল আহুতি,
সেই অগ্নি দধীচির দান,
মানুষেই স্বয়ং সম্ভূতি !

এই স্তরে সয় না যে আর !
দ্বন্দ্ব হোক ছন্দে পঁচাত্তর ।
ধুয়ে দাও ব্যর্থতা এবার—
প্রশ্ন হোক বর্তমানোত্তর ॥
২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

তথাকথিত সভ্য লোক

বুনোদের তো বোঝাই যায় যে বন্য—
তথাকথিত সভ্য লোক যখন সাজে শেয়াল !
কেন যে খেপে হন্যে দেয় ক্ষমতা-লোভী খেয়াল !
হিংসা আর হিংস্রতায় গ্রাম-শহর
জীর্ণ ও জঘন্য ।

অথচ আছে কয়েক দেশ,
যেখানে বাঁচে কয়েক কোটি মানুষে,
সুখসুবিধা রচনা করে মানবতারই জন্য ।
নানান জ্ঞান-ধ্যানের সত্যে শূন্যে যায় ফানুসে ।
অথচ কেন গোটা কয়েক দেশের ধারা অন্য !

সবাই চাই মরুক ওই সদলবলে শেয়াল,
নীলবর্ণ যাদের বাপ গুপ্তিতে বা প্রকাশ্যে
দুনিয়াতেই তুলতে চায় দেয়াল !
লুব্ধ দেশে হন্যে-হানা ভিন্নভাষী ভাষ্যে,—
বন্য নয়, নেহাৎ তারা নিছক জঘন্য ॥
১২-১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

তারা দিনকে রাত্রি করে

তারা দিনকে রাত্রি করে,
রাত্রিকে নরক !
তারা কী-লোভে শয়তানি করে ?
তুলে ধরে মৃত্যুর চড়ক !

এ তো নীতিকথা নয়, শুধু আত্মকথা !
লুব্ধ শক্তি চায় ! তাই হয় শত্রু ক্রূর ।
শক্তিশেল টেনে আনে, হানে যথাতথা ।

লুকায় সমস্ত গান প্রাকৃতিক মানবিক কথা ।
১৫ জানুআরি, ১৯৭৬

এখানে দুঃখও অতি সাধারণ

এখানে দুঃখও অতি সাধারণ,
হয়তো বা প্রায়ই ইতর ।
অন্যপক্ষে বাস্তবে দুঃখ
বহু গ্লানি এবং বিস্তর
সাধারণ্যে জনে জনে ভোগে
আর দেশকে ভোগায়,
আর ভাবে, যথার্থই ভাবে !
আর নিত্য দুশ্চিন্তা জোগায় !

এই তো জীবন আমাদের !
তবে কিছু আস্তিক লক্ষণ
সরকারেও অর্শেছে বটে,
মিত্রতাও করে উপার্জন ।
মনে হয় তারই ফলে
বাস্তবেও রূপান্তর ঘটে
—এই বিরাট দেশের তীব্র
মারাত্মক জীবন-সংকটে ।

মনে হয় হয়তো বা প্রত্যেকের
প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞায়
মানসে বাস্তবে হবে রূপান্তর
মৈত্রী শ্রমে, নয়কো ভিক্ষায়।
আর পোড়ো জমি পোড়া নদী
শষ্পে শ্যাম গন্ধবহ
আমাদের চৈতন্যকে উজ্জীবন
জোগাবে, কারণ অহরহ,
বহু লক্ষ মাতাপিতা
ভরেছে যে প্রাণ তার মান
স্বতই সচেষ্ট হবে!
আর বিশ্বব্যাপ্ত হবে গান ॥

১৫ জানুআরি, ১৯৭৬

প্রকৃতি অর্থাৎ পৃথিবী আকাশ হাওয়া

প্রকৃতি অর্থাৎ আকাশ হাওয়া
এ অঞ্চলে
সুস্থ আর চোখের আরামও বটে।

কিন্তু জড়, আজও ঠিক রসায়নে মানবিক নয়,
অন্তত এখনও তাই।
হয়তো বা বৈপ্লবিক রূপে রসায়নে,—
সুতরাং, রূপান্তরে
অচিরেই কোনোদিন গ্লানির সংকটে
পাবে তার দশদিকে সুস্থ কান্তি আর
দশভুজে স্থির বরাভয়।

তখন মুক্তিই হয় চিরস্থায়ী অকাল-বোধনে
মানুষের চৈতন্যের স্বচ্ছ-নীল ঘটে,
বিশ্বজনে, মহাকাশে রাবণদহনে।

কিন্তু কোথায়, কোথায়? আর কবে? কবে

জীবনের মননের স্বয়ম্ভর গানে
দেহমনে সকলের বিদগ্ধ উৎসবে ?
৭ ফেব্রুআরি ১৯৭৬

যেখানেই বাসা বাঁধো

গ্রাম গ্রামাঞ্চলে বাসা কিংবা মফস্বলে
অথবা শহরে যেখানেই বাসা বাঁধো,
সেই ক্লান্তি আর অসন্তোষ !
নানান অতৃপ্তি আর বিচ্ছিন্নতা ! শুধু কি খোরপোশ ?

অসংখ্য ক্লান্তির ভার জমে ওঠে ন্যুব্জ মনে,
যেন বহু কুবুজার শাপে ! কংসারি গল্পেই ভালো ।
এখানে যে বহুবিধ অসুবিধা নানা দ্বিধা,
দেশি ও বিদেশি, আর ওসারে বহরে ।

অনেক ইঁদুর আর শেয়ালও, নেকড়েও, কুমিরও !
এমন কী পরলোকগত শত ডাইনি
ডাইনো-টিরানো-সোরস !

অতএব ?
অতএব হে সঞ্জয় অদ্ভুত দয়ায় গৃধ্নুতায়
হে সঞ্জয় তদা নাশংসে বিজয়ায় !

পরন্তু কী করে বলো
লুটেপাটে খাবে যত লুটেরারা
যত কালীয় পূতনা আর যত কংসের বংশে ?
১৮ ফেব্রুআরি, ১৯৭৬

কাদায় ও পাঁকে কারা নড়ে

মানি, শহরে মানুষ বটে, জন্মকাল থেকে ।
ধুলো ধোঁয়া গণ্ডগোলে-সব আতিশয্যেই
নিরাপত্তা বোধ করি প্রায়াসহ্য ছাঁটা-কাঁটা জনারণ্যে

—অবশ্য অরণ্য কোথা তাও বলতে পারো ।

প্রাচীন দান্তের প্রশ্নটাই অবান্তর
—যেমন ওই নিরাপত্তা—বোধটাও তাই,
মানসিক নাগরিক, কিঞ্চিৎ অলীক ।
তবে অন্তত স্বাধীন যে তা মনে রেখো,
শ্বাসকষ্ট চক্ষুনষ্ট যত হোক, তবু ।

অভ্যাস দুর্মর এই বিচ্ছিন্নের অস্বাস্থ্যের
তথাকথিত কলকাত্তাই জীবনে, তা ঠিক ।

তাহলে কী ? নিরুপায় ?
জীবনমৃত্যু কি তিলে তিলে সত্যের পাহাড় গড়ে
আর ধূলিসাৎ হয়ে যায় অনির্দিষ্ট ঝড়ে ?
আমাদের ভূখণ্ডের কোন্ কোন্ হতভাগ্য দেশে ?

কাদায় ও পাঁকে আর মরা নদীর এসিডে কারা নড়ে ?
২৮ ফেব্রুআরি, ১৯৭৬

তবুও আছে

তখনও চাঁদ ডোবেনি তনু আকাশে,
ওদিকে ওঠে লাজুক লাল দ্যুতি ।
কলুষময় যতই হয়,—হোক না সমকাল,—
যত হাঁপাও কলকাতার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে,
স্মৃতির পুথি জমায় তত ত্বরিতগতি শ্রুতি !
জীবনটাই আমাদের যে ঊর্ণনাভ-জাল !

চেষ্টা নেই ? তা নয় ঠিক । নানান মত-প্রয়াসে
নানা মুনির শুভইচ্ছা সুসংকল্প ইত্যাদি
সদাই আছে,—অন্তত তাই এদিক-ওদিক শুনি ।

অবশ্যই আছেন বাদী এবং প্রতিবাদী,—
(কিংবা অনাবাদীই !) তাই এখনও দিন গুনি,
এখনও তাই তাকাই ওই দূরান্তরাকাশে ।

মানুষই নাকি সবার চেয়ে সহায়হীন হাসে ?
যতই হাঁকো : তৈয়ার হো কোমরবন্ধ বাঁধো,
যতই হানো নিষ্ঠীবন, যতই বকো কাঁদো—
পরিণতি কি মিথ্যা রয় ? জনতা জিজ্ঞাসে।

তবুও আছে অনেক শ্রুতি বিভূতি যার ভালে।
এবং আছে মানবস্মৃতি মৃদং-করতালে ॥
৬-৭ মার্চ, ১৯৭৬

কোথা শুনেছি হ্রেষা

ভোরাই আসত একদা সূর্যোদয়ে,
এবং রাত্রিও ছড়াত নীলিমা ঘুম।
এখন সূর্য আসে ক্লান্তি ও ভয়ে,
আঁধারে গোলমালে দিন নিঝুম।

অথচ কার লাভ ? ক্ষয় বা কাদের ?
সবার একই দশা ! কেউ বা বোঝে
কেউ বা বোঝে না, পেশা লাভের খোঁজে
নিজের আর পুত্র-কন্যাদের !

হয়তো তাও নয়, নিছক নেশা।
কল্কি যুগে নয় মস্তি সোজা !
ত্রিকালগুণে দুই চক্ষু বোজা।
বোঝাই দায়, কোথা শুনেছি হ্রেষা ॥
১২ মার্চ, ১৯৭৬

স্মৃতিচারণ বার্ধক্যে নয়

স্মৃতিচারণ বার্ধক্যে নয়, কৈশোরে বা যৌবনেই শ্রেয়
কারণ, বার্ধক্যে দগ্ধ স্বপ্ননীল আকাশকুসুম,
কারণ, তখন শুধু রোমন্থিত কল্পনায় ঘুম,
তখন অতীত আর অজ্ঞেয় আগামী থাকে প্রেয়।

পরন্তু নিঃসঙ্গ স্মৃতি ভাবীকাল ছাড়া কেন হেয়
মনে হয় ?—মুখ্য বিশ্ব, গৌণ বিনোদন যত ধুম-
ধাম হয় হোক, যত হৈহৈ হোক, যতই মরশুম—
সত্য লাগে প্রাচীন সভ্যতা সিন্ধু অথবা গাঙ্গেয়।

এ বার্ধক্য কি শুধুই জরা ? নাকি সুদীর্ঘ যৌবন
সভ্যতা ও ব্যক্তিগত স্মৃতি দুই মিলে একাকার ?

বোধহয় যা সম্ভব এ দুর্গতির দুমূর্ল্যের দেশে
তাই মেনে চোখে-কানে সত্য খুঁজে জেনে অগণন
গৌণ দুঃখে আর মৌল স্বস্তিসুখে চেষ্টায় বারবার
কান্নাতেই হাসি এনে সমতার নীলে যাব ভেসে ॥
২০ মার্চ, ১৯৭৬

বাদী নাকি প্রতিবাদী

শরীর কি বাদী ? নাকি অন্ধ প্রতিবাদী ?
ফরিয়াদি এ-মামলাও মহাবিড়ম্বনা।

মনকে তো দেখাই যায় না! সর্বদা সে ফেরারি যন্ত্রণা।
যতই না শিকারির ধূর্ত জাল ফাঁদি।
সুতরাং কি-বা করা যায় ? শুধুই বিশ্রাম ?
নাকি সতর্ক ব্যায়াম ? মননের সবল আরাম ?

অথচ দেহই ব্যাধি শাস্ত্রে বলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।
সুতরাং শয্যাই সান্ত্বনা ? ঘুমে কোথা প্রতিবাদী ?
কিন্তু বাদপ্রতিবাদ সর্বদাই এ বিশ্বজগতে—
তা সে কিবা মানবিক প্রেমে কিবা ভাগবতে!

অথচ স্বয়ম্‌সাধ্য সমাধার কোথা সম্ভাবনা ?
হার মানাই সোজাপথ ? সে পথে যাব না।

সুতরাং দেহবাদী মননের প্রতিবাদে হবে অসহায় ?
ক্লৈব্যই কি পাণ্ডু-র তৃতীয় পুত্র! কুরুর উপায় ?
২৯ মার্চ, ১৯৭৬

হাড়গোড় মাথামুণ্ডু মুড়ি মুড়কি খই

থেকে থেকে নিসর্গই ডাক দেয়,—
মানবজীবনে তাই একমাত্র স্বাভাবিক,
কী বয়সে কী-বা রোগে !
তা না হলে মৃত্যুঞ্জয় কোথায় বা নিজ সম্পূর্ণতা ?
বলো হে সঞ্জয় !

ধরন ধারণ দেখে চোখে চেটে শুনে,
আর সর্বত্রই কমবেশি ভুক্তভোগে
সবেতেই মনে হয় সকলেরই সন্দেহ সংশয় ।
কী বলো হে ? ইতরতা বিশ্বময় ?
সকলেই যে বিশ্বের একান্ত কাঙাল !

আর নির্বুদ্ধিতা অদ্ভুত ব্যাপ্তিতে ও প্রাবল্যে
শুধু মানুষকে নয়, সসাগরা পৃথিবীকে
বিষায় যে সে ওই
নির্বোধ কারণে আর হয়তো বা
ধর্মীয় ভাষার বোবা মুখে বললে বলতে হয় :

মুখ্য পাপে আমরা তোমরা সকলেই দায়ী
আব সকলেই বিশ্বরূপ ওই মুখে দেখে
আর লুব্ধ শোকে খায়
যে যেখানে পায়—হাড়গোড় মাথামুণ্ডু—
মুড়ি মুড়কি খই ॥
১২ জুন, ১৯৭৬

বিশ্বময় অন্তত অনেকখানি

মনে হয় ভেদাভেদ ভাঙে ওই—
বিশ্বময়, অন্তত অনেকখানি একাত্ম উৎসবে ।
অর্ধেক শতাব্দী গেছে—তা সে যাক স্নিগ্ধ-রুক্ষ ।

দীর্ঘ এ জীবন তাই চলেছে ও চলবেও,

স্বচ্ছতর সূর্যাবর্তে মানবিক সুখদুঃখ
এমন কি অমাবস্যা পূর্ণিমা ও রাহুর কলঙ্কে।

তবুও চলুক কর্মে এবং নন্দনে
নবনব রূপে রসায়নে সুখে দুঃখে
একমাত্র মানবিক স্মিত শর্তে,

যতই না হোক জনসংখ্যা,
আপাতদৃষ্টির বিরক্তি ও ক্লেশে
জীবনের নীরোগের সাতরঙা বহুবিধ ভোগ।

এইটুকু জেনো প্রিয়সখী, মেনো প্রিয়জনগণ!
স্মৃতি সদা বাঁচা চায়, বেঁচে পায়
শতাব্দীর মানববাস্তবে ॥
২৫ জুন, ১৯৭৬

এ দেশে মানুষ ভোগে সৎ বা অসৎ রোগে

এমন কি নীলাকাশে শুনি প্রায় চুরি চলে—
প্রায় এক জুয়াচুরি! বৃথাই ছত্রক সিক্ত ছত্রধর বলে,
এলোমেলো হাওয়া দেয় দোলা
কখনও পশ্চিমে,
কখনও বা বিপরীত পুবে সব খোলা
উত্তরে ও দক্ষিণেও, কিবা বলে ছলে।

অথচ সমস্ত অশ্রুবাষ্প যায় উবে!
আজও যে সকলই অপ্রত্যাশিত!
আজও খ্যাপা সেজে,
হয়তো বা কদাচিৎ অকস্মাৎ ঐরাবত
সামান্য সিঞ্চন করে! দেখ এ যাবৎ
মাটি ভেজে কিনা ভেজে!

এ দেশে মানুষ ভোগে
নানাবিধ দুস্থ—সৎ বা অসৎ রোগে।
আবার কেউ বা আজীবন সুস্থ বা অসুস্থ, স্বস্থ।

—অবশ্য হঠাৎ কোনো অসুখে বা আয়ুর অভাবে
ছাই হয়ে যায় ছয় ফুটে এক প্রস্থ,
জীবনেরই সহজ স্বভাবে ॥
২৬ জুন, ১৯৭৬

সকলেই পরশ পাবার প্রয়াসী

জায়গাটা গ্রাম্যই, ছিল এককালে গতানুগতিক,
দীন, শান্ত। তারপরে, কাছেই শহর।
মফস্বলে এ শহরে নানান উন্নতি-অবনতি,
স্ফীতোদর নানা দোষগুণ, লোভ লাভ, শিব ও অশিব!
গ্রাম গ্রামান্তর ভেঙে উর্ধ্বগ্রীব অষ্টাবক্র—
ঠিক গ্রাম বা নগরও নয়!
তেত্রিশটি মঠ বা আশ্রম, বিলাসী আলয়।

আর যখন-তখন যে কোন ঋতুতে—
বিশেষত চাষবাস না থাকলে সমধিক
পুণ্যের পরব! পথেঘাটে রেলপথবর্তী স্টেশনে সরাইয়ে,
কিবা গ্রীষ্মে কিবা শীতে আপদেবিপদে
চিকিৎসার উন্নতি সত্ত্বেও সে কী ভিড়
অস্বাস্থ্যের সে কী নোংরা গ্লানি!
সদালোভী পুণ্যের মরাইয়ে যত হিতাহিতে
পঞ্চ-মকারাদি পুরে ঠেসে
সিন্দুকে, এবং ব্যাংকেও বটে, জমানো নগদে!

মুখ্য গ্রাম্যতাই আশেপাশে, রাত্রিদিন
বিস্তৃত অথচ বিকল ও খঞ্জ প্রায় সংকল্পবিহীন
তীর্থে গঞ্জে স্বাস্থ্যাবাসে আশেপাশে ছড়ানো শহরে!
কিবা রাজা মানসিং অথবা ক্লাইভেরা দলে দলে
বঙ্গীয় বিজয় সেরে ওসারে বহরে
যেখানে পত্তনী পান, যার জের আজও চলে!

অথচ পাহাড় মাঠ হাওয়া ও প্রান্তর—দূর, কতদূর!
সর্বদাই কানে কানে গায়।
অথচ পত্তনী দোকানপাট-টা, আর পুণ্যের হুজুগ-যাত্রা

আজও দেখ প্রায় নিখিলভারতাগত
সব কিছু দূষিত ভঙ্গুর ।

তবুও চঞ্চল দৃষ্টি, বাঁচি, সুদূরের তবুও পিয়াসী
অনাহত স্বস্তি খুঁজি !
হে সুদূর, হে উন্মুক্ত
আমরা যে মনেপ্রাণে সকলেই পরশ পাবার প্রয়াসী ।
৩০ জুন, ১৯৭৬

অপরাজেয়ই বটে

অপরাজেয়ই বটে ! তবু অতিবৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি
হার প্রায় মাঝে মাঝে হানে ।
আর তাই মনে হয় পোড়া দেশে যত অনাসৃষ্টি !
রোগ, মৃত্যু মানবিক জীবন-সন্ধানে ।

শুধু কি স্বদেশে ?
আশে-পাশে, জাগ্রত কত না দেশে
—প্রাচ্যে নব্য আফ্রিকায়,—
এমন কি পাশ্চাত্যেও শেষে
বিশ্ববোধ শিশুকে শেখায় ।

মনে কি হয় না বলো, ধনপতি :
এ-দেশে ও-দেশে, নানা বেশে
শ্বেতাঙ্গ, শ্যামাঙ্গ, এমন কি পীতাঙ্গও দেখ শেষে
তোমাদের মেশাবে অক্লেশে ॥
৬ জুলাই, ১৯৭৬

শ্রাবণ-আকাশ ভ'রে

কেন আমাদের,—কমবেশি সকলেরই—
স্বপ্নকে কেন এ ভয়,—কী-বা রাতে কী-বা দিনে ?

স্বপ্নেই দেহের শান্তি, প্রাণের আরাম, মনের পূর্ণতা ।

চাও স্বপ্ন, চাও অন্ধকারে প্রভান্বিত ঘুম।
বর্তমান অন্ধকারে রাঙাও শূন্যতা—
(যাত্রীরা বা গৃহস্থেরা চিরকালই বর্তমান অন্ধকার জানে।)
চাও থরোথরো ভবিষ্যৎ, ঘুমে চাও জাগরণ
ক্রমান্বয়ে কর্মিষ্ঠ-মনন নিত্য স্বপ্নময়।

ভয় নেই। স্বপ্নেই তো মুক্তি, স্বয়ংবর নবজন্ম,
বাস্তবের জ্যোৎস্নাস্নাত তীব্র রূপান্তর।

দ্যাখো, দ্যাখো, শ্রাবণ-আকাশ ভ'রে ওই অন্ধকার।
প্রচ্ছন্ন শিখর মেঘে মেঘে দাবি করে
আর থেকে থেকে দেখি ভাসে নক্ষত্র-বিস্ময়।

তাই এই আলো এই কান্না দেখি শুনি,
শ্বাস টানি শ্রাবণের গানে গানে দেশজ আকাশে।
যেন বহুকাল ধরে সুরধুনী ক্ষণে ক্ষণে ছড়ায় শীকর
ধ্রুপদী মল্লারে, নির্বিশেষ শরীরে, মনেও।

অবশ্য এ দেশে। নাকি দেশে ও বিদেশে?
জুলাই, ১৯৭৬

মধ্যে যা গরম গেল

আহ্! মধ্যে যা গরম গেল! হাওয়াও অজ্ঞান!
এ ক'দিন পক্ষাহত ঝোড়ো হাওয়া, পুবে ও পশ্চিমে
আর উত্তরেও। মাঝে মাঝে দক্ষিণেও ঘেঁষা।
মেঘমাশ্রিত দুই বিস্তীর্ণ পাহাড়ে কার ধ্যান?

পার্বতীপরমেশ্বরে না, বিন্ধ্যাদির বংশধরে সীমা,
উচ্চাবচ ঊষরেই বিবিক্তির নানাবিধ নেশা।

প্রাচীন ভূখণ্ড-প্রান্ত, আদিজনগণ বেশ রিক্ত।
অথচ সততা ছিল, এমন কি কৃষিপূর্ব পাহাড়িয়াদেরও।
অবশ্য মুখ্যত ঐ অজয়ের তীরাগতদের নামে নাম।
কিছু বিত্তবান আর কিছুবা গরিব আর মধ্যবিত্ত,

সরকারি শহর আর নানান বহরে যাঁরা স্বাস্থ্যাণ্বেষী তাঁদেরও।
অবশ্যই শহরের চেয়ে ঢের ভালো শহরের কোল-ঘেঁষা গ্রাম !

যদিও এখানে ছোট-বড় চুরি মাঝে মাঝে কি আর ঘটে না ?
একা কিংবা দল বেঁধে তুচ্ছ ছড়ায় রটনা
নানান শ্রেণীর লোক, ভিন্নরুচি-নীতি রামশ্যাম !
১৫ জুলাই, ১৯৭৬

বৃষ্টির পরে বর্ষার ত্রিকূট

একাই লাজুক শিল্পী সেজান্ এঁকেছেন শতাধিক
যেন বা শৈব কেলাসিত প্রিয় পাহাড়—
কৌণিকে নীলে নানান রূপের পাহাড়কে বারবার—
সন্ত ভিক্তোয়ার্ !
(কিছুতে সে মন তৃপ্তি পায় নি সে কথাও বটে ঠিক।)

আগাইয়া তাই ভাবে : পল্ কী-বা দেখতেন ?
আর আঁকতেন কার রূপ শতবার ?

পূর্বভারতে শ্রাবণ আকাশে স্নাত শত শত শিলা
এই ত্রিকূটের প্রাচীন পাথরে নানান খোদাই চূড়ায়
আর গহ্বরে আর বিস্তারে ব্যাপ্তিতে
কোন্ না মাইল দশেক ঘিরেই ঘুরেও—
এই কাছ থেকে, এই আরো দূরে
আলোয়-ছায়ায় কঠিন পাথরে আকাশে জমাট জ্যোতিতে

দৈব নীরদে যেন পুরুষের গড়া-আঁকা ঘুরে ঘুরে !

তাই কি সেকেলে রামের সেবক
মহাবীর সেই স্বেচ্ছা-শিল্পী পবনের নন্দন
ক্ষণকাল এই নানান রঙের আলোয়-ছায়ায়
মুগ্ধ পাহাড়ে করেছিল অবতরণ,
তাৎক্ষণিকের দীর্ঘজীবী কী মায়ায়
সদ্যস্নাত কঠিন রঙিন শত কৌণিক কায়ায় ?
৩ অগাস্ট, ১৯৭৬

সাময়িকী

তুবও তো তুমি এলে, হে পূর্ণ আকাশ !
তুমি এলে এই ঘন-ঘোর-ঘটা বরষায়
সাহারায় ভেজা শ্রাবণে।
ভাবি এ ভাগ্যের গুণে ধৈর্যে ও আশায়
চাতককে ডেকে যাও অশ্রুময় ভরসায়।

জাগাও এবার তুমি, ছড়াও হে নীলকৃষ্ণ কান্তি,
শান্ত হোক দিগবিদিক মত্ত হে আকাশ !
আর মাটি স্নিগ্ধ হোক,
রুক্ষ বধূগণ সব পরিণতি পাক, সেই শুষ্ক ক্লান্তি
খুলুক নির্মোক।

আমরা যে পার্থিব, পোষ্য আমাদেরই পৃথিবীর
গ্রহশান্তি আমাদেরও চাই।
আমরা কেউ নয় পৃথার পোষণে বীর।

হে আকাশ ! জল ঢালো স্তিতধী মাটিকে,
নিয়ন্ত্রিত দেশে দেশে দশদিকে বাঁচুক সবাই ॥
৫ অগাস্ট, ১৯৭৬

চেতনায় কিছু নয় অবান্তর

দূর বাংলা সমুদ্রের হাওয়া চাই অহরহ
পাহাড়ে প্রান্তরে বনে আর সবুজ বা গেরুয়া টিলায়।
অবশ্য সঙ্গও চাই সহমর্মী নৈঃসঙ্গ্যও চাই।
চাই বৈকি সহকর্মী সমধর্মী দুঃখ-সুখ-বহ সর্বদাই।

চেয়ে যাই, পাই কি-না পাই যেখানেই থাকি।
বয়স্কের তাই তো মানায় আজন্ম-আমৃত্যু বহু স্বপ্নময়
কিবা হর্ষ কিবা কষ্ট, অন্তে হয় সবই নয়-ছয় !
যেদিকেই কান পাতি চোখ রাখি মানিই না জয় পরাজয়

বলো শুধু আত্মছলনাই ? পরন্তু যা কিছু করো
কিংবা ভাবো, অসীম এ মহাবিশ্বে শূন্যই অশেষ

দৃষ্টি বোধজ্ঞানের প্রত্যক্ষে অন্তহীন মহাকাশে কোটি কোটি দেশ,
গ্রহ্ ও নক্ষত্র আর অগণন নীহারিকা দেখ থরো থরো—

কিছু কিছু আছে মাত্র জানা-শোনা এই ছোট মর্ত্য,
তাই মাটি জল হাওয়া সমুদ্র পাহাড় প্রান্তর
আর কিছু জীব ও মানুষ চোখে কানে জ্ঞানে সত্য
চেতনায় কিছু নয় আমাদের পক্ষে অবান্তর ॥
২৩ অগাস্ট, ১৯৭৬

কোথায় সুরাহা

শহরে বা গণ্ডগ্রামে কোথায় সুরাহা ?
সর্বত্রই ছোট বড় গঞ্জমাত্র, লুব্ধ বেচা আর কেনা।
সে সারল্য ? কয়েক দশকে কাবু, চুপি চুপি সুদ আর দেনা
শুধু ব্যাংকে বা শেয়ারে নয়, নানাবিধ গুপ্তি চলে ডাহা !

কী-বা বড় কী-বা ছোট সব এক—কোটিপতি কেউ লাখপতি !
কেউবা শতেই শেষ নগ্ন লোভ অধিকাংশে চলে,
কারো অর্থোন্নতি হয়, কারো জোটে দুরন্ত দুর্গতি,
কেউবা নিষ্পিষ্ট হয় লুব্ধতার হিংস্র জগদ্দলে।

কিন্তু সে হেতু নৈরাশে নয়, দুর্মর জীবন
অপরাজেয়ই হবে সবাই অন্তত মনে প্রাণে,
মানুষের কীর্তি বহু, রচনায় নির্মাণে বিজ্ঞানে।

চৈতন্য সর্বদা তাই শতকে শতকে পুনরুজ্জীবন।
সুতরাং কেন হার মানো গ্রামে নগরে বাস্তবে বেসুরে বেতাল ?
বিপুল পৃথিবী আর মানব সভ্যতা আর নিরবধি কাল ॥
২৫ অগাস্ট, ১৯৭৬

যৎসামান্য গোষ্পদ এবারে

আজও বর্ষা এলিয়ে দিলে না তার মেঘময় বেণী।
মাঠে-খেতে জল যৎসামান্য গোষ্পদ এবারে।

বিশেষজ্ঞ স্থানীয় সবাই বলে : খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবীই।
তবু এরই মধ্যে শারদীয় আলোকের আভা
স্ফটিক ও নীলা আর চুনি
এই মেঘের সম্ভারে আর আকাশের হীরক ধারে।

অবশ্য হাওয়াও আজ পুবালির পক্ষীরাজ
সাদা জ্যোর্তিময় মেঘে ওড়ে, ভাসে, বসে নীলাকাশে—
হয়তো বা অন্যত্র সৌভাগ্য খোঁজে প্রাচুর্য-প্রত্যাশে।

আদিগন্ত স্বচ্ছ আলো শুচিস্মিত দেখা যায় পাহাড়ে পাহাড়ে
আর টিলার বাহারে।

তবু এ অঞ্চলে সংগ্রামী চৈতন্য প্রায় ক্ষীণকায়,
শুধু শ্রেণী উত্তরণ, শুধু এরা সাজের চমক চায়—
অবশ্য সবাই নয়, তবে অনেকেই, অর্ধজ্ঞানী, সিকি-বিজ্ঞ
কিছু নবনবীনের বংশ।
তাই সততাও ক্ষীণ-প্রাণ, অন্তত তা দো-আঁশলা, খিন্ন।
গ্রামীণ সমাজে আজ গ্রাম্যতাই প্রায় ছিন্নভিন্ন।

বর্ষাও কি সততায় বুঝি নেই, বৃষ্টি এতই সামান্য !

কিন্তু তবু এরই মধ্যে শরতের পুষ্পময় আভা
সাহায্যে পাঠাবে নাকি প্রাচুর্যের সত্যে ধনধান্য ?
২৭ অগাস্ট, ১৯৭৬

যে স্রোতে সর্বদা নদীর সিদ্ধি

বৃদ্ধ বয়সেই গ্লানির বৃদ্ধি !
কিন্তু সে গ্লানির অনেক মূল্য—
সারাটা জীবনের স্মৃতির ঋদ্ধি।

ইতিহাসেই মেলে ব্যক্তি-স্মৃতির তুল্য,
যে স্রোতে সর্বদা নদীর সিদ্ধি।

প্রেমের স্রোত যেন, যে স্রোত চলমান—
অতীতে যৌবন, প্রৌঢ় বোঝে না তা।
ক্রমিক পর্যায়ে কিন্তু নয় গাঁথা,
নানান পাড়ে পাড়ে বিচিত্র সেই কাঁথা,
স্মৃতির ঢেউয়ে ঢেউয়ে বৃদ্ধ বলবান।

সমস্যা তো তাই : দ্বৈতাদ্বৈতেই
সমাধি সম্ভব সারাটা জীবনে ?
কে জানে ঠিক বলো কী থাকে কার মনে ?
তবুও সান্ত্বনা সদাই তোমাতেই
সর্বদাই যেন মৃত্যু জীবনে॥
৩০ অগস্ট, ১৯৭৬

নানাবিধ কংস

এ ভূখণ্ডে শিলা-মাটি তৃষিত ঊষর,
বর্ষা বুঝি প্রায় নেই।
অন্তত এবারে বুঝি যৎসামান্যই—
এ অঞ্চলে ধনধান্য প্রায়শই প্রাচুর্যবিহীন,
মাটিও গৈরিক রিক্ত।

বর্ষা প্রায় বুঝি নেই, সব উবে যায়।
বিশেষজ্ঞ স্থানীয় লোকেরা বলে :
খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবীই—
যদিও বেশ কিছুকাল ধরে চাষপ্রথা উন্নতই,
শ্রমশক্তি সমাজ কিছুটা জাগ্রতই।

কিন্তু এরই মধ্যে শারদীয় আলোকের আভা—
স্ফটিক ও নীলা আর গেরি।
অবশ্য এখনও হাওয়া থেকে থেকে পুবালিই,
মাঝে মাঝে শাদা লঘু মেঘ নীলাকাশে
পশ্চিমের হাওয়া আর স্বচ্ছ-শ্বেত মেঘে ভাসে।

হয়তো বা এখানে সৌভাগ্য কম, মাটিও কৃপণ।
হয়তো বা অন্যত্র সৌভাগ্য বেশি প্রাচুর্য-প্রত্যাশে,
তবুও এখানে আলো স্বচ্ছশুচি পাহাড়ে আকাশে।
অথচ শ্রেণীর শুচিতাও নেই, উত্তরণ শুধু উত্তরণ!
সাজগোজ চায়—অবশ্য সবাই নয়, তবে কিনা অনেকেই-

অর্ধজ্ঞান সিকিবিজ্ঞ নবীনের বংশ!
সততই ক্ষীণপ্রায়, নিদেন তা মিশ্র, খিন্ন।
গ্রামীণ ভূখণ্ডে তাই গ্রাম্যতাও আজ ছিন্নভিন্ন,
বর্ষা প্রায় সততায় বুঝি আর নেই।
অধিকাংশ মনেপ্রাণে নানাবিধ কংস ॥

২৮ অক্টোবর, ১৯৭৬

(তুলনীয়, এ গ্রন্থের "যৎসামান্য গোষ্পদ এবারে" কবিতা)

কোথায় তার সারথি

শুধু সেকালেই স্বর্ণ যুগ? পিতৃপুরুষেরাও
সর্বদা কি পরিতৃপ্তি পেতেন সেইকালে?
স্মৃতির কোলে গড়াগড়ি বিকাল থেকে সকালে
দিতেন বুঝি, তারপরেই সাঁঝ আঁধারে ঘেরাও?

তারপরেও কি শান্তি পেতেন ত্রিকালে?

একালে নাকি বহুত সোনা? তাই কি মাতে বাদলে?
জটিল বটে, কুটিলও বটে জন্মদাতা পুরুষ,
নারীও বটে। ব্যক্তি ছার, সমাজই নেই আদলে।

বোঝাই দায় কেবা মানুষ, কেই বা কাপুরুষ?
সবাই পোড়ে রৌদ্রদাহে কিংবা বাদলে।

মানব বটে—এ কাল বড় জটিল আর দুষ্ট!
প্রায়ই করে বুদ্ধিলোপ অর্থ আর স্বার্থ,
যতই পাক খেতাবে আর সাংবাদিক কেতাবে—

চতুরালির কুরুক্ষেত্রে কোথায় বলো পার্থ ?

কোথায় তার সারথি ? কোথা চক্র তার রুষ্ট ?
১ ডিসেম্বর, ১৯৭৬

বৈকালী

অধীর, তোমার মুখর দিন
ক্ষান্ত করো,
মূকবধির নীল আঁধারে
শান্ত করো ! হে চঞ্চল !

ধূসর ধূধূ শহর ডাকে
হাজারে ডাকে
ভিড়ের হাঁকে, টাকার হাটে
কাজের ডাকে,

প্রখর তাপে অণুরা কাঁপে
রৌদ্র দাহে
দু'চোখ জ্বলে, হৃদয় চলে
লু-প্রবাহে, হে চঞ্চল !

এ অঙ্গার ছেড়ে হৃদয়
আঁধার হোক,
লোকমতের সদসতের
হাজার লোক,

বেকারই ভালো, বাজার ছাড়ো,
আদিম রাতে
নিবাতনিষ্কম্প মন,
ঘুমের হাতে,

পাহাড়ঘেঁষা ঝিল্লিবনে
সঙ্গী নেই,

মনের জ্বালা বীরজনের
ভঙ্গি নেই,

বুনোঘাসের গন্ধে ভেজা
অচঞ্চল
গোপন নীলে জীবন খোলে
চিরায়ু দল, হে চঞ্চল !
১৯৩৪ বা ১৯৩৫

এলিঅটের পদাঙ্কে

১

মিস্ নেলি কাপ্রু
চলেছেন পাহাড় পেরিয়ে পাহাড় মাড়িয়ে উড়িয়ে,
ঘোড়া ছোটাচ্ছেন এ পাহাড় ও পাহাড় পেরিয়ে গুঁড়িয়ে
ঊষর জৈন গিরির এ পাহাড় ও পাহাড়—
ছুটিয়ে যাচ্ছেন শিকারি কুকুর লেলিয়ে তাড়িয়ে
গো-মেষ-চারণ-ভূমি মাড়িয়ে পেরিয়ে।

মিস্ নেলি কাপ্রু ধোঁয়াও টানেন
এবং নাচেন কিছু কিছু নব্যনাচ।
আর তার পিসিরা নিশ্চিন্ত নন সে বিষয়ে কী তাঁদের মতামত,
কিন্তু এটুকু তাঁরাও জানেন যে ব্যাপারটা নব্য বটে।

কাচমোড়া তাকে সমানে পাহারা দিয়ে যান
গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, আস্তিক্যের দুই দিক্‌পাল,
অপরিবর্তনীয় নিয়মধর্মের বাহিনী সাজিয়ে ॥

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ! তার নিয়মিত পাঠক পাঠিকা
বাতাসে দোলেন পাকা ফসলের খেতের মতন ।

গোধূলি যখন কাঁপে মৃদুমৃদু-প্রাণ-স্পন্দে বারগান্‌ডার পথে
কারো কারো জীবনের পিপাসা জাগিয়ে
কারো কাছে এনে দিয়ে দুপুরের ডাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
আমি উঠি সিঁড়ি বেয়ে ঘণ্টিটা বাজাই, ক্লান্তভাবে পিছু ফিরে
যেন ওই প্রান্তে বীরবলকে জানাই ঘাড় নেড়ে বিদায়ী সেলাম,
এবং তখন বলি, ব্রহ্মবিলাসিনী দিদি, এই নাও তত্ত্ববোধিনী তোমার ॥
নভেম্বর, ১৯৭৬

বেদনা যে জানে

(গয়টের প্রভাব)

বেদনা যে বাঁধে দেহাঙ্গনে
সেই জানে আমার বেদনা ।

নিজ দেশে দুঃখী নির্বাসনে,
নির্যাতনে বেঁধেছে চেতনা ।
সূর্য ম্লান, লোভের আসনে
মহাকাশ ঘরে রুদ্ধ কোণা ।

আলো যারা দিবানিশি জানে,
তারা আজ সুদূর ভাবনা ।
অন্ধকার প্রবল দহনে
চৈতন্যে এ কারা খোঁজে সোনা।

বাঁচে যারা, জাগে দেহ মনে—
মুষ্টিমেয়—জানে এ যন্ত্রণা ॥
নভেম্বর, ১৯৭৬

প্রাচীন-অর্বাচীন পদাবলী !

তুমি কি ভেবেছ, এখনও কি ভাব বলো
কখনও কি মনে কর
দু'হাতে আমায় যে ফুল দিয়েছ, রাখব কোথায় তাকে ?

তোমার ক্ষণিক ডাকে
যে ফুলে ফোটালে রক্তপাপড়ি—
তুমি কি ভেবেছ কখনও একটিবার ?
কখনও নেমেছ আমার গহীন সেই স্বপ্নের পাড়ে ?

তোমার বনের বাঁকে
স্বপ্নের খরস্রোতে যেখানে তোমার গান
অতন্দ্র দিনমান ঊষাকে ও সন্ধ্যাকে
ডেকে যায় রোজ শিশিরে শিশিরে নন্দিত অস্থির ?

হে একাত্মীয়া বারেক দিলে যে সাহচর্যের ফুল
কখনও ছড়ালে গান
প্রাত্যহিকের পথে যেতে যেতে উৎরাই আর খাড়াই
স্পষ্ট ভেবেছ মাধুরী দু'একবার। —

সে আমার প্রাণে, দীর্ঘ আয়ুর
চিরহরিতের দিনরজনীর গান থামে না একটিবার
নিষ্পলক সে চোখে তুমি চিরকাল
একটি সত্য কঠিন প্রাত্যহিকে।

তাই বারবার বলি যেয়ো না ভুলে
পুরানো গানের অনেকদিনের দীর্ঘজীবীর ফুল।

মাঘের সূর্যে কেটে যাবে অঘ্রান,
আশ্বিনে আর শ্রাবণে মিলবে গান,
বেদনোত্তর বেগে
ইতিবিশ্বাসে জিজীবিষা তাই প্রত্যহ অফুরান ॥
১৯৫০-৭৬

নিতান্তই পিঁপড়ের ছড়া

(বুদ্‌দাভাই, ফাব্‌র, বেট্‌স্‌, পাউণ্ডের জন্যে)

আমরা পিঁপড়েও বুঝি নই !
দেখি আর ভাবি চলে ওই
দূর নীলে মেঘের আভাস ।
প্রাণের বিজ্ঞানে দেখেছে কি
রৌদ্রভেদী মেঘের ইশারা ?
তাই বটে । দূরে কাছে মেঘ বই
কেন লাল পিঁপড়ের সার ?
দেখি মেঘে মেঘে বাঁধে তারা
পিঁপড়েরও মিছিলে বাহার ।

আমরা পাতালে প'চে বই
মনের গুমোট বারো মাস,
দেখি ওই কাতারে কাতারে
পিঁপড়ের যাত্রা । খেলা সে কি ?
প্রাণের তাগিদ ছাড়া চলে ?
নিয়মেই এই মুক্ত মেলা,
প্রকৃত গরজে এই খেলা,
যেমন শিল্পীরা দেখে, কেউ
আঁকে বা গরজে গড়ে, বলে,
গায় বা বাজায়, লেখে কেউ
মনের গহনে প্রতিভাস ।

আমরাই মৌমাছি নই
অথচ ভ্রমর, বাঁচি কই
ফুলে দেখি সর্বাঙ্গে পরাগ
গুঞ্জনে কি ঘুরি ঘরে ঘরে ?
দিন আনি, প্রতিদিন মরি ।
অমরতা চন্দ্রলোকে ছার !
মর্ত্যলোকে মরি অপারগ,
এমন কি পিঁপড়েও নয়,
আমরা যে মানুষ অসার,
জেনেছি আঁতুড় ও মর্গ ।

পিঁপড়েরা অনেক সজাগ
দেখে দূর মেঘের বাহার,
আর চলে লাখো সারে সার।

মানুষেই ফুঁ দেয় ফানুস
মানুষেরই চাই যে প্রত্যয়
১৯৬৫

কতিপয় বৈজ্ঞানিক ছড়া

আপেক্ষিক তত্ত্ব

তরুণী ছিলেন এক, নাম দীপ্তিবতী,
আলোকের চেয়ে দ্রুত ছিল তার গতি।
একদিন বেরোলেন অনন্ত যাত্রায়
আপেক্ষিক তত্ত্বের মাত্রায়,
এবং আগের রাত্রে ফিরলেন শ্রীমতী ॥

(ডবলিউ, এচ, এলেন)

মেণ্ডেল-তত্ত্ব

এক যে ছোকরা ছিল, নাম তার স্টার্কি,
কালা কন্যার সঙ্গে করে সে ইয়ার্কি।
তার সে পাপের হল দান
যমজ না, চতুর্জ সন্তান—
কালা এক, ধলা এক, আর দুটি খাকি ॥

(অনামিক)

স্বাধীন সংকল্প ও নিয়তিবাদ

আছিলা যুবক এক, চেঁচাল সে : ড্যাম্!
স্পষ্ট দেখা যায় আমি শুধু রামশ্যাম,
জীবমাত্র! চলি বিনাশর্তে

নিয়তির নিয়ন্ত্রিত বর্ত্মে,
বাস নই, বাস নই, ওরে আমি ট্র্যাম ॥
১৯৬৫

কবিতার ধাঁধা

১

ভিতরে বাইরে সবই কালো,
চারকোনা, তার মধ্যে আলো। (উনুন)

২

খুদে মেয়ে আনি এটিকোট্
পরনে যে শাদা পেটিকোট
নাকে লাল পটি এঁটে
যতোই সে থাকে দাঁড়িয়ে
ততো হয়ে যায় বেঁটে। (মোমবাতি)

৩

তিরিশটা শাদা ঘোড়া
লাল পাহাড়েতে চড়ে
এই শত কথা বলে
এই খটাখট্ চলে
এই স্থির—নাহি নড়ে। (দাঁত)

৪

লম্বা লম্বা ঠ্যাং
বাঁকা তার দুটো উরু
ছোট্ট একটা মাথা
নেই চোখ, নেই ভুরু। (চিমটে)

৫

দুধের মতোই, গেরস্ত দেয় ফেলে,
গোরু খায়, আর খুশি হয়ে খায়, পেলে
ঘর-ছাড়া শত বাংলার মেয়ে-ছেলে। (ফ্যান)

৬

বেগ্‌নি, হলদে, সবুজ, লাল
রাজার হাতের বাইরে, আর
রানীও পায় না তার নাগাল,
নেড়াও পায় না—প্রতাপ যার
শুনি করে সারা দেশটা মাৎ।
বলো দেখি কিবা—শুনছি সাত। (রামধনু)

৭

চুরি জুয়াচুরি জন্মে তার
নুলো বটে তবু রাজদুয়ার
সদা যায় আসে, উদোর পাপ
বুধো ভোগে—মজা এ বাংলার। (দুর্ভিক্ষ)

জুন, ১৯৪৩

পাপুর জন্যে

অবাক বিস্ময়ে শিশু চোখ মেলে রেখে
বিচিত্র দুনিয়া দেখে, লিখে রাখে এঁকে,
যেমন বলতেন সেই এডোআর্ড লিআর :
দুনিয়া কী বিচিত্র : ডিআর ! ও ডিআর !

ক্ষিপ্র হাতে এঁকে যেত ছোট ছেলে পাপু
ব্যস্ত হলে বলত হেসে : ভাই কিংবা বাপু !
অধীর হোয়ো না, হোক লাইনটা ক্লিআর !

কিউ ভেঙে ধাক্কা দিলে, বলো আঁকব কী আর ?

৫ মার্চ, ১৯৭০

একটানা বর্ষা

কয়দিন একটানা বর্ষা
কবে যে আকাশ হবে ফর্সা !
মনে হয় খুব কষে
আকাশেও গোরু পোষে
গলির মোড়ের ঐ গয়লা,
আকাশে গোয়ালে সে কী ময়লা !
সূর্যের ভাঙা জিপ
সারাদিন টিপ্‌টিপ্‌
আকাশের রেশনিং যন্ত্রে
চলে কানা বাহাদুর
কেঁদে কেঁদে আহা দূর
আমেরিকা হিংটিং মন্ত্রে
অণুবোমা ফেটে যদি
শুকোয় শূন্য নদী
চাল ডাল ঝরে রাজতন্ত্রে
এদিকে যে গয়লা
চাল ডাল কয়লা
দুধ ও কাপড় পোরে যন্ত্রে !
একটানা চলেছেই বর্ষা,
আকাশ না কপালটা ফর্সা।
গোরু আর গোরু নয়
মোটা আর সরু নয়
বাঁকা সোজা সব বুঝি একাকার।
সূর্য বিনা তো আর টেকা ভার ॥

আশ্বিন, ১৩৫৩

আমার হৃদয়ে বাঁচো

সূচিপত্র

কারণ, জেনেছি

কারণ, জেনেছি পাই যে আঘাত সেও দুস্থ সভ্যতাবশত।

সহজে কোথায় মুক্তি, মানবজগতে কেন কোনো জগতেই ?
উদ্ভিদে পশুতে শূন্যে ফাঁকিটা কাটাতে পার বটে,
কিন্তু ধনী বা গরিব ছুটি বেজায় নশ্বর হায় ! এবং বাধ্যত।

শান্তি চাই, তাই জটাজূটে মুক্তি নেই, তাছাড়া সকলে
হত্যা সেরে হিমালয়ে যদি মজে অর্ধনগ্ন মগ্নতার ছলে
তাহলে কি শান্তি পাবে এদেশ ওদেশ, ব্যক্তিতে সমাজে ?
কিংবা আন্তরিক স্বপ্নসাধ পাবে বস্তুসত্তা গাজনে ব্রতেই ?

সহজের স্বস্তি নেই, সভ্য হৃদয়ের এই উভয়-সংকটে,
সেখানে স্বপ্নও কাচ বস্তুতই, পাশ ফিরলেই ভাঙে।

সভ্যতা কঠিন প্রভু, দেখ তার রূপায়িত প্রভাবের ফাঁস ;
উভয় দিকেই তার গেরো। বহুধাবিস্তৃত অসম্পূর্ণে সম্পূর্ণকে দেখে

---যেমন সূর্যাস্তে দেখি গত আর পরদিনের সূর্যোদয় রাঙে,
সেই যেমন কয়েকজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি গিয়েছেন লিখে বলে এঁকে---

শান্তির কর্মিষ্ঠ রূপে শুদ্ধিতে সভ্যতা গড়ে স্বপ্নে অস্থিতে মজ্জায়
অসুস্থের বা দুস্থের জিজীবিষা বেঁচে যায়, প্রায় স্বয়ংপ্রকাশ
অস্তিত্বের খোদাই অক্ষরে সভ্যতার স্বপ্নময় পূর্বলেখে
চেতনের-অবচেতনের ইন্দ্রধনু প্রজ্ঞা গড়ে। আর গালবাদ্য বাজে
তখন কৈলাসে নৃত্যে। সভ্যতার কালদূত শত্রু কাঁটা পালায় লজ্জায় ॥

নিশ্বাস-প্রশ্বাসে শান্ত হর্ষে

আশ্চর্য মুহূর্তে গৈবি আলো-অন্ধকারে ঘুম !

ধীরে ধীরে জেগে-ওঠা।
তখনও নিঃঝুম বিশ্বময় জীবজন্তু।
তারপরে জেগে ওঠে নানা রঙে পাখি

হরেক আওয়াজ নানা সুরে নানাবিধ স্বরে।

তারপরে দেখি নানা আলোকিত বেশে
নানান রকম কিন্তু তবু সুরে স্বরে স্থির।

আর প্রথমেই প্রতিবেশী মোরগরাজের ডাক।

তারপরে চন্দনার স্রোতে চতুর্দিকে
আর বন থেকে নানা টিলা থেকে
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন্ত তিতির শাল আর মহুয়ায়
কখনও বা বনের ময়ূর।

গৈরিক স্রোতের বাঁকে লাল জলধারা,
নানাবিধ কৃষ্ণ বা ধূসর শিলা আর বালি
ভাস্কর্যে তরল জলে ও স্ফটিক আলোকে,
নীলিম আকাশ ঊর্ধ্বে।

শরতের স্নিগ্ধ এই আলোছায়া নয়নাভিরাম!
উন্মুখর জলের কল্লোলে চলে অবিরাম—
পেশিতে ও চোখে স্পর্শে নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
প্রকৃতির শান্ত হর্ষে ॥

শত মেঘ সব ছন্নছাড়াই ওড়ে

হরেক বর্ণে শত মেঘ সব ছন্নছাড়াই ওড়ে—
কখন যে হবে একচ্ছত্র মৈত্রী ও শক্তিতে!

এক ডোরে যেন ছিন্ন মেঘেরা এদিকে ওদিকে ঘোরে,
বলে : আহা যদি পারি বা বাঁধতে হৃদয়ের চুক্তিতে
—তাহলে কি হত শান্তি? শান্তি এবং সমুচ্ছ্বাস?
কারণ? শান্তি শমনেরই উল্লাস।

স্থানীয় সমাজে নেই, আছি শুধু প্রকৃতির এই বাহারে—
স্বচ্ছ নীল ও শ্যামল শষ্পে, খরার মাটিতে ছড়ানো পাহাড়ে,
নানান ধরনে গড়নে এবং শক্তিতে বর্ণালিতে।

দিকে দিকে এই নীলিম আকাশে, মেঘে মেঘে চিত্রালিতে
মাটিতে মাটিতে চাষের নানান কাজের আলে ও নালিতে
আকাশের নানা রূপে প্রায়শই গ্রামীণ টিলার পাড়ে

আজও অবশ্য ট্র্যাক্টর আদি যন্ত্র সেই অঞ্চলে,
তবু ভাবা যায় কাল হবে চাষ একালে যন্ত্র কৌশলে ॥

বিশ্রামেও ক্ষিপ্র গতি

কারো সে-সুযোগ আছে, কারো কারো নেই।
ভাঙা বাড়ি, জানলা দরজা ঢিলা,
ছাদ থেকে জল পড়ে, বালি ঝরে,
রৌদ্রের অজেয় গতি, চলে চতুর্দিকে,
আর ঝোড়ো বৃষ্টিজল ভাসে ঘরে।

হাওয়া দেয়, নিশ্বাস হাওয়ায় ভরে,
গাছে গাছে বেগ জাগে, আমারও শরীর মন চতুর্দিকে,
পথে পথে দেখি খেত, আকাশ, খালের মাঠ, টিলা,
বিশ্রামেও ক্ষিপ্র গতি চৈতন্যে, যা সকলের নেই,
যাদের দস্তুর অন্য দম-বন্ধ ঘরে।
তাই জনসাধারণ্যে হয়েছি নন্দিত চষে গড়ে এঁকে লিখে।
দুর্ভাগ্যে সৌভাগ্য আছে, অনেকের ছলে-বলে নেই ॥

পাঠান্তর "ইতিহাসে ট্র্যাজিক উল্লাসে" কাব্যগ্রন্থের 'অসম্পূর্ণের কবিতা'-র অংশবিশেষ (পৃ ৯৬)

দিনকে রাত্রির নীলে

তবুও রাত্রিতে শোনা যায়।

নাকি ওই ক্ষীণ সুর বহুদূর নক্ষত্রসংগীত মাত্র?
স্বপ্নের বেয়ালা বুঝি বেজে চলে মহাশূন্যতায়
শুনি যে তা মনে হয় শুধু বুনি স্বপ্নময়
নীলে, মহাশূন্যতায়, ছাদে ছাদে খোলা জানালায়।

কারণ উদগ্র দিনে গ্লানির জ্বালায়
সে-গীতবিতান অশ্রুত সংগীত প্রায়,
কোমলগান্ধারে যা শোনা উচিত ছিল
কানাড়ার পাকে-পাকে, কিংবা এ-মাইনরের
হাইলিগে দাঙ্গেসাঙ্গে, অহোরাত্র
বিংশ শতাব্দীর প্রজ্ঞাপারমিতার বিজ্ঞানে
প্রতিশ্রুত সমবেত পরিপূর্ণতায়।

নক্ষত্রধ্বনিত কম্প্র অন্ধকারে ডুবে যায় গৃধ্নুরও কারবার।
তাই রাত্রিকে হৃদয়ে বাঁধি
চৈতন্যের মহাবিশ্ব নীলে,
নাক্ষত্রিক নীলে,
যদি মর্ত্য মৃত্তিকায় কর্দমাক্ত রাজপথে দৈনিক বিপথে
দুর্দশায় ব্যাপ্ত হয় আমাদেরই তরঙ্গিত ছন্দে মিলে
সুরে-সুরে মানবিক জীবনের প্রাকৃত প্রতিষ্ঠ এক পরম সংগীত,
কলকাতারও স্তব্ধতায় শুদ্ধ উজ্জীবিত
যে-সংগীতে উদ্দেশ্যের পূর্ণতায়
সমাহিত হয়ে যায় সর্ববিধ আধি,
ফাঁকে-ফাঁকে নিমগাছের শিহরনে যে-সংগীত
রাত্রির চৈতন্যে দেখা যায়
দিনকে রাত্রির নীলে অবিচ্ছিন্ন বাঁধি বারবার
দীর্ঘায়ু নিষ্ঠায় ॥

পূর্ববর্তী পাঠ 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' গ্রন্থের 'রাত্রিতে শোনা যায়' কবিতা (পৃ ১৪১)

দ্বৈতে প্রেম

নিসর্গের উচ্চাবচ সংহতিতরঙ্গে
যে-গতির আয়তি
প্রহরে প্রহরে আর নিত্য নবরঙ্গে,
একাকার প্রকৃতির প্রণতি,
যে-নন্দনে আরতি—

হরগৌরী মূর্তি পায় প্রাণময়
সেই নটরাজের আভঙ্গে।

মানবিক দৈনিক জীবনযাত্রা
খুঁজে পায় নিজের ব্যূহও
—অনেকাংশে তারই সৃষ্টিকর্ম— ।

আর মাঝে মাঝে হয়তো বা ধসায়
শিখর—আর গুহাও—
তখনই তো পূর্ণিমার বৃত্ত
গড়ে, আঁকে, প্রাণ দেয়—
দ্বৈতে প্রেম এক ধর্ম ॥

তোমায় নতুন করে পাব বলে

সর্বাঙ্গীণ শুভদিন প্রতিদিন, শ্রাবণ-আশ্বিন
অঘ্রান-ফাল্গুন আর আষাঢ়-ভাদ্রের
জলে স্থলে থৈথৈ কিংবা রৌদ্রে নীল তলোয়ার,
শিশিরে ঘনিষ্ঠ মৃদু উল্লসিত বসন্তবাহার
বানডাকা পাড়তোলা মেঘে রৌদ্রে মাটির আর্দ্রের
মিলনের সূর্যস্পন্দে জীবনের সৃষ্টিময় দিন ।

তুমিই এনেছ দ্বৈতা এ-জীবনে তোমার আমার
দেহে মনে এ-জীবনে দয়িতা যে নিত্যের পূর্ণতা
তার ফুল দিই আজ চোখে চোখে মানসগভীরে,
আজ তাই প্রতিদিন প্রেমের পাত্রের হিরণ্য শূন্যতা
ভরে দিক অভ্যাসের জয়ে, এবং আমরাও ফিরে ফিরে
পাত্রের শূন্যতা ভরি জীবনের স্বরচিত পূর্ণে বারবার ॥

শরীরে এক ঊষা

মন তখনও অস্তমিত, শরীরে এক ঊষা
জাগিয়ে তোলে মননকেও, চোখে আর কানকেও,
স্তব্ধ জাগা, রাতের গায়ে আলোর মৃদু ভূষা,
মনে হয় যে সাজায় যেন এ-প্রান্তে, ও-প্রান্তেও
মনকে যেন গোছায় স্মিত স্বয়ম্ভর শান্তি ।

একাত্মের এই জগতে পর অথবা সুদূর
সান্নিধ্যে আপন সুখে হাসে চোখের কাছে ।
এখন ক্রূর সমস্যাও ক্লান্তিকর নয়,
কেননা নিজে বিলিয়ে শত সহস্রেই বাঁচে,
মিলিয়ে যায় বিতৃষ্ণা আর ক্লান্তি আর ভয় ।

তখন বাজে স্নায়ুতে এক প্রভাতফেরি সুর,
জাগায় সারা শরীর-মনে বরাভয়ের ক্রান্তি ॥

আমার হৃদয়ে বাঁচো মননে স্নায়ুতে

চিরসুন্দরের দূতী,
আপন প্রাঙ্গণে এলে অসতর্ক আবির্ভাবে,
আমার চোখের হীরা
হৃদয়ের মর্মস্থলে জ্বলে তাই যেন সাক্ষাৎ প্রস্তাবে
মূর্তি ধরে, মৃদঙ্গ মন্দিরা
বাজাও অজ্ঞাতে নিজে আমারই আকৃতি ।
তুমি তো জানো না তুমি আজীবন সুদীর্ঘ আয়ুতে
আমার হৃদয়ে বাঁচো মননে স্নায়ুতে
আনন্দের নিত্যনৈমিত্তিক আমারও প্রস্তুতি ॥

পেরিফেরাল্

হৃদয় ? মোর হৃদয়ে নাহি জানি ।
হৃদয়ে জেনে কী হবে বলো ভাই ?
হৃদয়ে মোর পশিতে ভয় মানি !
হৃদয় ? মোর হৃদয়ে নাহি জানি—
কে জানে ! যদি জানলে তার বাণী
হাসতে গিয়ে মৌন হয়ে যাই ?
হৃদয় ? মোর হৃদয়ে নাহি জানি ।
হৃদয়ে জেনে কী হবে বলো ভাই !

কেন তুমি ভাবো

কেন তুমি ভাবো, এ-আকৃতি শুধু যৌন ?
অংশত তাই, আবার মাধুরী মমতাও জেনো সত্য ।
কেন তুমি খোঁজ কোনটা মুখ্য গৌণ ?
তা কি খুঁজে পাবে ? প্রেম জেনো অবিভক্ত ।

চৈতন্যের বিশ্বেই বাঁচে প্রণয়,
যেন সহজিয়া গান আমাদের দোতারায় ।
তাই তো তোমার সঙ্গে একাত্মতায়
গান হয়ে ওঠে আত্মদানের প্রলয় ।

আমার ঈপ্সা সদাজাগ্রত, হে চিরপ্রৌঢ়া তন্বী !
তাই আদিকাল থেকে আছি অনুরক্ত ।
তুমিই বাহুতে দেহে দেহাতীত বহ্নি
তুমি সত্তায় সূর্যে পূর্ণ সত্য ॥

দ্র : 'উত্তরে থাকো মৌন' গ্রন্থের প্রথম কবিতা

বিদায় সর্বদা

বিদায়ের লগ্ন জেনো সর্বদাই,
গতাসুর পায়ে কেন লাজাঞ্জলি দাও ?
কানে যার কৃষ্ণপক্ষ রথের উধাও
চক্রের আসন্ন ধ্বনি, যেদিকে পালাই আকণ্ঠ ধুলায়,
তাকে কেন মাল্যদান ?

নাকি ঠিক সেই হেতু ?
কারণ সময় যার ঊর্ধ্বশ্বাস, সূর্যাস্ত নিঃশেষ,
যে মাত্র অস্তিত্ব আর নাস্তিক্যের সেতু ;
তারই চোখে, চাও, জ্বলে সাত্ত্বিক আবেশ,
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে রাসে শুদ্ধছন্দ যমুনার গান ?

*পূর্ববর্তী পাঠ 'সংবাদ মূলত কাব্য' গ্রন্থের 'শুদ্ধ নীল গান' কবিতা (পৃ ৫০) দ্রষ্টব্য

অথচ বিদায় কে বা দেবে

অথচ বিদায় কে বা দেবে ?
কাকে ? কবে ?
জীবনের এ মিশ্র উৎসবে ?
দীর্ঘায়িত বহ্নি-শিখা ! তুমি তো তা জান,
—তোমরাই জান ।

আমরা যে মানুষ মাত্র !
কেউ নই দেবতা বা দানো ।
অথচ কে হবে বলো এ বাস্তবে
সর্বদা নিশ্চয় ?
সর্বদা কি ?
সুতরাং চিন্তা বা দুশ্চিন্তা—বুঝি একই নয়-ছয় ?
তাই বুঝি মানব পুত্রেরা আর কন্যারাও বাঁচে,
যাচে শান্তিজল আর মনন সদাই,
ঘৃণা আর গ্লানিতেও,
আপন গৌরবে ?

চতুর্দশপদী

তবু জলে ফলে ভালো, না হলেই তীক্ষ্ণ হাহাকার ।
মাটিও পরান্নে ক্লান্ত, হৃতমান, জরিষ্ণু, নিঃসার,
প্রাচীন লাঙল দীর্ণ, শীর্ণ দুটো বলদ সম্বল ।
সর্বদা আকাশে মুখ নিষ্পলক, চায় শান্তি, জল ।

জন্মমৃত্যু কাটে আশা-হতাশায়, সত্তা তেপান্তর,
যেন বীরভূমির কোনো মল্লদেশে জমির প্রান্তিকে
ঐশ্বর্যে ঊষর মাটি, অবহেলা যার চতুর্দিকে,
নদীনালা মৃতপ্রায় সর্পাহত, বক্তৃতাও শূন্যে আড়ম্বর ।

অবান্তর গৌণতায় জ্বলে চেতনার কর্মটাঁড়,
কিংবা নামে ভুল বৃষ্টি, শোষে মরে আসন্ন ফলন,
অনাহারে কিংবা অতিসারে দুস্থ ভারতীয় চলনবলন ।
অঘ্রানের লাল ঊষা সূর্যাস্তেই শয্যাগত জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় !

হৃদয়েরা তবু ভিজা পথ হেঁটে, আশা বা নিরাশা
পায়ে চেপে, পেতে চায় ফলন্ত জ্ঞানের নিজভাষা ॥

পূর্ববর্তী পাঠে 'ইতিহাসে ট্র্যাজিক উল্লাসে' কাব্যগ্রন্থের 'তবু জলে ফলে ভালো' কবিতা (পৃ ১২৮) দ্রষ্টব্য

জীবনে জীবন ঢালে স্রোতে

বহুদূর এসেছি যে ! বিভিন্ন বয়সে
মনে মনে ভাবি যে মান্ধাতা !
অথচ একালে কিন্তু কোথা
সেই আদি পিতামাতা ?

এ তো বড় রঙ্গ জাদু
নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি !
অথচ এখনও আছে
নানা মিত্র নানা সঙ্গী !
এখনও যে মনে হয়
যতদিন যায় বাঁচা
শরীরের দুস্থ খাঁচা
এখনও যে মহাশয় !
মৃত্যুর সুদূর স্রোতে
ডুবব না ভাবি সদা।

অন্তত আপাতত
আয়ু যত বাড়ে তাতে—
এই তো মানব-মন
জীবনে জীবন ঢালে স্রোতে ॥

আকাশবিহারী

এ ভরা বাদর মাহ ভাদরে—
হে আকাশ, কেন না আষাঢ়ে বা শ্রাবণে ?
মানুষ যে চাতকের মতো ঊর্ধ্বমুখ,
চোখ-কান আকাশবিহারী, রৌদ্রে বাঁধা দুঃখ-সুখ !

জল দাও, হে আকাশ,—অন্ন যে জোটে না—
অন্ন বিনা বাঁচাই যে দায়—
এদেশে জল কিনে অসম সে মূল্যে
চাষি পরের ও নিজেরই অন্ন কেমনে জোগায় ?

যামিনী রায়ের ভাষাতেই—সবচেয়ে বীরত্বের কাজ,
আমাদের চাষিরই চাষ—বিদেশি লেখক
সমরসেট মম্‌ও যে-কথা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন—
সময়ের জল—হে আকাশ, তুমি দাও আমাদের !

এখন যা দিলে এইদিকে—
অন্যদিকে বন্যা দিয়ে সেই কি ভুললে ?

আশ্চর্য প্রশস্ত পথ

আশ্চর্য প্রশস্ত পথ, নিসর্গে উদার,
কংক্রিটে, কোথাও বা ম্যাকাডামে পাকা।
আশেপাশে, দূরে বা কাছেই, পোড়ো-পোড়ো গ্রাম
দীনহীন, কোনোটা বা ফাঁকা
(অতীতে বা ভবিষ্যতে হতেও তো পারে বটে আরেক চেহারা ?)

মানুষ অনেকে শহরের কলে মিলে কিংবা গেরস্তবাড়িতে
স্বপ্ন দেখে দারোয়ান অথবা বেয়ারা।
যারা আছে তারাও স্বাধীন নয়, আছে নেহাৎ নাড়িতে
দীর্ঘজীবী দেশজ স্পন্দন, তাই।
অথচ স্বাধীন নয়, হীনমন্য দীন।

আশ্চর্য সুন্দর রাস্তা, যেন ডাকে একটি সংলাপে
সমস্ত শহরগ্রাম, প্রত্যেকেই সংলগ্ন অথচ স্বাধীন।
গাড়ি থামে। কফি নামে, জলযোগ কিঞ্চিৎ স্যাণ্ডউইচে
এবং আপেলে, মুক্ত দৃশ্যে। ধোঁয়া নেই, ধুলো যদি ওড়ে
তাও বিশুদ্ধ মাটির, মেঠো, ছুটি-কাটানোর উপযুক্ত।
দূরে দুটি গ্রামীণ বালক, আদুল শরীর,
জিজ্ঞাসায় স্থির, দেখে আমাদের আর
মধ্যে-মধ্যে পদচারণের ছন্দে দিগন্তে তাকায়
পাহাড়ের নীলে।

কী ভাবে তা সঠিক বুঝি না, কাছে গেলে
ভয় পায়, পিছনে ফিরায় মুখ, তারপরে ছোটে
আঁকাবাঁকা গ্রামের গলিতে, মাঠে, পাকা রাস্তা ফেলে ॥

এরা সব দুস্থ্ গ্রাম

থেকে থেকে ছাট ঝরে ঝলকে ঝলকে,
বর্ষার সমৃদ্ধ রূপ—নাকি মৃত্তিকার রস।
কখন বা উদ্দাম সরসতা, কখনও বা শিথিল পলকে
সূর্যের হীরক-দ্যুতি।

কখনও বা ধানের আকৃতি : জল ! চায় জল !
মাটি যে শোষণ করে উলূপীর মৃত্তিকা গহ্বরে।
তাই চাষি ধান বোনে, ধান রোয়, কবে বা তুলবে ঘরে ঘরে !
পিপাসার্ত পরগনায় সকলে বিহ্বল।

অথচ তাদেরই মধ্যে মাঝে মাঝে মারামারি—
অনেকেই স্বয়ম্-স্বার্থে, নিতান্তই মানবিক বটে !
লুটেপুটে চলেও না, কে বা জিতি-হারি !
পাড়ায় পাড়ায় তাই নানা কেচ্ছা রটে।

এরা সব দুস্থ্ গ্রাম ! তার তবুও কত না
চলে খিটিমিটি ! আবার সদ্ভাবও বটে !
মাঝে মাঝে শোনা যায় হরেক-ও রটনা—
শহরে যেমন, গ্রাম-গ্রামান্তরে তাই রটে।

অথচ ভালোও আছে বেশ কিছু কিছু-সত্যই মানুষ,
কেউ কেউ শান্ত আর পরিশ্রমী তাতে,
আবার কেউ বা খালি জোচ্চুরিতে মারে আর মাতে—
তা সে মেয়েই হোক বা হোক না পুরুষ ॥

শুনতে কি পাও

শুনতে কি পাও ? শুনতে যে পাই, বলো।
অনেকেই ? নাকি কেউ কেউ ?—

এ-জীবন আজ হোক বরাভয়, ক্ষমা করো
ওগো.ক্ষমা চাই ওগো জীবন !

হয়তো শান্তি দুর্লভ আর ইতরতাই
প্রায় দেখ জেতে, আছে দেখ কত ফেউ !
প্রায় দেখি হারে, মার খায় আর মারে ।
তাই অনেকেই ধর্‌তাই বুলি ধরে !

এ-জীবন যেন দিল্লিওয়ালার যাত্রা
বুঝি কি বোঝ কি তার কিছু আজ বাইরে কিংবা ঘরে ?

মাথামুণ্ডুর কী-বা মাত্রা ?
সবই কি তুচ্ছ ? সবাই উচ্চ ? কে বা আগে ? কে বা পিছু ?

আমাদের প্রতি দিনরাত্রিই মরণের ভোগে-ভয়ে ।
অনাবৃষ্টি ? অথবা প্লাবনে কোথায় কেমন জীবনে ?
শুনতে কি পাই ? তোমরাও শোনো প্লাবনে
জুলাই কিংবা শ্রাবণে ?

জ্বালাও আলো

আপু-টিপু জ্বালাও আলো !
চার লাইনের লেখাই ভালো—
মস্ত লেখায় চোখ বুজে যায়
জোনাক পোকার হাজার আলো—
তোমরা হাজার জোনাক জ্বালো ॥

পাঠান্তর : তোমরা হাজার প্রদীপ জ্বালো

সমুদ্র সেই সমুদ্রও

(জ্যুসেপ্‌পে উংগারেত্তি অবলম্বনে)

নেই আর মৃদু মর্মরিত নেই সেই গর্জমান সমুদ্র
সেই সমুদ্র

সব স্বপ্ন নিংড়ানো শুভ্রক্ষার প্রান্তর এ-সমুদ্র
সেই সমুদ্র

যেন দুঃখের আঘাতে স্ফীত সমুদ্র
সেই সমুদ্র
উদাসীন মেঘের পাঁতিতে দোল খায় সমুদ্র
সেই সমুদ্র

করুণ ধোঁয়ায় ওঠে শয্যা থেকে সমুদ্র
সেই সমুদ্র

মনে হয় মরে গেছে সমুদ্র
সেই সমুদ্র ॥

আজও মনে পড়ে সেই বরানগরের পাঠ আর গান

আজও মনে পড়ে, সেই বরানগর—
পাঠ আর গান, রবীন্দ্রনাথেরই এক নাট্যপাঠ !
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বললেন : চলো, ওঁর কাছে চলো ।

বিরাট পুরুষ বিচিত্র সুন্দর তাঁর দৃষ্টি !
তিনি নাম শুনে বললেন : ও তুমি এসেছ !
—প্রণাম করলুম ! (আমাদের পরিবারের পুরুষদের মধ্যে
সচরাচর নিয়ম ছিল না)
সেই চোখ মুখ আশ্চর্য সুন্দর !

অধ্যাপক মহলানবিশ বললেন : ওঁর কাছে বোসো ।
নাটক পড়বেন । গান করবেন অমিতা সেন—ডাকনাম খুকু ।
গভীর তার গান !
রবীন্দ্রনাথ বললেন, "স্নিগ্ধ স্নেহ-ভরা স্বর, হালকা রসিকতার সুরে—
তুই তো কালো মেয়ে ! লোকে কী বলবে ? আমার পাশে বসে ?
অমিতা খুকু, সরল উত্তর দিলে, সহজ স্বরে :
তা তো বলবেই ! লোকে বলবে—চাঁদের পাশে কলঙ্ক !
পরেই, সেই মেয়ের আবেগ-ভরা কণ্ঠে শুনলুম—
ও চাঁদ, তোমায় দোলা দেবে কে ?—দেবে কে ?

কবে সে চলে গেছে, অলক্ষ্যে রেখে গেছে আনন্দ,
দখিন হাওয়ার পথিক হাওয়ার পথে :
সুন্দরী বধূকে সাজায় যতনে অলক্ষ্য প্রেমের অমূল্য হেমে !
স্বপন দিয়ে যায় আধেক ঘুম নয়ন চুমে !—
যে-গান বিলেতি রাউণ্ডের মতো ঘুরে ঘুরে আসে,
বারে বারে,
বাংলা গানের সুরে নতুন ধারা বয়ে আনে—
প্রাচীন সেই গানের মতো—
সামার ইস্ ইকুমেন্ ইন্—লুডে সিং কুক্ !

রবীন্দ্রনাথের মনে কি পড়েছিল সেই বিদেশিনীকে—
যে সুগভীর স্বরে তাঁকে ডেকেছিল—'মাই রবিন এডেয়ার' ব'লে— ?

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী , তারে বুঝিতে পারিনি ।
তবু সে গান গেয়ে যায়—ফিরে ফিরে ডাক দিয়ে যে যায় ।
নয়ন তোমার ডাকুক তারে শ্রবণ রহুক পথের ধারে—
ভোরের আকাশ ভরে যে যায় এমন গানে গানে—

তবু সে ডেকে যায় গান গেয়ে যায়, একাত্ম স্বরে—
চিনিলে না আমারে কি, চিনিলে না । আহা !

বাঁকুড়ার দুইজন

হয়তো দেশে অকর্মণ্য কেউ বেশি বা কম
যেমন বিশ্বে কোথাও হিম—হাড় সিরসির করে,
কোথাও ঘেমো-আবহাওয়া বা কোথাও কড়া গরম ।

কেউ বা অতি চালাক, কারো সরলতাই চরম,
কেউ বা করে ঘোর সংসার কষ্টে ঘুপ্‌সি ঘরে—
এই জীবনে জীবিকাতেই সত্য এক পরম ।

অথচ চাই দিনরাত হোক হিম বা মৃদু গরম,
ঝরঝরে আর জীবনানুগ, হোক না বাইরে ঘরে,
এই জীবনে জীবিকাতেই সত্য আছে পরম ।

যামিনী রায়ের শিল্পলোকে কিংবা প্রজ্ঞা-বরে
বাঁকুড়া জেলার যোগেশ রায়ের নব্বই-এ নেই ভ্রম।
দৃষ্টি ক্ষীণ হলেও তিনি একটি অনুচরে

মনের সূর্যসাধনাতে নিজের গ্রন্থঘরে
বিজ্ঞানে বা বেদজ্ঞানে পাণ্ডিত্যে পরম
আত্মপ্রচার নয়, শুধুই বিদ্যানিধির স্বরে
সদাই এই জীবনে তাঁর জ্ঞানসাধনা চরম ॥

জ্যোতি ঠাকুর

অস্তমিত রবি তার শেষ বেলাকার রশ্মি ঢেলে দেয়
পশ্চিমাকাশ থেকে পুব দিগন্তে :
দিঘারিয়ার পশ্চিম সূর্য আলোকিত করে যেমন
পুবে ত্রিকূটের প্রতিটি চূড়া গুহা।
মানুষের শেষ দিনে মন চলে যায়
ছোটবেলাকার ছোট স্মৃতির মনের আনন্দে।

রাঁচিতে আমার সেজ-জ্যাঠাবাবুর বাড়িতে
বাবার সঙ্গে গিয়েছিলুম,
বয়স আমার হবে তেরো-চোদ্দ।
বাবা নিয়ে গেলেন, একদিন, মোরাবাদি পাহাড়ে—
যেখানে, বিপত্নীক, একা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকতেন।
বহু ভাষা জানতেন—পণ্ডিত লোক তিনি—
একা বসে লিখতেন,
অনুবাদ করতেন,
স্কেচ করতেন, ছবি আঁকতেন।
আপন মনে, নিঃসঙ্গ একাই থাকতেন।

বাবা প্রশ্ন করলেন,
—চিনতে পারছেন ?
রোগা লম্বা ফর্সা সুদর্শন পুরুষ জ্যোতি ঠাকুর
অতি ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটি
বাবার মুখের কাছে নামিয়ে, বললেন, হেসে—
বিলক্ষণ ! তোমাকে চিনব না ?

তোমার ছবি যে আমি এঁকেছি।
তুমি, অবিনাশ। খুঁজে দেখো, আমার পেন্‌সিলে স্কেচ তোমার পোর্ট্রেট
আমার কাগজের মধ্যে আছে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—
ও তোমার ছেলে ?
ওকে আমার গুহাটা দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো।
গুহাটা ওঁর গর্ব ছিল
—পাহাড়ের উপরের দিকে—
তার-ও ওপরে ওঁর লেখাপড়া শোবার ঘর—
সুন্দর বিস্তারিত দৃশ্য দূর প্রান্তরে মেলে দিত।

সেজ-জ্যাঠাবাবু ওঁকে বলেন,
রাঁচিতেই আপনি থাকুন,
শরীর ভালো থাকবে।
রোজই তাই আসতেন—
নিজের লোক-টানা বাড়ির রিকশায় চেপে,
সার্কুলার রোডের বাড়িতে।
উপরে ছাউনি ঢাকা, রোদটা এড়িয়ে, হাঁটুর উপর কাগজপত্র রেখে,
রিকশায় বসেও লিখতেন,
—এই ছিলো তাঁর বেড়ানো—
সময়ের একান্ত সদ্ব্যবহার ?
রাঁচিতে গেলেন, স্বাস্থ্যের কারণে,
কলকাতায় আর ফেরেননি ॥

স্মরণীয় সেই দিনটি

হঠাৎ এক সন্ধ্যায়, ভাগ্নে শিশির আমাকে এসে জানাল
"রাঙাকাকাবাবু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। যাবে ?"
কুণ্ঠিত লজ্জিত দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করলুম—
"কবে, কখন ?"
তারিখ-সময় সঠিক জেনে এসেছিল—
সুভাষবাবু তাঁর অবসর-সময় বলে দিয়েছিলেন,
গোছানো স্বভাব—ফাঁক রাখেননি।

আগেও তাঁর কাছে গিয়েছি কয়েকবার—
একবার 'চোরাবালি' পড়তে চেয়েছিলেন,
বইটি নিয়ে গিয়েছিলুম—সে তো অনেক বছরের কথা।
তারপরও গিয়েছি, মাঝে মাঝে, মনে পড়ে,
প্রায়ই ডাক পেয়ে।

সেবার যে-সময়ে বলেছিলেন—তাঁদের এল্‌গিন রোডের
বাড়িতে গেলুম।
বাইরে পুলিশের কঠিন পাহারা—
কিন্তু আমার প্রবেশে বাধা হয়নি।

ভাগ্নেরাই কেউ বোধহয় আমাকে ওঁর ঘরে এগিয়ে দিলে।
দোতলার ঘরে সুভাষবাবু বিছানায় শুয়ে—
চোখ দুটি উজ্জ্বল, কিন্তু মুখে ক্লান্তির ছায়া—শরীর অসুস্থ, মনে হল,
দাড়ি কামানো হয়নি কদিন।
শুয়ে বই পড়ছিলেন।
আমি ঘরে ঢুকতেই, বিছানায় উঠে বসে সাদর সম্ভাষণ জানালেন—
"আসুন! রাস্তার দিকে দেখবেন—
দেখেছেন তো, চার-চারটে লোক, রাত্রিদিন পাহারা!
কী ভয়াবহ "চীজ" আমি, বলুন তো!
কোনো সময়ে রেহাই নেই, জানেন—
ভোর থেকে সারা দিনরাত—কোনো সময়ে বাদ নেই!"

তারপর নিজেই আবার বললেন, একটু থেমে—"বসুন!
আমি আপনাকে ডেকে পাঠালুম, ভাইপোকে দিয়ে—
আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।
আশা করি কোনো অসুবিধা নেই।"

আমি বসলুম, নীরবে—
তলব পেয়েই তো গিয়েছিলুম—
উনি ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে!

নিজেই বলতে লাগলেন—
"এই ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছে—
কারুর সঙ্গে দেখা করতে, অনুমতি চাই, তাঁদের!

বাড়ির লোকেদের সঙ্গেও—যেন নিয়মমাফিক কথাবার্তা
'হোম-ইনটার্নড'—পুরো মাত্রায়—একেই বলে !"

আরো অনেক কথা—সে তো বহুদিন হল আজ,
সব মনে নেই।
তিন-চার ঘন্টার আপ্যায়িত—এল্‌গিন রোডের দোতলার ঘরে।
"আপনি কি দিন-ক্ষণ মানেন ?
কোন্‌টা শুভ বা মঙ্গল, কোন্‌টা নয়।
মেজদা ওসব মানেন। আমি মানি না।
আপনি কী বলেন ?"
আরো অনেক প্রশ্ন, নানা কথা, সাহিত্যিক—

বই সম্বন্ধে অনেক মতামত।
"আপনার আঁদ্রে মালরোর লেখা কেমন লাগে ?
অনেকের লেখা পড়েছি—অনেক প্রতিভাবানের লেখা—
কিন্তু অনেকের চেয়ে জ্ঞানী বিচক্ষণ
এই আটাশ-ঊনত্রিশ বয়সের ফরাসি লেখকটি।
দূরদৃষ্টি, সচেতন অনুভূতি, প্রখর বুদ্ধি—
ছোট বিষয় লক্ষ করার ক্ষমতাও প্রচুর—
আপনার কি তাই মনে হয় না ?"

বুঝলুম, অনেক কিছু পড়ছেন, গভীর চিন্তা করছেন।
কিন্তু কী, তা স্পষ্ট বুঝিনি, তখন।
পরে, আবার বললেন—
"আপনার কাছে ওঁর একটা বইয়ের ইংরিজি-অনুবাদটা আছে ?
নাম—'কন্‌কোয়েস্ট'। আমাকে পড়তে দেবেন ?
আমি ঠিক এক মাস বাদে বইটি ফেরত দেব,
ভাইপোদের কারুর হাত দিয়ে।"

আমি চলে আসার পর, শিশিরই বোধহয় আবার
বইটি নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে।

যেদিন বইটি ফেরত দেবার কথা—
ঠিক এক মাস পরে, সকালের খবরের কাগজে চমকপ্রদ খবর—

পরম শক্তিশালী ব্রিটিশ রাজের দিনরাত্রির পাহারা এড়িয়ে
সুভাষচন্দ্র বসু তাঁদের এল্‌গিন রোডের পৈতৃক ভবন হতে অন্তর্ধান।

টীকা : ভাগ্নে শিশির—শিশির বসু ; কবির ভাগ্নে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাইপো।

মোহিনী চ্যাটার্জি

বাবার সঙ্গে বসে প্রায়ই গল্প করতুম।
একদিন সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে, একতলার ঘরে
কথা বলছি, গম্ভীর গলায় শুনতে পেলুম ডাক—
"অবিনাশ, বাড়ি আছো ?"
বেরিয়ে দেখি, মোহিনী চ্যাটার্জি এসেছেন।
পরনে হালকা শাদা কোট আর দেশি ধুতি,—
দেখলুম শরীরটা খুব ভেঙেছে
চোখ দুটি অন্ধপ্রায়।
একজনের সাহায্যে ধীরে ধীরে আমাদের ঘরে ঢুকলেন—
নিজেরই ঘোড়াগাড়ি করে এসেছিলেন।

বাবার সঙ্গে খুব হৃদ্যতা ছিল, বহু বছরের—
দু'জনেই ছিলেন অ্যাটর্‌নি, স্বভাবের মিল ছিল।
যাতায়াত ছিল তাই।
বিকেলে আপিসের পর গঙ্গার ধারে বেড়ানোও।

মোহিনীবাবু খুব সাত্ত্বিক লোক ছিলেন—
সাধুই বলা যায়।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পছন্দ করেন
আদি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য।
পরে, দ্বিজেন ঠাকুর তাঁকে জামাতা করেন।

আমার বাবা কখনও বিদেশ যাননি—
মোহিনীবাবু ছ'সাত বছর ইংলণ্ড-আয়ারলণ্ডে ছিলেন,—
তবু বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হতে দেননি।
সেদিন তাই মোহিনীবাবু বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।
কিছু কথাবার্তার পর বাবার মনে পড়ল
ইয়েট্‌সের লেখা, মোহিনীবাবুর বিষয়ে, কবিতা—

আমি বাবাকে পড়ে শুনিয়েছিলুম।
বাবা আমাকে বললেন—
মোহিনীবাবুকে কবিতাটি পড়ে শোনাও,
আমাকে যা শুনিয়েছিলে।

মোহিনীবাবুও বললেন—"আমি চোখে দেখি না—
পড়ে শোনাও তো, আমাকে—কী লিখেছেন ইয়েট্‌স্।"

কবিতাটি আমি পেয়েছিলুম একটি ম্যাগাজিনে—
অ্যামেরিকান সাপ্তাহিক—নিউ রিপাব্লিক।
সুধীনবাবুর চেনা হগ-মার্কেটে একটা বুকস্টলে
আমিও প্রায়ই বই দেখতে যেতুম,
ভালো বই পেলে কিনতুম।
ইয়েট্‌সের কবিতাটি বেরিয়েছে দেখে সংখ্যাটি কিনেছিলুম।
বয়স আমার অল্পই তখন, সেকেন্ড্‌ ইয়ারে পড়ি—
নিজেরই অস্বস্তি হচ্ছে মোহিনীবাবুর কাছে পড়তে—
আমার উচ্চারণ ভালো নয়, সে তো আমি জানি।
তবু পড়ে শোনালুম কবিতাটি।

কবিতাটির শিরোনামাই—মোহিনী চ্যাটার্জি—
তারই চিন্তা ভাষা দিয়েছেন ইয়েট্‌স কবিতাটিতে—
এই মর্মে—

'উপাসনা করব আমি কিনা,
আমার এ-প্রশ্নের উত্তরে
ব্রাহ্মণ বললেন আমায় :
কোরো না কিছুই প্রার্থনা
বোলো প্রতি রাত্রে বিছানায়,

"আমি তো ছিলাম মহারাজ,
আমিই ছিলাম ক্রীতদাস,
দুনিয়ায় কিছু নেই আজ,
মূর্খ জুয়াচোর বা বদমাশ
আমি যা হইনি একবার,
অথচ আমার বক্ষ 'পরে
লক্ষ মাথা রেখেছে তো ভার।"

বালকের চণ্ড দিনরাত
যাতে হয় প্রশান্ত অন্যথা,

মোহিনী চ্যাটার্জি বললেন,
ওই বা অমনিতর কথা :'

কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তিটি অনন্যসুন্দর, ইংরেজিতে
"মেন ডান্‌স অন ডেথলেস ফীট"—
বাংলা অনুবাদে বলা কি যায় ?—
"মানুষের নৃত্য নিত্য মৃত্যুহীন পায়ে।"

মোহিনীবাবু খুব খুশি হলেন—
শেষ কথা কটি এখনও মনে গেঁথে আছে—
বললেন আমায়—
"দাও তো বইটি
আমার ছেলেকে দেব—খুশি হবে সে।"
নিউ রিপাব্‌লিক ম্যাগাজিনটি
হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন ॥

আমার চেনা গাছ ক'টি

তালগাছ দুটি—সারি সারি নারকেলের সামনে
আমাদের বাড়ির কাছে—ঠায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে,
সান-বাঁধানো ঘাটের ধারে—দুই প্রহরী খাড়া,—
প্রকাণ্ড দিঘির ধারে, ঐতিহাসিক মহীশূর-পরিবারের
প্রাচীন কবরখানার বাগানের এক প্রান্তে।

দিঘিটি অর্থগৃধ্ন লোকে দুর্গন্ধ পচা মাল দিয়ে
অর্ধেক ভরিয়েছে।
নিজেদের স্বার্থে, লোকালয়ের স্বাস্থ্যের কথা ভোলা সহজ।
ছিল একটি মহুয়া গাছ,
পাতা ঝরানোর পর কৌণিক ডালে
ফুলে বাতাস মাতিয়ে দিত সুগন্ধে।
কার জ্বালানির প্রয়োজনে সে এখন নিশ্চিহ্ন।

ও-বছরেও দেখেছি—কদমগাছটি—রথের সময়ে পাড়া আলো
হাজার ফুলে—এ-বছরে দেখি সে সাফ্!
গাছের অনেক শত্রু—

সে-বছর কলকাতার সাইক্লোনে, সার-বাঁধানো জামরুল ক'টি
আমাদের বাড়ির পশ্চিমে—পালকের মতো উড়ে গেল হাওয়ায়—
কলকাতার ইঁট-লোহা-কংক্রিটে গাছের স্থান কোথায় ?

এক কালীপূজায় ছেলেদের উড়নচণ্ডী হাউই
অসহায় একটি তালগাছের মাথা জ্বালিয়ে দেয়—
সে কী! আগুনের দাউদাউ জিভ লকলকে !
হাওয়ায় স্ফুলিঙ্গ—হালকা ভেসে আসে
আমাদেরই শেষ প্রান্তের বাড়ির দিকে ।
দমকল খবর পেয়ে গাড়ি নিয়ে এলো,
কিন্তু ঢুকবার রাস্তা কই ?
ওদিকে বিরাট প্যাণ্ডাল যে ।
অনেক ঘুরে, মহীশূর-স্টেটের প্রাচীন মসোলিয়মের ভিন্ন ফটক—
দমকল টংটং শব্দে ঢুকতে সক্ষম ।
তবে, সে-আগুন নেভানো ভার !
বহু পরিশ্রমে জল চূড়ায় পৌঁছে আগুন নেভায়
তবে পাড়া ঠাণ্ডা—যদিচ গাছটির মাথা পুড়ে কালো !
ভাবলুম—অচিরেই সে শুকিয়ে যাবে ।

এক বছর নিঝুম মেরে সে দাঁড়িয়ে রইল—
পরের বছরই কচি-গোল পাতায় তার জয় সে জানাল !

আজ দেখি সে-গাছ—হাজারখানেক তালশাঁস—
হার-না-মানা হার পরেছে সে তার চূড়ায় !
রোজ কত পাড়ে—তবু যেন অফুরন্ত ।
চোখের আরাম—কচি সবুজ নিটোল কোমল শীতল সে-তালশাঁস !

—মরু বিজয়ের কেতন উড়াও হে শূন্যে, উড়াও, হে প্রবল প্রাণ !

তিনটি কবিতার সম্ভাবনায়

১

মনের ভিতরে বসানো সহজ,
স্বপ্নে আসন পেতে।
খড়ের চালায় রাখবে কোথায় ওকে ?
বিদ্যায়তনে হয়েছিল দুটো কথা।
সে-কথাও ছেঁদো গাজনতলায়
এঁদো পুকুরের শীতে।
পাঁচ কথা জেনো বলবেই পাঁচ লোকে ॥

২

রাঙা ফালি পথ ফ্যাকাশে সুদূর চাঁদের আলোয় ;
ধুধু করে খালি মাঠ,
একা তালগাছ ভাবনা মাথায় শূন্যে তাকায়
এক চোখে ঢুলুঢুলু।
থেকে থেকে বুনো দমকা হাওয়ায় আঁচলে পানজাবিতে,
বাধায় হুলুস্থুলু ত্রিকালেশ্বর উচ্চকণ্ঠে হেঁকে ॥

৩

তালের মাথা দোলায় ঘন পাতা ;
শালের শাখা বাজায় করতালি,
খেজুরকাঁটা শূন্যে লড়াই করে,
হাজারখানেক বর্শাফলক ধরে,
পাগলা হাওয়ায় বাঁশঝাড়েরা নাচে,
আমলা-পাতায় হালকা নাচের নেশা।
একলা বোবা কলাবৌয়ের মাথাটা খালি দেখছি
শতচ্ছিন্ন বেশে ॥

সংযোজন

ভোর

১

প্রত্যহ ভোরে সূর্য পাঁচিল ছাড়িয়ে
রশ্মি ছড়ায় ফটকের গায়ে, ফটকে কিন্তু তালা।
কারার মধ্যে বন্দীমহল সদাই আঁধারে মোড়া,
তবুও আমরা জানি তো বাইরে সূর্য অভ্যাগত।

২

যেই না জাগে অমনি সবাই উকুন শিকার করে।
আটটা নাগাদ ঘন্টি বাজে সকালবেলার খাওয়ার,
চলো সবাই চলো, প্রাণটা ভ'রে যা পাই খাই।
যা দুর্ভোগ সয়েছি সবাই, আসবে ঠিক সুদিন।

প্রেম ও বর্বর

যে ব্যথায় প্রেম জর্জর
তারই কয় কলি গান করে,
ওড়ে তারা, ডানা-সঞ্চারে
স্বদেশে স্বাধীন তৎপর।

ব্যর্থ ওরে ও বর্বর!
ব্যথায় কি সদা মারা যায়?
গানের ডানা কি ধরা যায়?
তুই ন'স প্রেমে জর্জর॥

২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বিশিষ্টার্থবাচক শব্দ ও তথ্যপঞ্জি

অ

অ-বন্দ্যোপাধ্যায়— কবির যৌবনের জনৈকা অনুরাগিণী। অনিলা বা আইলিন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অকল্কা— (স্ত্রী) দম্ভরহিত ; গর্বহীনা ; নির্মল, নিষ্পাপ ; বিশিষ্টার্থে—'জ্যোৎস্না'।

অগ্নিকুক্কুট— জ্বলন্ত খড় ; কুক্কুটের আকারে গঠিত শুষ্ক তৃণের আটি বা নুড়া ; Firebrand.

অঘমর্ষ, অঘমর্ষী— পাপনাশী ; পাপনাশন, বেদমন্ত্রের মন্ত্রকার ঋষি।

অঘোরপন্থী— শৈব সম্প্রদায়বিশেষ ; ভয়ানক পন্থী, এরা অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকে এবং নির্বিকার ও নির্ঘৃণ্য হওয়াই এদের ধর্মের লক্ষ্য।

অচ্ছোদনীরে— স্বচ্ছ ও নির্মল জলে।

অজাচার— (ছাগের ন্যায় আচরণ), রূঢ় অর্থে অগম্যসম্ভোগ ; incest.

অডেন— Wystan Hugh Auden (1907-1973) বিষ্ণু দে-র প্রায় সমকালীন ইংরেজ-মার্কিন কবি ও নাট্যকার।

অণুকরকা— শিলাবৃষ্টির সময় পতিত ক্ষুদ্র শিলা বা শিলাচূর্ণ।

অণোরণীয়ান— অণুর চেয়েও অণু বা ক্ষুদ্রতর। কঠোপনিষদ ১/২/২০, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/২০ ইত্যাদিতে আত্মার বর্ণনা—অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান।

অতিকশ— যে অশ্ব কশাঘাত ভয় করে না ; দুর্দান্ত।

অধ্যাস— রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো ভ্রান্তজ্ঞান ; illusion.

অন্ডর সেল— প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের তুলনায় বেশি মুনাফা লাভের জন্য নির্দিষ্ট দামের চেয়ে কম দামে বিক্রি। Undersell.

অনিকেত— গৃহহীন ; মূলহীন উদ্বাস্তু ; নিয়ত বাসশূন্য।

অন্যেরাই প্রশ্নাধীন— ম্যাথ্যু আরনল্ড-এর শেক্সপিয়র বিষয়ক সনেট—'Others abide our question'খণ্ডবাক্যের স্বচ্ছন্দ অনুসৃতি।

অন্বিষ্ট— উদ্দিষ্ট ; যাকে অন্বেষণ করা হচ্ছে ; বাঞ্ছিত ; আকাঙ্ক্ষিত।

অপ্সুদীক্ষা— মাথায় পবিত্র জল ছিটিয়ে দীক্ষা বা ধর্মান্তর।

অপস্মার— অপগত স্মরণশক্তি ; মূর্ছারোগ ; মৃগীরোগ।

অপাপবিদ্ধমস্নাবির— অপাপবিদ্ধম্+অস্নাবির ; নিষ্পাপ এবং স্নায়ুহীন ; (জরার চিহ্নস্বরূপ) শিরারহিত। ঈশোপনিষদের ৮ম শ্লোকে আত্মার দুটি বিশেষণ : 'অস্নাবিরম্', 'অপাপবিদ্ধম্'।

অবীচি— তরঙ্গহীন।

অবীচি কর্কশ— অমসৃণ তরঙ্গহীন ; সমতল অথচ রুক্ষ মাটি।

অম্বুবাচী— জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির পর সূর্যের মিথুনরাশিতে গমনকালে আর্দ্রা-নক্ষত্রের প্রথম পাদভোগের সময়—অম্বুবাচী। সাধারণভাবে ৭-১০ আষাঢ় বর্ষার ধারাপতনের সময়। ধরণীর যৌবনবতী হবার কাল।

অম্মা— আত্মা ; অহংকার ?

অয়রিডিকে, অয়রিদেকে— ইউরিডাইস ; অরফিউস দেখুন।

অরফিউস— থেস অঞ্চলের খ্যাতনামা গ্রীক বীর অ্যাপোলোর পুত্র। অসামান্য কণ্ঠসংগীত ও

বীণাবাদন ক্ষমতায় তিনি পশু, পক্ষী, মানুষ দেবতা সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারতেন। দিব্যাঙ্গনা ইউরিডাইসকে তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং তাকেই একনিষ্ঠভাবে ভালবাসতেন। সর্পাঘাতে স্ত্রীর মৃত্যু হলে তিনি পাতালের মৃত্যুপুরী থেকে স্ত্রীকে উদ্ধার করেন এই শর্তে যে, মর্ত্যে পৌঁছবার আগে তিনি পিছন ফিরে স্ত্রীকে দেখতে পারবেন না। প্রেমিক দম্পতি মর্ত্যভূমির কাছাকাছি পৌঁছলে অরফিউস অধৈর্য হয়ে স্ত্রীকে দেখতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃত্যুপুরীতে অন্তর্হিতা হন। পরিণতিতে সান্ত্বনাহীন প্রেমিক অসহ্য অনুশোচনায় আত্মহত্যা করেন ; অথবা—ঈর্ষাপরায়ণা অন্যান্য সুন্দরীরা তার একনিষ্ঠতায় অপমানিত হয়ে তাকে হত্যা করে। চিরন্তন প্রেমিক-দম্পতি রূপে অরফিউস-ইউরিডাইস স্মরণীয়।

অর্ঘ্যকে— অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্তকে ?

অরুণাশ্ব— সূর্যের ঘোড়া ; লোহিতবর্ণের অশ্ব ; পুরাণে উল্লিখিত কশ্যপ-বিনতার জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণই সূর্য-সারথি—তিনি সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যরথচালনা করেন।

অলীক শশবিষাণ— শশকশৃঙ্গবৎ অসম্ভব বিষয় ; কল্পিত অলীকবস্তুর একটি উপমান।

অশনায়া, অশনায়ী— বুভুক্ষা ; ক্ষুধিত।

অশনায়োগ্র— আহারের ইচ্ছায় উগ্র।

অশোক মিত্র— কৃতী আই. সি.-এস., প্রশাসক ও শিল্প-সমালোচক।

অশ্রুস্মিতা— হাসি-কান্না-বিজড়িতা।

অসাররুদিন— অসার—বৃথা, অপ্রয়োজনীয়। 'রুদিন'—তুর্গেনিভের ওই নামের উপন্যাসের নায়ক।

অসিধার ব্রত— কামশূন্যভাবে যুবক-যুবতীর একত্রবাস।

অস্নাবির— ঈশোপনিষদের অষ্টম শ্লোকে বর্ণিত আত্মার একটি বিশেষণ ; স্নায়ুহীন ; শিরারহিত।

অস্মার— স্মৃতিভ্রংশ ; amnesia.

অস্মারবিলাসী— আমিত্ববোধসম্পন্ন ; জনবিচ্ছিন্ন।

আ

আঁজি— রেখা ; ডোরা ; বর্ণমালার বর্ণ।

আইভান— রুশ নাম, সাধারণ রুশ নাগরিক ; ইংরেজ জন ও জার্মান য়োহান-এর প্রতিরূপ।

আইসায়া— [Isaiah] খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর ইহুদি মহাপুরুষ। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশে এর উপদেশাবলি লভ্য।

আউওল— প্রথম ? শ্রেষ্ঠ ? [ফারসি—আব্বাল]।

আউসবিট্জ (=Oswiecim)—Auschwitz (Poland) পোলান্ডে নাৎসী বাহিনীর ইহুদি হত্যার অন্যতম স্থান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মোট চারলক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল।

আংকোর— [Angor Vat/Wat] শ্যামদেশের (বর্তমান থাইল্যান্ডের) বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির।

আকিতেন— দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের অঞ্চলবিশেষ—যে অঞ্চলের অধিকার নিয়ে শতবর্ষের ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ চলেছিল। কবি বিষ্ণু দে-র উদ্দিষ্ট এ-অঞ্চলের ত্রুবাদুর বা 'চারণ কবি', একাদশ-দ্বাদশ শতকের শাসক ডিউক অব আকিতেন (1071-1126)। ইনিই প্রথম ত্রুবাদুর কবিরূপে পরিচিত।

আঢুল— তন্দ্রালস।

আত্মহা— আত্মঘাতী।

আথেনে— (আথেনা/এথেনা) গ্রিক দেবী Pallas Athena। জ্ঞান, শিল্পকলা, যুদ্ধ ও শান্তির দেবী, ঝঞ্ঝাবায়ুর অধিকর্ত্রী। আথেন্স নগরীর অভিভাবিকা।

আদম-উদ্যান— স্বর্গোদ্যান।

আদাজ্যো— পাশ্চাত্য সংগীতে অপেক্ষাকৃত ধীরগতির গান বা সংগীতের অংশবিশেষ (Adaggio) অথবা ধীরলয়ের ব্যালে নাচ ; (-ফুগে-Fuge সুনির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বনে কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের নিয়ম, শৃঙ্খলাবদ্ধ-পরম্পরায় রচিত সংগীত-পরিকল্পনা।

আধি— মানসিক পীড়া, দুশ্চিন্তা।

আধিদৈবিক— দৈবজাত ; অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প ইত্যাদি জাত।

আনন্দনিষ্যন্দন— যেখান থেকে আনন্দ ঝরে পড়ে।

আন্দ্রমিদা— Andromeda, গ্রিক পুরাণে কথিত ইথিয়োপিয়ার রাজা কেফেউস ও রানি ক্যাসসিওপেইয়ার কন্যা। সমুদ্রদেবতা পোসেইদোনের অভিশাপ একে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, গ্রিক বীর পার্সেউস তা থেকে একে উদ্ধার ও বিবাহ করেন।

আস্বায়— স্পর্ধা, বড়াই।

আমরুয়া— রিখিয়া (বিহারের দেওঘর অঞ্চলে) বিষ্ণু দে-র একটি বাড়ি ছিল—কবি যেখানে প্রায় প্রত্যেকটি ছুটি কাটাতেন। রিখিয়ার পার্শ্ববর্তী দুটি অঞ্চল আমরুয়া-জামরুয়া।

আমুদরিয়া— আফগানিস্তান ও (সাবেক সোবিয়েত ভূখণ্ডের) উজবেকিস্তান সীমানায় প্রবাহিত নদী। প্রাচীন নাম অক্সাস।

আরাগঁ, লুই— বিখ্যাত ফরাসি কবি, কমিউনিস্ট।

আরাল— এশিয়া মহাদেশের কাজাকিস্তান ও তুর্কিস্তানের মধ্যবর্তী অন্তর্দেশীয় সমুদ্র।

আরিজোনা— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উষর রাজ্য।

আর্কেডিয়া— গ্রিসের প্রাচীন বনশোভিত গ্রামাঞ্চল। তা থেকে গ্রামীণ শান্তি ও সরলতাপূর্ণ যে-কোনো অঞ্চল।

আর্টেমিস— Artemis, গ্রিক দেবি। রোমান নাম দিয়ানা (Diana)। শিকারপ্রিয় এই কুমারী অরণ্যজীবনের এবং চন্দ্রের দেবী। দেবতা আপোল্লোর ভগ্নী আর্টেমিসের নগ্ন তনু অকলুষ সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতার প্রতিমা।

আর্তেজীয়— অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে খনিত একশ্রেণীর অতি গভীর কূপের (Artesin Well) নাম।

আর্ষ সত্য— ঋষিদের উচ্চারিত সত্য।

আলকেমি— মধ্যযুগে যে-বিদ্যা ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে অন্য ধাতুকে সোনা করা যায়—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করা হত।

আলতামিরা— স্পেনের সানতানদার-এর প্রস্তরযুগীয় গুহাচিত্র।

আলজীর— আলজিরিয়া। ফরাসিদেশের পরশাসন থেকে মুক্তির জন্য এদেশের মানুষ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে এবং জয়ী হয়।

আলহামব্রা, আলহাম্‌বরা— স্পেনের গ্রানাদার কাছে মধ্যপ্রাচ্যের বিজয়ী শাসকদের (মুর) দ্বারা ১৩-১৪ শতকে নির্মিত বিশাল, স্থাপত্যকৌশল যুক্ত, কারুকার্যময় প্রাসাদ।

আলারিপ্‌পু— দক্ষিণ ভারতের ভারতনাট্যম নৃত্যের সূচনা অংশের একটি বিশেষ রূপবন্ধ।

আলি আকবর— আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সরোদবাদক ; ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর পুত্র।

আলোনা— আলুনি ; লবণাক্ত নয় এমন।

আশাবরী— ভৈরব ঠাটে/মতান্তরে তোড়ি ঠাটে নিবদ্ধ প্রভাতী রাগ (দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গেয়)।

আশীষ (আশিস) বর্মন— কবি ও গল্পকার।

আস্ত্রাখান— ভোলগা নদীর তীরবর্তী রুশ অঞ্চল।

আহবে— যুদ্ধে ; যজ্ঞে।

আহীর ভৈরবে— হিন্দুস্থানী সংগীতের একটি প্রভাতী রাগ।

অ্যাক্-অ্যাক্ (এক-এক কামান)— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে anti-aircraft gun—এই নামে পরিচিত ছিল।

ই

ইকরার-নামা— (=একরার নামা) স্বীকৃতিপত্র, প্রতিজ্ঞাপত্র, দলিল বা-চুক্তিপত্র।

ইকরার পড়া— স্বীকৃতিপত্র পড়া ; স্বীকার করা।

ইটা-ইটি— ইট ছোঁড়াছুড়ি।

ইডেন/ঈডেন— স্বর্গোদ্যান, আদম ও ইভের আদি বাসস্থান।

ইতিহ্ভাগ্য— ইতিহ্=এইরকম, পুরাতন কথা ; ঐতিহ্য। ইতিইভাগ্য—এইরকমই ভাগ্য ; পরম্পরাগত।

ইথাকা— গ্রিসের দ্বীপ। গ্রিক পুরাণের বীর, হোমারের 'ওদিসি' মহাকাব্যের নায়ক ওদেস্‌সেউস বা য়ুলিসিসের রাজ্য।

ইনফেরনো— নরক/পাতাল।

ইনিয়াস/ঈনিয়ুস— [Aeneus] রোমের জাতীয় বীর রূপে আখ্যাত হলেও আনচিসেস ও আফ্রোদিতির পুত্র গ্রিক বীর ইনিয়ুস। ইনিয়াস ট্রয়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ট্রয়রাজ প্রিয়ামের জামাতা এই বীর যুদ্ধপরবর্তীকালে নতুন বাসস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে টাইবার নদীর তীরবর্তী লাতিমুসের রাজ্যে স্থিত হন, তার কন্যাকে বিবাহ করে। বিচিত্র অভিযান ও দিদোর সঙ্গে প্রেমকাহিনী অবলম্বনে ভার্জিল তাকে Aeneid কাব্যের নায়ক রূপে চিত্রিত করেন। রোমানগণ তাকে রোমান জাতির প্রতিষ্ঠাতা—জুপিটার ইনদিজেস—রূপে সম্মান করে থাকেন।

ইফিজেনি (ইফিগেনি)— ১. গ্রিক পুরাণে রাজা আগামেম্‌নন কন্যা ইফিজেনিকে দেবী আর্টেমিসের উদ্দেশ্যে বলি দিয়েছিলেন। দেবী তাকে উদ্ধার করে তার পূজারিণী নিযুক্ত করেন। ২. গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়িকা (ইউরিপিদিসের) ; গ্যয়টে এবং অপেরা রচয়িতা গ্লুকের ট্র্যাজিক নায়িকা।

ইভা-আদম— ইহুদি ও খ্রিস্টীয় পুরাণে স্বীকৃত মানুষের আদি জননী ইভ [Eve] ও আদম [Adam].

ইমার্জেন্ট— [Emergent] উদ্ভূয়মান ; যা (অপ্রত্যাশিত ভাবে) আবির্ভূত হচ্ছে।

ইয়ংকিডুডুল— অ্যামেরিকানদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখা পুরোনো দিনের ব্যঙ্গাত্মক মজাদার ছড়ার গান/গানের সুর। বিপ্লব পূর্ববর্তী কালের রচনা।

ইয়াংচি— চিনের ইয়াংসি-কিয়াঙ নদী।

ইরম্মদ— বজ্রাগ্নি ; মেঘজ্যোতি ; সমুদ্রাগ্নি।

ইরা— ১. বীণা ; পৃথিবী ; সুরা ; জল ; অন্ন ; কশ্যপের স্ত্রী। ২. কবি বিষ্ণু দে-র জ্যেষ্ঠা কন্যা।

ইরাবাবু-তারাবাবু—কবির দুই-কন্যার নামের সঙ্গে 'বাবু' শব্দের যোগ।

ইলেক— মাথার টিকি।

ইসোলড্— [Iseult, Isoeld, Yseult] বহুল প্রচারিত য়ুরোপীয় মধ্যযুগীয় অ্যাংলো-নর্মান প্রণয়গাথার প্রেমিকা নায়িকা। তিনি বীর ট্রিস্টান-এর প্রেমিকা ছিলেন, এবং শেষপর্যন্ত

দু'জনেই দুঃখজনক মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্য : ট্রিস্টান-ইসোলড্।

ঈ

ঈডেন— ইডেন দ্রষ্টব্য।

ঈনিয়স— ইনিয়াস দ্রষ্টব্য।

ঈশা— ১. = ঈসা—হিব্রু—যিশু [Jesus Christ], খ্রিস্টানদিগের ত্রাণকর্তা। যিশুখ্রিস্ট।
২. ঈশ-এর স্ত্রীলিঙ্গ—ঈশ্বরী ; লাঙ্গল দণ্ড ; সীতারেখা ; শিবগৃহিণী।

ঈশাবাস্য দিবানিশা— ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত দিনরাত্রি।

উ

উচ্চাবচ— ১. উঁচুনীচু ; বন্ধুর ; অসমান ; ২. ভালোমন্দ (জ্ঞানেন্দ্রমোহন)।

উচ্চৈঃশ্রবা— ১. হিন্দু-পুরাণে বর্ণিত সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত অশ্ব—উন্নতকর্ণ, শ্বেতবর্ণ, সপ্তমুখ বিশিষ্ট ; ইন্দ্রের বাহন। ২. যে কানে কম শোনে ; বধির।

উজবেগ— ১. রুশদেশের উজবেকিস্তানের মানুষ, তাতার জাতিবিশেষ। ২. তুর্কি ভাষায় উজবক, উজবুক, উজবগ—মূর্খ, আহাম্মক, অশিক্ষিত অর্থে প্রচলিত।

উৎক্রোশ— ঈগলজাতীয় পক্ষীবিশেষ ; কুরর্ বা কুরল পাখি। উচ্চকণ্ঠ কর্কশ চিৎকার।

উত্রিল্লো— ফরাসি চিত্রকর মোরিস উত্রিয়ো (Maurice Utrillo, 1883-1955) পারি শহর ও শহরতলির পথঘাটের দৃশ্যাঙ্কনের জন্য খ্যাত।

উদারা— ভারতীয় সংগীতের নিম্নসপ্তকের সুর।

উর্বশী—১. সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, অনন্তযৌবনা নন্দনবাসিনী অপ্সরা। সমুদ্রমন্থনে অথবা নারায়ণের উরু ভেদ করে এর জন্ম। ঋগ্বেদে প্রচ্ছন্নভাবে এবং 'শতপথব্রাহ্মণে' সম্পূর্ণভাবে উর্বশী ও রাজা পুরূরবার প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নানা কঠিন পরীক্ষার পর গন্ধর্বলোকে পুরূরবা-উর্বশীর চিরমিলন ঘটে। ২. মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী উর্বশী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে কামনা করে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, অর্জুনকে—নপুংসক নর্তক হয়ে স্ত্রীদের মধ্যে বিচরণ করবেন বলে—অভিশাপ দেন।

উলূক— ১. পেচক। ২. ইন্দ্র। ৩. মহাভারতে বর্ণিত শকুনি-পুত্র, যিনি সহদেবের হস্তে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন।

উলূপী, উলুপী— ১. যে মৎস্যদিগকে বিনাশ করে—শিশুক জাতীয় জলজন্তু বিশেষ। ২. নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা, অর্জুন পত্নী ; বভ্রুবাহনের হাতে অর্জুনের মৃত্যু হলে তিনিই নাগলোক থেকে মণি এনে অর্জুনকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

এ

এক-এক কামান— দ্র. অ্যাক্-অ্যাক্।

একাকী বিভেতি— "একা ভয় পায়"। বৃহদারণ্যক উপনিষদে [১/৪/২] প্রজাপতি আত্মা সম্বন্ধে বলা হয়েছে "তিনি ভয় পেলেন, তাই লোকে এখনও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভয় পায়।"

এটাক্সিয়া— [ataxia] কোনো অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণ লোপজনক শারীরিক ব্যাধি।

মাংসপেশীর নিয়ন্ত্রণহীনতা।

এডগার এলেন পো— Edgar Allan Poe (1809-1849) অ্যামেরিকান কবি, গল্পলেখক, সমালোচক।

এডমণ্ড—শেক্‌সপিয়রের কিং লিয়র নাটকের চরিত্র। আর্ল অব গ্লস্টারের জারজ পুত্র।

এথিনা— 'আথেনা'/'আথেনে' দ্রষ্টব্য।

এফেসাস—বহুদিন আগে মৃত ইয়োনীয় গ্রিকদের প্রাচীর শহর। এর আর্টেমিসের মন্দির ছিল প্রাচীন যুগের সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম।

এমডেন— জার্মানির একটি সমুদ্রবন্দর।

এমার্সন— স্টেটসম্যানের প্রাক্তন সম্পাদক। লিন্ডসে এমার্সন। কবির সুহৃদ।

এমিলিয়া— কবি শেলির শেষ প্রণয়িনী।

এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে— কবি দিনেশ দাসের 'কাস্তে' কবিতার অতি-পরিচিত পঙ্‌ক্তি। বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত দু'জনেই এ পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করে কবিতা লিখেছিলেন।

এরস— গ্রিক পুরাণে বর্ণিত কনিষ্ঠতম দেবতা এরস আফ্রোদিতি বা ভিনাস-এর পুত্র। পিতৃ-পরিচয় নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। পক্ষধারী এই প্রেমদেবতা আকৃতিতে শিশু। হিন্দুপুরাণের কামদেবের মতো ইনিও পুষ্পধন্বা।

এরস-মাতা— ভিনাস/ভেনাস দ্রষ্টব্য।

এলা-গেরি— মাটির দুই ভিন্ন রূপ—দুই রঙের কাদামাটির বাদামি এবং কাঁকুরে মাটির গেরুয়া-লাল।

এলসিনোরে— Elsinore. শেক্‌সপিয়রের হ্যামলেট নাটকে ডেনমার্কের রাজার দুর্গপ্রাসাদ।

এলসি-বব— Elizabeth Barret Browning (1806-1861), Robert Browning (1812-1889) ইংরেজ কবি-দম্পতি।

এলেওনোর— হেলেনের অপর নাম।

এসকিমো— বিষ্ণু দে-র যৌবনকালে কলকাতায় প্রচলিত একটি আইসক্রিমের মার্কা-নাম।

এসফল্ট— (asphalt) রাস্তা-বাঁধানোর পিচ।

ও

ওঁ ঊষা বা অশ্বস্য— [বৃহদারণ্যক উপনিষদে] বিগ্রহে যেমন দেবত্ব আরোপিত হয় তেমনই অশ্বমেধের অঙ্গভূত অশ্বে প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ঊষার দৃষ্টি আরোপিত হয়েছে।

ওঅর্ডসওঅর্থ— William Wordsworth (1770-1850) ইংরেজ কবি। কোল্‌রিজের সঙ্গে একত্রে রোমান্টিসিজমের পুনরুজ্জীবনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন।

ওফেলিয়া— শেক্‌সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকে পোলোনিয়াসের কন্যা। হ্যামলেটের অনুরাগিণী নায়িকা, পরে উন্মত্তা।

ওয়লৎস— (Waltz) এক ধরনের মৃদুছন্দময় পাশ্চাত্য নাচ বা নাচের ছন্দে রচিত সংগীত। সাধারণভাবে বলরুমে নারী-পুরুষের যৌথ আবর্তনশীল নৃত্য।

ওয়ার্ধা— নাগপুরের কাছে গান্ধিজির আশ্রম-কেন্দ্র।

ওরায়ন— (Orion) গ্রিক পুরাণে বোয়োটিয়ার বিশালদেহী শিকারি। প্রণয়িনী থোরোপের কৌমার্যহানি করার ফলে অন্ধ, পরে সূর্যের কৃপায় দৃষ্টিলাভ। এখন 'কালপুরুষ' নক্ষত্রমণ্ডলের নাম।

ওরায়ন-প্রিয়া— গ্রিক ও রোমান পুরাণ অনুসারে সুন্দরদেহী শিকারি ওরায়নকে দেখে দেবী ডায়ানা মুগ্ধ হয়ে তার অনুরাগিণী হয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ঘটনাচক্রে তাঁর হাতেই ওরায়নের মৃত্যু হলে, দেবী ডায়ানা-ই তাকে নক্ষত্রমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা করেন।

ক

ককেন— [Cocaine] কোকেন, মাদকদ্রব্য বিশেষ।. শরীর অসাড় করার ভেষজ উপাদান।

কঙ্কন-গুর্জর— ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী মহারাষ্ট্র-গোয়ার কোঙ্কন অঞ্চল ও গুজরাট।

কঙ্কালীতলা— ১. দাঙ্গাকালীন কলকাতার নাম-প্রতীক। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র কঙ্কালী পাহাড় স্মরণীয়। ২. শান্তিনিকেতন-বোলপুর অঞ্চলে কঙ্কালী-তলা (সতীর কাঁকাল বা কোমরের অংশ পড়েছিল বলে এই নাম) একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম।

কচঙ্গন— [শুদ্ধ রূপ 'কচঙ্গল' বা 'কচঙ্গম'] নিঃশুল্ক বিকিকিনির হাট।

কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্‌স— রুশ মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানী ইভান পাভলভ আবিষ্কৃত শারীর মানসিক প্রতিক্রিয়া। কুকুরকে খাবার দেওয়ার সঙ্গে ঘন্টাধ্বনি করে দেখা গেল যে, এরপরে শুধু ঘন্টাধ্বনি শুনলেই কুকুরের লালাক্ষরণ হয়। এই প্রতিক্রিয়া কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্‌সের দৃষ্টান্ত।

কপিলগুহা— গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে সগর সন্তানদের মুক্তিলাভের স্থান ; কবির কাছে উত্তরণ ও শাপমুক্তির প্রতীক।

কমিশরিআট/কমিশরিয়ট— [Commissariat] যুদ্ধে সৈন্যদের খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহের বিভাগ।

করকা— মেঘজাত শিলা।

করকাধারা— শিলাবৃষ্টি।

করপ্র জাবেদা— কবন্ধ জাবেদা ? দ্বিতীয়টির অর্থ নির্মম আইন, মস্তিষ্কহীন, অমানবিক রীতিনীতি।

করবেট— কুমায়ুন অঞ্চলের বিখ্যাত শিকারি জিম করবেট—যাঁর স্মৃতিতে 'করবেট ন্যাশনাল পার্ক'-এর নামকরণ করা হয়েছে। করবেট রচিত *Maneatrs of Kumaon* অসামান্য শিকার কাহিনী।

করিন্থীয় আয়নডোরীয়— স্থাপত্য শিল্পে তিন ধরনের গ্রিক রীতি,—ডোরিক, আয়োনিয়ান, করিন্থিনিয়ান। ডোরীয়রীতি এদের মধ্যে সবচেয়ে সরল ; ভারিস্তম্ভগুলি গোলাকার খাঁজকাটা, স্তম্ভশীর্ষ বা capitalও অনলংকৃত। তুলনায় আয়োনিক রীতিতে স্তম্ভশীর্ষগুলি অলংকৃত, স্তম্ভগঠনেও বৈচিত্র্য আছে। গ্রিক স্থাপত্যের সবচেয়ে জমকালো অলংকরণের প্রকাশ করিন্থিয়ান রীতিতে। স্তম্ভগুলি হালকা ধরনের, স্তম্ভশীর্ষ ঘন্টাকৃতি এবং তাতে লতাপাতা খোদাই করা।

কসাক— (Cossak) দক্ষিণ সোভিয়েত (অবিভক্ত) অঞ্চলের অশ্বচালনানিপুণ বীর জনগোষ্ঠী।

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম— ঋগ্বেদের ১০। ১১। ২ শ্লোক : "কোন্ দেবতাকে হবি(=ঘি) বিধান করব ?" অর্থাৎ কাকে পুজো করব ?

কাওয়াজ— অভ্যাস/কুচকাওয়াজ ; parade.

কাকটুস গ্রাণ্ডিফ্লোরা— বড় ফুলওয়ালা এক ধরনের ক্যাকটাস বা ফণিমনসা।

কাজাক— একদা সোবিয়েতের কাজাকিস্তানের অধিবাসী কিরঘিজ সম্প্রদায়ের মানুষ।

কাটিকুণ্ড— বিহারের দুমকার কাছে সাঁওতাল গ্রাম। কবি বিষ্ণু দে উইলিয়াম আর্চারের সঙ্গে

সেখানে গিয়ে সাঁওতালদের উৎসব দেখেন।

কান্ট— Immanuel Kant (1724-1804); জার্মান দার্শনিক।

কান্টের শহর— কান্টের জন্মস্থান ক্যোনিক্‌স-বুর্গ [Konigsburg]। শোনা যায় নিজের এই শহর ছেড়ে কান্ট চল্লিশ মাইলের বেশি দূরে কখনো যাননি।

কাফি— সিন্ধু রাগের সমপ্রকৃতিক এই রাগ রাত্রিবেলায় গাওয়া হয়। বসন্ত-উৎসব হোলির গানের অনেক বন্দিশ কাফিরাগে শোনা যায়।

কাফুন— =কাফন। মৃতদেহ আচ্ছাদনের বস্ত্র।

কামরাদা (কমরেড)— স্প্যানিশ উচ্চারণে কামরাদা-র আদি অর্থ ১. কক্ষসঙ্গী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ; একই নীতিতে বিশ্বাসীরা কর্মক্ষেত্রে অংশীদার। ২. কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে পরস্পরকে সম্বোধন করার রীতি।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়— (1917-1976)। শিশু সাহিত্যিক ও কবি। বিষ্ণু দে-র অনুজকল্প লেখক ; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ। পিতা—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। রুশ সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদক। "রং মশাল" পত্রিকার সম্পাদক।

কারবন— অঙ্গার।

কারাকোল— =কারাকুল ; সোভিয়েত তাজিকিস্তানের অন্তর্গত পার্বত্য হ্রদ।

কারারা— রিখিয়ায় নুড়ি পাথর দিয়ে ঘেরা একটি সুন্দর জায়গায় নির্মিত ফোয়ারা।

কার্নিভাল— য়ুরোপীয়/পশ্চিমি মেলা ও উৎসব।

কাসান্ড্রা, কাসান্দ্রা— ট্রয়ের রাজা প্রিয়াম ও হেকুবার কন্যা। সে অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী করত, কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করত না। গ্রিক সেনাপতি আগামেম্‌নন তাকে দাসী করে নিয়ে আসে, কিন্তু তার স্ত্রী ক্লুতেম্‌নেস্ত্রা কাসান্দ্রাকে হত্যা করে।

কাসানোভা— (Casanova, Giovanni Jacopo, 1725-1798)—ইতালীয় নাগর ব্যক্তি, তাঁর রচিত প্রণয়লীলামদির স্মৃতিকথার জন্য বিখ্যাত।

কিণ্বস্রাবী— গেঁজে-ওঠা সুরারস বর্ষণ করে এমন।

কিতার— (আরবি শব্দ) কাতার, সারি।

কিয়েফে— কিয়েফ প্রাক্তন সোবিয়েতের নগরী।

কুবলাই খান (1216?-1294)—মোঙ্গোল সম্রাট চেঙ্গিস খানের পৌত্র ; মোঙ্গোল সম্রাট রূপে চিনদেশে 1259-1294 পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করেন। স্মরণীয় : মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনী।

কুম্ভীরক— চোর ; রচনাচোর ; plagiarist.

কুয়ে— (Emile Coue, 1857-1926)। ফরাসি মনোবিজ্ঞানী ; জীবন সম্বন্ধে এঁর দুর্মর আশাবাদ ছিল।

কুরুমণ্ডূক— কুরুবংশীয় যে সব বীরেরা মণ্ডূক বা ব্যাঙের মতো আচরণ করেছিল ; ভীষ্ম, বিদুর, প্রভৃতি কুরুবীরদের ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে।

কূর্মধর্মে— কচ্ছপের ধরনে : কঠিন আবরণের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখার অভ্যাসে।

কেনিয়াট্টা— (Jomo Kenyatta) কেনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং কৃষ্ণ আফ্রিকার নেতা জোমো কেনিয়াট্টা।

কেন্টিস কুমারস্বামী— (আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী) প্রখ্যাত শিল্পকলা-সমালোচক ও নন্দনতত্ত্ববিদ্‌।

কেলসন— (George Nathaniel Curzon, 1859-1925) লর্ড কার্জন Kedleston বা কেলসন

অঞ্চলের প্রথম ব্যারন এবং প্রথম মার্কুইস ছিলেন। ইংরেজ রাজনীতিক ; ভারতবর্ষের ভাইসরয়। ১৯০৫-এ ইনি প্রথম বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন।

কেলাসিত— দানাবাঁধা, স্ফটিকীভূত।

কোঙ্কন— কঙ্কন-গুর্জর দ্রষ্টব্য।

কোডা— কোনো অনুষ্ঠান বা রচনার শেষ ও চূড়ান্ত অংশ ; পুচ্ছ।

কোয়ার্টেট— ১. সাধারণভাবে চারজন লোকের দল ; অথবা চারটি বস্তুর সমাহার। ২. সংগীতের ক্ষেত্রে চারটি যন্ত্র বা চারটি কণ্ঠস্বরের জন্য রচিত সুর। অথবা চারজন সংগীত-শিল্পী।

কোল্‌রিজ— (Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834)। ইংরেজ রোমান্টিক কবি ও সমালোচক।

কৌল— কুলগত।

ক্যান্টিলিভার— খিলান ; দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা গাঁথনি যা কার্নিশ বা ব্যালকনিকে ধরে রাখে। ক্যান্টিলিভারের উপরে সেতুও নির্মিত হয়।

ক্যাফিন— কফি, চা, কোকো ইত্যাদির মূল উদ্দীপক উপাদান (Caffeine)।

ক্রকচ— করাত।

ক্রতুকৃতম্— 'বৃহদারণ্যক' প্রভৃতি উপনিষদে 'ক্রতু' শব্দটি সাধারণ অর্থে যজ্ঞ বোঝায়। 'উৎসর্গ'-এর আরেক অর্থ। ক্রিয়া (ritual), ক্রিয়ার সাধন ও ক্রিয়াফল—এ তিনটি নিয়েই ক্রতু। 'ক্রতুকৃতম্' কথাটির অর্থ—যে-ক্রতু সম্পন্ন হয়েছে—কৃতকর্ম, দায়ভাগ।

ক্রিস্টিয়ান— [Christian] ১. খ্রিস্টান, খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাসী। ২. বানিয়ানের 'পিল্‌গ্রিম্‌স প্রগেস' [Pilgrim's Progress]-এর কেন্দ্রীয়-চরিত্র।

ক্রীট-সাততলা— পূর্ব ভূমধ্যসাগরের ইজিয়ান সমুদ্রে ক্রীট একটি দ্বীপ। এই অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১১০০ অব্দের প্রাচীন মিনোয়ান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ক্রীটের ক্নোসসুস শহরে নগরপত্তনের সাতটি স্তর লক্ষ করা গেছে।

ক্রেসিডা— ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় পুরাণে,— চসারের ট্রয়লাস এবং ক্রেসিডে, এবং শেক্‌সপিয়রের ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার এক ট্রোজান কন্যা—যে প্রেমিক ট্রয়লাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছিল।

ক্লাইভ— (Robert Clive, 1725-1774) অষ্টাদশ শতকের ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাপতি যিনি 1757-র যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে পূর্বভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার ডালহৌসি (বিবাদি বাগ) অঞ্চলে ক্লাইভ স্ট্রিট (বর্তমান নাম নেতাজী সুভাষ রোড) লর্ড ক্লাইভের স্মৃতিতে নামাঙ্কিত হয়েছিল। কবি সেই রাস্তাটিকেই স্মরণ করেছেন।

ক্লিয়োপেট্রা— খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে (৬৯-৩০ খ্রিস্টপূর্ব) মিশরের সম্মোহিনী রানি। রোমান বীরশ্রেষ্ঠ জুলিয়াস সীজার ও মার্ক এন্টনির প্রণয়িনী।

ক্লোস আপ— (Close Up) খুব সামনে-থেকে-তোলা মুখমণ্ডল বা অন্য যে-কোনো বস্তুর নির্বাচিত অংশের ছবি।

ক্ষামা— ক্ষীণা ; পৃথিবী।

ক্ষেড়নাট্য— বহু অর্থযুক্ত ক্ষেড় কথাটির একটি মানে হল (সিংহের) গর্জন, বা যুদ্ধের হুংকার, বা চিৎকার চ্যাঁচামেচি। কবি এতে "খেউড়ে"র অনুষঙ্গ এনেছেন মনে হয়।

খ

খসরু বেগ— কোনো কল্পিত টেনিস খেলোয়াড়।

খারকভ, খার্কভ— আগেকার সোবিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেন রাজ্যের বড় নগর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। নাৎসি বাহিনীর হাতে দু'বার পরাজিত এ শহরের বিষাদ ও আশ্বাস আছে এ কবিতায়।

খিদমদগার— সেবক ; ভৃত্য।

খেদা— হাতি ধরবার ফাঁদ ; বিতাড়ন।

খ্রুশ্চেফ— রুশ নেতা নিকিতা সেরগেইয়েভিচ খ্রুশ্চেভ।

গ

গগনভেড়— =গগনবেড় (Spotted-billed/Grey-pelican—Pelecanus philippensis) ভারতের বাসিন্দা জলচর এই পাখির ঠোঁটের নীচে খাদ্যসংগ্রহের একটি থলি থাকে। এই পাখিরা নিজস্ব উপনিবেশ গড়ে তোলে। উড়ন্ত অবস্থায় ওদের দেহ ভাসমান নৌকার তলদেশের মত দেখায়।

গড্ডল— গাড়ল ; ভেড়া ; মেষ।

গণ্ডেরির মহারাজ— কল্পিত ভূ-স্বামী। পরশুরামের "শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী· লিমিটেড" গল্পের গণ্ডেরিয়াম বাটপাড়িয়া নামটি থেকে ওই স্থানটি আহৃত বলে মনে হয়।

গণ্ডোয়ানা— সৃষ্টির সূচনাবপর্বে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে যে আদিম অঞ্চল তাকে 'গণ্ডোয়ানা' বলা হয়।

গথিক ক্যাথিড্রাল— তীক্ষ্ণ চূড়াবিশিষ্ট ইয়োরোপীয় রীতির গির্জা। দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে গথিক স্থাপত্যরীতির বিকাশ ঘটে।

গনেরিল— শেক্‌সপিয়রের 'কিং লিয়র' নাটকে লিয়রের দুষ্টচরিত্র জ্যেষ্ঠা কন্যা। দ্র. রিগান।

গম্‌হার— গামার গাছ।

গাংটা— মুঙ্গেরের নিকটবর্তী জঙ্গল।

গার্ডেনিয়া— গন্ধরাজফুল (সাদা, সুগন্ধি গ্রীষ্মের ফুল)।

গুলবদন— ফুলের মতো (সুন্দর) মুখ যার।

গোর্নিকা— (Pablo Picasso) পিকাসো-র বিখ্যাত যুদ্ধবিরোধী চিত্র। ১৯৩৭-এ স্পেনের গোর্নিকা শহরে ফ্যাসিস্তদের বোমা বর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় আঁকা।

গেহেনা— (Gehenna) ১. বাইবেলে উল্লিখিত হিনস-এর উপত্যকা যেখানে আবর্জনা স্তূপ করা হত এবং রোগ সংক্রমণ এড়াবার জন্য সর্বদা যেখানে আগুন জ্বলত। ২. নরক বা যেখানে পুড়িয়ে মারা হয়, অত্যাচারের স্থান।

গোপাল ঘোষ— 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। অসামান্য নিসর্গচিত্রের শিল্পী।

গোপীকন্দর— দুমকা থেকে পাকুড়ের পথে— কাটিকুণ্ডর পরবর্তী গ্রাম ও ডাক-বাংলো।

গোবর গুহ (১৮৯২-১৯৭২)— বিখ্যাত কুস্তিগীর যতীন্দ্রচরণ গুহ। ইনি "গোবরবাবু" নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন।

গোবি— এশিয়ার মঙ্গোলিয়ার বিখ্যাত মরুভূমি।

গোমোরা— (Gomorrah, Gomorrha) ১ বাইবেলে উল্লিখিত সোদোম ও গোমোরা, শহর দুটি

শহরবাসীদের পাপের ফলে স্বর্গীয় আগুনে ধ্বংস হয়েছিল। ২. যে কোনো শয়তানের শহর।
গোরোচনা গোরী— গরুর পিত্তের উজ্জ্বল পীত বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণা সুন্দরী।
গোর্কি (Maxim Gorky, 1868-1936)— ছদ্মনাম—আলেক্‌সেই ম্যাক্সিমোভিচ পিয়েশকভ; সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত রাশিয়ার ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার।
গোলমোর— =গুলমোর, গুলমৌর; কৃষ্ণচূড়া (Poinciana regia)। ময়ূরের পাখার মতো পুষ্পবিন্যাসের জন্য নাম—গুলমৌর।
গোল্ডেন রক—মাদ্রাজের ত্রিচিনোপল্লীর রেলওয়ে ইয়ার্ড, তৎকালীন কমিউনিস্ট শ্রমিক আন্দোলনের একটি বড় ঘাঁটি।
গ্যালাহাড— ইংলন্ডের রাজা আর্থারের (আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর) কিংবদন্তিসমূহের বীরচরিত্র। ইনি ল্যান্সেলট এবং ইলেইনের পুত্র ছিলেন এবং চারিত্রিক মহত্ত্ব ও পবিত্রতার জন্য যিশু খ্রিস্টের পবিত্র পাত্র (Holy Grail) অনুসন্ধানে সফল হয়েছিলেন।
গ্রাৎসিয়া— ফরাসি লেখক রোমাঁ রোল্যাঁ-র 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাসের নায়িকা।
গ্রেকো— গ্রেকো— (Ell Greco, 1541-1614) গ্রিক-উদ্ভবের স্পেনীয় চিত্রশিল্পী।
গ্রোসফুগে— বেটোফেনের (Beethoven, Ludwig Von, 1770-1827) একটি সুরনির্মিতি। সাধারণভাবে পাশ্চাত্য সংগীতে যন্ত্র ও কণ্ঠের সহযোগে নিয়মবদ্ধ গ্রন্থনাকে ফ্যুগ বলা হয়।
গ্লুক— (Christoph Willibald Gluck, 1714-1787) জার্মান সংগীত-রচয়িতা।
গ্লেসিয়ার— হিমবাহ।

চ

চক্রান্তি— চক্রান্ত? চক্রের বা চক্রান্তের শেষ?
চংক্রমণ— বারংবার ঘোরা।
চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়— কবি, বিষ্ণু দে-র অনুজ বন্ধু। দান্তের অনুবাদক।
চন্দ্রাপীড়— ১. শিব। ২. বাণভট্টের কাদম্বরী কাব্যে তারাপীড়ের পুত্র।
চার্চিল— (Sir Winston Leonard Spencer Churchill, 1874-1965) ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী (1940-1945; 1951-1955)। 1953 খ্রিস্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
চিৎকাট— রিখিয়া অঞ্চলের একটি পুরোনো বাঙালি পল্লি।
চেক (Check)— দাবার কিস্তি।
চেলিউশকিন— অষ্টাদশ শতকের রুশ নাবিক ও অভিযাত্রী। ইনি ১৭৪৯-এ এশিয়ার উত্তরতম অন্তরীপে পৌঁছোন। এরই নামে অন্তরীপের নাম।
চেলো (Cello)— বড় বেহালার মতো দেখতে এক ধরনের পশ্চিমি তারযন্ত্র। মূল নাম Violin-Cello.

ছ

ছোটবউ— রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী।
জগৎপুষা— জগতের সূর্য।
জগদীশ বসুর মিমোসা— বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু (1859-1937), মিমোসা (Sensitive plant)

বা লজ্জাবতী গাছ নিয়ে উদ্ভিদের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন।
জগ্ধতৃণ— 'জগ্ধ' শব্দের অর্থ ভক্ষিত ; 'জগ্ধতৃণ'—ঘাস যেখানে নষ্ট হয়ে গেছে।
জরৎকারী— =জরৎকারু (স্ত্রী)। নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারুই দেবী মনসা, আস্তীক মুনির মাতা।
জরিষ্ণু— বার্ধক্যভারে পীড়িত।
জলুকা— জোঁক [অশুদ্ধ, নিপাতনে সিদ্ধ প্রয়োগ 'জলৌকা']
জাঠা— মিছিল।
জামেয়ার— সমস্ত জমিতে নকশা তোলা দামি শালবিশেষ।
জায়ুজ— জয়= রোগনাশক ওষুধ। জায়ুজ (ব্যাধি)—অর্থে দীর্ঘকাল ধরে ওষুধ খাবার পরে, ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় যে চিররোগের লক্ষণ দেখা যায় ; drug disease.
জিজীবিষু— বাঁচতে ইচ্ছুক।
জিনিয়াস— প্রতিভা।
জিল্‌হা বিলম্বিত— ঢিমা বা ধীর লয়ে জিল্‌হা রাগ। জিল্‌হা সাধারণ ভাবে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। স্বর্গীয় আলাউদ্দীন খানের সরোদে বিলম্বিত জিল্‌হা'-র রেকর্ড আছে।
জীন্‌স্‌— (Sir James Hopwood Jeans, 1877-1946) ইংরেজ গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানগ্রন্থের লেখক। *The Mysterious Universe* বিখ্যাত গ্রন্থ।
জুডাস— Judas Iscariot—যিশু খ্রিস্টের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম। ইনি ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার জন্য প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, যিশুকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।
জেবলী— কোনো ফুলের নাম ?
জ্যোকন্দা— ইতালীয় শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci, 1452-1519) অঙ্কিত La Giocanda নামে চিত্র—যেটি সাধারণভাবে 'মোনালিসা' নামে জগদ্বিখ্যাত।
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র— (1911-1977) বিখ্যাত কবি, গায়ক ও সুরস্রষ্টা এবং গণনাট্য-সংগঠক। 'বটুকদা' নামে সর্বপ্রিয় ছিলেন।

ঝ

ঝিঁঝিট— রাগবিশেষ ; খাম্বাজ রাগের সমপ্রকৃতিযুক্ত, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গেয়।

ট

টাইমন— শেক্‌সপিয়রের 'Timon of Athens' নাটকের নায়ক। মানববিদ্বেষ এর চরিত্রের মূল প্রবণতা।
টাইরেসিয়াস— তিরেসিঅস্‌, গ্রিক পুরাণে প্রসিদ্ধ দীর্ঘায়ু ও অন্ধ ভবিষ্যদ্দর্শী। সোফোক্লেসের (খ্রি. পূ. 496-406) অয়দিপৌস নাটকের অন্যতম চরিত্র। প্রাচীন গ্রিসে ভবিষ্যদ্দর্শীদের একটি সাধারণ নাম।
টারম্যাক— বিমানঘাঁটির বাঁধানো সরণি, যার উপর বিমান নামে।
টাহিটি— তাহিতি, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সমান দূরত্বে অবস্থিত দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ফরাসি-অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জের একটি (আয়তন ৬০০ বর্গমাইল)। পল গগ্যাঁর

(Paul Gauguin, 1848-1903) 1890 পরবর্তী অজস্র ছবির পটভূমি।

টিএবিসি— [TABC] টাইফয়েড ও কলেরার প্রতিরোধক ইঞ্জেকশন।

টিমবক্টু— (Timbuktu) নাইজার নদীর তীরে পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসি অধিকৃত সুদানের মালি রাজের শহর। ফরাসি নাম Tombouctou.

টিরানোসরাস— (=Tyrannosaur) উত্তর অ্যামেরিকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসর জাতীয় অতিকায় প্রাণী ; দু-পেয়ে এবং মাংসাশী।

টেনেসি— ১. অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলের একটি প্রদেশ। ২. ওই নামের নদী যা টেনেসি, আলাবামা ও কেনটাকি দিয়ে বয়ে এসে ওহায়ো নদীতে মিশেছে।

টেমস— দক্ষিণ ইংল্যান্ডের নদী যা পূর্ববাহিনী হয়ে রাজধানী লন্ডনের মধ্য দিয়ে বয়ে এসে উত্তর সাগরে পড়েছে।

টোলোডো— তোলেদো, স্পেনের মধ্যাঞ্চলের বিখ্যাত শহর। নানা স্থাপত্যকর্মে সমৃদ্ধ এ নগর এল গ্রেকো-র একটি ছবির বিষয়। এখানকার গথিক গির্জাও বিখ্যাত।

ট্রয়— উত্তর-পশ্চিম এশিয়া মাইনরের একটি প্রাচীন নগরী, অন্য নাম ইলিয়াম। হোমরের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যে বর্ণিত গ্রিক ও ট্রোজানদের যুদ্ধের পটভূমি।

ট্রয়লাস— গ্রিক বীর (ট্রয়ের রাজা প্রিয়াম ও রানী হেকুবার এক ছেলে) অবিশ্বাসিনী ক্রেসিডার প্রণয়প্রার্থী। শেক্সপিয়রও এঁদের প্রণয়কাহিনী নিয়ে কাব্যরচনা করেছেন ; তবে এ-আখ্যানের সঙ্গে গ্রিক পুরাণের বিশেষ যোগ নেই।

ট্রিস্টান—ইসোলড় [Tristram/Tristran/Tristan- Isolde] ইয়োরোপের মধ্যযুগের অসাধারণ বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনী। আয়ার্ল্যান্ড থেকে সমস্ত ইয়োরোপে প্রচারিত। কর্নওয়ালের রাজা মার্কের আদেশে তার নাইট বীর ট্রিস্টান ভাবী রানি ইসোলড়কে আয়ার্ল্যান্ড থেকে নিয়ে আসবার জন্য যান। পথিমধ্যে নির্বুদ্ধিতাবশত মায়ামদিরা পান করে পরস্পরের প্রতি গভীর প্রণয়াসক্ত হন এবং শেষপর্যন্ত একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন। এই কাহিনীর নানা রূপান্তরও প্রচলিত আছে। দ্রষ্টব্য—ইসোল্ড।

ট্রুমানি— ট্রুমান সম্বন্ধীয় (Harry S. Truman, 1884-1972) অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তেত্রিশতম রাষ্ট্রপতি (1945-53)।

ড

ডন জুয়ান, —যুয়ান— স্পেনীয় কিংবদন্তির প্রলুব্ধকারী, কামলিপ্সু নায়ক—যাকে শেষপর্যন্ত নরকে যেতে হয়। মলিয়ের, বায়রন, মোৎসার্ট, বানার্ড শ-রচিত নাটক, কাব্য ও অপেরা সংগীতের নায়ক চরিত্র।

ডরথি—কবি ওআর্ডসওঅর্থ (Willam Wordsworth, 1770-1850)-এর বোন (1771-1855)। এঁর জার্নাল বা ডায়েরিগুলি বিখ্যাত।

ডায়ানা— গ্রিক দেবী আর্টেমিসের রোমক নাম। চাঁদের অধীশ্বরী এই দেবী কৌমার্যের এবং শিকারেরও দেবী।

ডায়ার— পঞ্জাবের জালিওয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের (1919) কুচক্রী নায়ক জেনারেল ডায়ার (Dyer)।

ডায়ার্কি— ১. দ্বৈতশাসন ; 1919 খ্রিস্টাব্দে ভারতের তৎকালীন ইংরেজ শাসকগণ আইন করে, ভারতের নয়টি প্রধান প্রদেশে দ্বৈতশাসন জারি করে, যেখানে শাসনভার ইংরেজ শাসক ও

প্রাদেশিক শাসনকর্তার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। ২. দ্বিতীয় অর্থে—জেনারেল ডায়ারের আধিপত্য বোঝাচ্ছে; অর্থাৎ আইনত পঞ্জাবের শাসনকর্তা না-হওয়া সত্ত্বেও, জেনারেল ডায়ারের ইচ্ছা-ই ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল—এই অর্থে ডায়ারের বেনামি শাসন ইংরেজ-শাসনের নামে।

ডার্বি— দ্বাদশ আর্ল অব ডার্বি (ইংল্যান্ডের ডার্বিশায়ারে) প্রতিষ্ঠিত (1780) ঘোড়দৌড়ের বাজি বা লটারি খেলা। লন্ডনের নিকটস্থ সারে-র এপসাম ডাউন্সে এই ঘোড়দৌড় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

ডালহুসি— কলকাতার, অফিসপাড়া ডালহৌসি এলাকা—বর্তমান বিবাদি বাগ। বৃহৎ পুঁজি ও বাণিজ্য পরিচালনা কেন্দ্র।

ডিয়োটিমা— দিয়োতিমা, গ্রিসের আথেন্স নগরীর রূপোপজীবিনী; দার্শনিক সোক্রাতেস (470-399 খ্রিস্টপূর্ব)-এর অনুরাগিণী ও প্রেরণাদাত্রী হিসাবে প্রসিদ্ধা।

ডেজি ভায়োলেট— ডেইজি (Daisy) ও ভায়োলেট (Violet)— বিশেষত ইয়োরোপ অঞ্চলের পরিচিত দুটি সাধারণ ফুলের নাম।

ডোরীয়— গ্রিক স্থাপত্যের সরলতম রূপ। দ্রষ্টব্য—করিন্থিয়-আয়ন-ডোরীয়।

ড্যানায়ে—গ্রিক পুরাণে আর্গোসের রাজা আক্রিসিউসের কন্যা। এর সন্তান মাতামহকে হত্যা করবে—এই ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে আক্রিসিউস ড্যানায়েকে গোপন কক্ষে বন্দি করে রাখেন। সেখানে দেবরাজ জিউসের সঙ্গে গোপন মিলনের ফলে পুত্র পেরসেউস-এর জন্ম হয়। পরে এরই হাতে মাতামহের মৃত্যু ঘটে।

ড্রেন-পাইপ— একধরনের 'চোঙা-প্যান্ট'।

ত

তৎসৎ— তিনিই নিত্য; তিনিই ব্রহ্ম।

তাইগা— রুশ এই শব্দটির অর্থ চিরহরিৎ বনাঞ্চল; সাধারণভাবে সুমেরুর তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলের দক্ষিণে ইউরেশিয়া ও উত্তর অ্যামেরিকায় এই পাইনজাতীয় অরণ্যভূমি দেখা যায়।

তাজিক— (Tadzhik), মধ্য এশিয়ায়, সাবেকি সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত দেশের তাজিকিস্তানের অধিবাসী; ইরানীয় বংশোদ্ভব।

তানাকা সান— দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে তোকিয়া-প্রতিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত জাপানি সেনাপতি তানাকা। ('সান'—সম্ভ্রমাত্মক প্রত্যয়) সম্রাটের আত্মসমর্পণে ইনি আত্মহত্যা করেন।

তিতো— মার্শাল জোসিপ ব্রোজ টিটো, যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট নেতা ও একসময়ের রাষ্ট্রপ্রধান।

তুণ্ডপত্রময়— 'তুণ্ড' শব্দটির অর্থ ওষ্ঠাধর বা চঞ্চু। চঞ্চু-আকৃতির পাতা? ২. তুণ্ডকারী—কাপাস তুলোর গাছ।

তুন্দ্রা— রুশ এই শব্দটি—সুমেরু অঞ্চলের বৃক্ষহীন, প্রায় সমতল, বিকীর্ণ যে-কোনো ভূখণ্ডকে বোঝায়। যেমন—সোবিয়েত রাশিয়ার তুন্দ্রাঞ্চল সাইবেরিয়া।

তেম রুসে— রুশ সুরস্রষ্টা।

তেলানা— না দের দানি দীম তানা তোম তেলেনা, আলালিয়া লুম— এরকম কতগুলি নিরর্থক শব্দ রাগ ও তাল যোগে গাওয়াকে তাড়ানা/ তেলানা/তিল্লানা বলে। ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা তিনরীতিতে তাড়নার ব্যবহার হয়। এবং ভারতনাট্যম নৃত্যে তাড়ানার সঙ্গে যে নৃত্য রীতি

ব্যবহার হয় তাকে তিল্লানা বলে। আনন্দ-উল্লাসে বিহুল হয়ে গীতবদ্ধ রচনা তুচ্ছ করে সম্ভবত, অর্থহীন তিলানা গাওয়ার রীতি প্রচলিত হয়।

তেহাই— =(ত্রিঘাত) সংগীতে তালের সমাপ্তি স্বাভাবিক করবার জন্য ঠেকার বোলে (তবলায়) তেহাই ব্যবহার করবার রীতি। পরপর তিনটি সমকালিক প্রবল প্রস্বন—এবং শেষটিতে সম্ দেওয়া—তাকেই তেহাই বলে। এখন কণ্ঠে বা যন্ত্রে ও ঠেকার অনুরূপ 'তেহাই'-এর প্রচলন হয়েছে।

তেহি নো দিবসা গতা— সেই দিনও অতিক্রান্ত।

তোড়ী/তোড়ি— প্রাতঃকালে, দিবা দ্বিতীয় প্রহরের এই রাগ যাবতীয় শ্রেষ্ঠ রাগের অন্যতম। তোড়ি, দরবারি তোড়ি, শুদ্ধ তোড়ি এবং মিয়াঁকী তোড়ি মূলত একই রাগ।

ত্রিকূট— রিখিয়ার নিকটবর্তী পাহাড়।

ত্বমসি— তুমিই হও। (ত্বম্+অসি)

দ

দক্ষজা— দক্ষকন্যা সতী ; দুর্গা।

দক্ষিণরায়— মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সুন্দরবনের বনদেবতা বা ব্যাঘ্রদেবতা।

দন্তুর— দাঁতাল।

দম্ভোলি— বজ্র।

দর্ব— রাক্ষস, বাসনারূপ রাক্ষস ; হিংস্রপ্রাণী, ধনসম্পত্তি।

দানিয়ুব— ইয়োরোপের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানি থেকে উৎসারিত, পূর্ববাহিনী হয়ে রোমানিয়া-হাঙ্গেরির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণসাগরে পড়েছে। বিকল্প নাম—দোনাও, দ্যুনা, দুনাভ্রিয়া।

দান্ত— দমিত, সংযত, শাসিত।

দা ভিঞ্চি— লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (1452-1519) মোনালিসার স্রষ্টা ইতালীয় চিত্রশিল্পী ও বহুমুখী প্রতিভা। আরও দ্রষ্টব্য : জ্যোকন্দা।

দামিন, দামিন কো-- সাঁওতাল পরগনার মালভূমি অঞ্চল বিশেষ ; সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মৃতিজড়িত। (কো, কোহ্= ফারসিতে পাহাড়)।

দামিনী— রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নারী-চরিত্র।

দিউগাশভিলি— (Iosif Vissasionovich Dzhugashvili, 1879-1953) সোবিয়েত রুশের রাষ্ট্রনায়ক যোসেফ স্তালিনের আসল নাম।

দিগরিয়া, দিঘারিয়া— রিখিয়া-র নিকটবর্তী ত্রিকূট পাহাড়-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।

দিতি— হিন্দুপুরাণে দৈত্যদের মাতা, প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, কশ্যপ মুনির পত্নী।

দিনীপার— (Dniepur) উচ্চারণে—'নীপার', পশ্চিম সোবিয়েত রুশ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দীর্ঘকায় নদী, কৃষ্ণসাগরে গিয়ে মিশেছে।

দুও-কনচেরতান্তে— দুটি বাদ্যযন্ত্রের জন্য রচিত মোট্সার্টের একটি সুরনির্মিতি।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য— কালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে আকাশ-রথ থেকে সমুদ্রবেলাভূমির বর্ণনার অংশ। অর্থ— 'দূর থেকে সরু লোহার চাকার মতো।'

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়— (1918-1993) দর্শনের অধ্যাপক ; ভারতের বস্তুবাদী দর্শন সম্বন্ধে এঁর গবেষণা বহুখ্যাত।

দেবুত্যাঁৎ— ইয়োরোপীয় অভিজাত সমাজে কোনো নারীর সামাজিক অনুমোদনসহ প্রথম আবির্ভাব (সাধারণত সামাজিক নৃত্যে অংশগ্রহণ); মঞ্চে/চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশকারিণী অভিনেত্রী।

দেরাঁ— (Andre Derain, 1880-1954) ইমপ্রেশনিস্ট গোষ্ঠীর পরবর্তীকালের ফব্-বাদী ফরাসি চিত্রকর। উজ্জ্বল রঙের ছবি আঁকতেন।

ধ

ধন্বন্তরি— ১. সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র থেকে জাত দেবচিকিৎসক। ২. অত্যন্ত দক্ষ চিকিৎসক; রোগনির্ণয় ও নিরাময়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়— (১৮৯৪-১৯৬১) প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সংগীততাত্ত্বিক অধ্যাপক।

ধ্বন্যালোক— আনন্দবর্ধন (নবম শতাব্দী) রচিত অলংকারশাস্ত্র; কবিতার প্রয়োগের দিক থেকে বলা যায়—ইন্দ্রিয়সৌন্দর্য; ধ্বনিতে আলোতে, শোনায় দেখায়।

ন

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্— 'সেখানে চক্ষু বা বাক্য যেতে পারে না'—কেনোপনিষদে (১/৩) ব্রহ্মের বর্ণনা।

নর্মাচার— ক্রীড়াকর্ম।

নহুষেরা— ১. বৈদিক সাহিত্যে নহুষ অর্থে মানুষ বোঝানো হত। ২. পুরাণ কাহিনীতে রাজা যযাতির পিতা যিনি পুণ্যবলে ইন্দ্রত্বলাভ করেন, কিন্তু চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে পতিত হয়ে সর্পযোনি প্রাপ্ত হন।

নাচিকেত— নচিকেতা-সংশ্লিষ্ট; নচিকেতার দ্বারা লব্ধ। কঠোপনিষদে নচিকেতা: মহর্ষি গৌতমের পুত্র যিনি যমের কাছে আত্মার স্বরূপবিষয়ে প্রশ্ন করে অগ্নিমন্ত্র শিক্ষা করেন। বেদোক্ত বাজশ্রবা ঋষির পুত্র নচিকেতা।

নিখিল (বন্দ্যোপাধ্যায়)— আলাউদ্দীন খাঁর শিষ্য প্রখ্যাত সেতারী।

নিবিদ— নি+বিদ (যিনি নানা বিষয়ে জানেন)= অজ্ঞ; অজ্ঞান।

নিয়াখিয়া— কোনারকের পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যার ছোট নদী লিয়াখিয়া।

নির্চেরাগ— (নিঃ+চেরাগ) প্রদীপহীন, অন্ধকার।

নীট্শে— (Friedrich Wilhelm Nietzche, 1844-1900) জার্মান দার্শনিক। ইচ্ছাশক্তির জোরে অতিমানব হয়ে মানুষ পাপপুণ্যের ঊর্ধ্বে উঠে পচনশীল গণতন্ত্র ধ্বংস করবে—এই তত্ত্বের প্রবক্তা। ফ্যাসিবাদের দার্শনিক।

নীপার— দ্রঃ দিনীপার।

নীরাজন— ১. আরতি; ২. শান্তি; ৩. নির্জন/নিরালা।

নীরো— (Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus, খ্রিস্টপূর্ব 37-68) স্বৈরাচারী রোম-সম্রাট। অত্যাচারী, হীনচেতা, মাতা ও পত্নীর হত্যাকারী। কিংবদন্তি অনুসারে ইনি রোম শহরে আগুন লাগিয়ে নিজে বেহালা বাজিয়েছিলেন।

নীলরতন— প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩), এঁর নামে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার হাসপাতাল।

নেব্যুলা, নেবুলা— নীহারিকা।

নেয়াড— নাইয়াদ (Naiades) হ্রদ, নদী, ঝরনা ইত্যাদি জলভূমির অধিষ্ঠাত্রী অপ্সরা সম্প্রদায়। প্রতীচ্য পুরাণের 'জলপরী'।

নেয়ান্ডরতাল— (Neanderthal) অথবা Nianderthol প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের একটি প্রজন্মের নাম—যার কঙ্কাল জার্মানীর রাইন অঞ্চলের নেয়ান্ডরতাল উপত্যকায় প্রথম পাওয়া যায়।

নেরুদা— (Pablo Neruda, 1904-1973) ছদ্মনাম, প্রকৃত নাম—পাবলো নাফতালি। চিলির কবি। সরল গাথা থেকে সুররিয়ালিজ্‌ম্—সব ধরনের কবিতা লিখেছেন, কিন্তু বিপ্লবের কবি হিসেবেই পরিচিত।

নৈমিষকাল— নিমেষকাল সম্বন্ধীয় ; ক্ষণিক সময়।

নোজ্‌গে— উজ্জ্বল, ছোট ফুলের গুচ্ছ ; ফুলের তোড়া।

প

পঁইছে— হিন্দিতে পোঁছা=কব্‌জি। পঁইছে অর্থ মেয়েদের হাতের বাউটি শ্রেণীর গয়না।

পক্ষবিধুনন— ডানার কম্পন, পাখার ঝাপটানি।

পঞ্চ ম-কার— তন্ত্র শাস্ত্রে উল্লিখিত—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন—যে পাঁচটি শব্দের আদিতে ম-বর্ণ আছে। বলা বাহুল্য, এদের আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পটল— শিল্পী যামিনী রায়ের তৃতীয় পুত্র অমিয় রায়।

পদ্মভুক— হোমরের 'ওডিসি' কাব্যে বর্ণিত একধরনের মানুষ যারা পদ্মের বীজ খেয়ে বাঁচে এবং কালক্রমে অলস, কল্পনাবিলাসী ও বিস্মরণপ্রবণ হয়ে ওঠে। এদেরই Lotus Eaters অর্থাৎ পদ্মভুক বলা হয়েছে। তু. টেনিসনের কবিতা।

পনটুন— পাটাতনওয়ালা নৌকা পরপর বেঁধে যে সেতু তৈরি করা হয়—তারই নাম।

পবমান— পবন/অগ্নি ; পবিত্রকারী।

পর্সিলেন— পোর্সিলেন—চিনামাটি ধরনের জিনিস।

পাইলেট— (Pontius Pilate) জুডিয়ার রোমান শাসক (২৬-৩৬ খ্রিস্টাব্দ) যার বিচারে যিশুখ্রিস্ট মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা লাভ করেছিলেন।

পাউন্ড— (Ezra Loomis Pound, 1885-1972) মার্কিন কবি।

পার্থেনন— আথেন্স শহরের শীর্ষে আক্রোপোলিস-এ আথেনাদেবীর মন্দির—ডোরীয় রীতির বিশাল স্তম্ভশ্রেণীর উত্তুঙ্গ স্থাপত্য খ্রি. পূ. ৫ম শতাব্দীতে স্থপতি ফিডিয়াসের কীর্তির নিদর্শন বলে মনে করা হয়।

পিকাসো— (Pablo Picasso) জন্মসূত্রে স্পেনীয় ; ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। দ্রষ্টব্য—গোর্নিকা।

পিগসন— মার্কিনদেশের ছত্রিশতম রাষ্ট্রপতি (1963) Lyndon Baines Johnson-এর নামের ধ্বনিসাদৃশ্যে ব্যঙ্গাত্মক নতুন শব্দ।

পিদসিকাতো— (Pizzicato) ছড়টানা বাদ্যযন্ত্রে আঙুল দিয়ে টুং টাং করে বাজানোর পদ্ধতি।

পিয়োঙ্গিয়াং— (Pyongyang) উত্তর কোরিয়ার রাজধানী।

পিলু বারোয়াঁ— রাত্রির প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে গেয় দুটি পৃথক রাগ পিলু এবং বারোয়াঁ-র মিশ্রণে তৈরি সম্পূর্ণ রাগ।

পিসারো— (Camille Pissaro, 1830-1903) ফরাসি ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকর। প্যারিস ও লন্ডনের পথের দৃশ্য মূলত ছবির বিষয়।

পিসিংগার— সম্ভবত অ্যামেরিকার রাষ্ট্রপতি নিক্সনের মন্ত্রণাদাতা হেনরি কিসিংগারকে ব্যঙ্গ করে নতুন শব্দ তৈরি করেছেন ধ্বনিসাদৃশ্য বজায় রেখে। দ্র. যে Piss কথাটির অর্থ মূত্র।

পিস্টন— যে-যন্ত্রের সাহায্যে বাষ্প বা তরল পদার্থে ঠেলা দিয়ে এঞ্জিন ইত্যাদিতে গতির সঞ্চার করা হয়।

পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি— যখন পুত্র পিতা হয়।

পুনর্ণবা— (সাধারণ অর্থে এক বিশেষ ধরনের শাক বোঝালেও) কবিতার অর্থ— ফিরে ফিরেই নতুন।

পুন্নাম— (পুৎ+নাম) নরকের নাম। পুত্র এই 'পুৎ' নামে নরক থেকে পিতৃকুলকে ত্রাণ করে। এই অর্থে—পুত্রহীনের গতি পুন্নাম নরক।

পুরগাতোরিও— শুদ্ধিলোক ; ১. রোমান ক্যাথলিক মতে মৃত্যুর পরে সংক্ষিপ্তকালের জন্য মানুষ আত্মনিগ্রহের সাহায্যে পাপমুক্ত হয় যেখানে। ২. সাময়িক শাস্তি, অনুশোচনা, আত্মনিগ্রহের স্থান বা অবস্থা। দান্তের 'দিভিনা কোমেদিয়া'র তিনটি অংশ—ইনফের্নো, পুরগাতোরিও. পারাদিসো।

পুরবৈএগ্রা— পূবালি/পুবালি।

পুরোডাশ— (যজ্ঞে) যা আগে দান করা হয় ; যবের রুটি/মালপো/পিঠে/যজ্ঞের ঘি ইত্যাদি।

পূষন্— পোষণ করে এই অর্থে সূর্য। অন্য অর্থে পৃথিবী।

পেটার— (Walter Horatio Pater, 1839-1894) ইংরেজ চিত্রসমালোচক, প্রাবন্ধিক, নন্দনতাত্ত্বিক, ঔপন্যাসিক।

পেটারের মেয়ে— 'মোনালিসা' নামে চিত্রকর্ম। চিত্রসমালোচক ওয়াল্টার পেটারের প্রিয় প্রসঙ্গ।

পেনেলোপি— গ্রিক বীর ওদস্যেউস বা য়ুলিসিসের স্ত্রী। পাতিব্রত্যের আদর্শ প্রতিমা। ট্রয়ের যুদ্ধের কারণে স্বামী প্রবাসে থাকার সময় তিনি বহু পাণিপ্রার্থীকে কৌশলে প্রতিরোধ করেছিলেন এই বলে যে একটি বিশেষ নকশা বোনা হলেই তিনি বিবাহে সম্মতি দেবেন ; কিন্তু দিনের বেলায় বোনা নকশা তিনি নিজেই রাতে খুলে ফেলে প্রতীক্ষার সময় বাড়িয়ে নিতেন।

পেপসু হুংকার— (PEPSU—Patiala & East Punjab State Union) ভারতের প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে পঞ্জাবের নাম। পেপসু হুংকার বোঝাতে কোনো পঞ্জাববাসী শিখের হুংকার।

পেশোয়াজ— (ফারসি—পেশবাজ) মুসলমান নারীদের ও নর্তকীদের পরিধেয় পাজামা বিশেষ।

পৈশুনা— ক্রূরতা, খলতা, দ্বেষ।

প্যাণ্ডার— ট্রয়ের যুদ্ধে লিসিয়ান বাহিনীর অন্যতম বীর। মধ্যযুগীয় রোমান্সে—বোকাচ্চিও, চসার এবং শেকসপিয়রের রচনায়—ট্রয়লাস-ক্রেসিডা প্রেমের দৌত্য করেছিলেন। কোথাও তিনি ক্রেসিডার পিতৃব্য রূপে পরিচিত।

প্যারানইয়া— (Paranoia). বদ্ধমূল ভ্রান্তি প্রকাশক মানসিক ব্যাধি।

প্যাসিফিক— প্রশান্ত মহাসাগর।

প্রজ্ঞান রায়চৌধুরী— কবির শ্যালক ; 'পূর্বলেখ'-এর প্রথম প্রকাশক।

প্রজ্ঞাপারমিতা— জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ; (বৌদ্ধমতে) জ্ঞানের দেবী ; জ্ঞানের পরিপূর্ণতা।

প্রণব ছন্দ— ওঁকার (হিন্দুরা যে মন্ত্র পাঠ করে ঈশ্বরের আরাধনা করে) ; আদিধ্বনি ; আদি ছন্দ।

প্রতীপগতি— (পরিভাষা—retrograde motion); বক্রগতি ; প্রতিকূলগামী।

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়— বিষ্ণু দে-র অনুজকল্প কবি (জন্ম ১৯২৭) ; 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'র

রচয়িতা।

প্রসার্পিনা— পার্সিফোনির রোমান নামান্তর। গ্রিক পুরাণ-কথায় দেবরাজ জেউস ও দেবী দেমেতার-এর এই কন্যাকে পাতালরাজ হাদেস (প্লুতো) হরণ করে নেবার পর পৃথিবী শস্যহীন হয়ে যায়। দেবতার নির্বন্ধে হাদেস বছরে ছ'মাস তার স্ত্রী পার্সিফোনিকে মায়ের কাছে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়। ওই ছ'মাস পৃথিবীতে বসন্ত বিরাজ করে। প্রসার্পিনার পাতালে বাস করবার সময়ই হল শীতকাল।

প্রাকৃত রাস— ব্রজের গোপাঙ্গনাদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রসলীলা-কে 'রাস' বলে। সম্ভবত প্রাকৃত অর্থে এখানে অশিষ্ট, নীচ—এই প্রয়োগটিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাগ— (Prague) চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী। বর্তমান 'চেক' রিপাবলিকের রাজধানী প্রাহা।

প্রিয়াম— (গ্রিক Priamos) গ্রিক লোককথায় লাওমেদনের পুত্র, হেকোবার স্বামী, পঞ্চাশটি পুত্রের জনক ছিলেন। পুত্রদের মধ্যে অন্যতম প্যারিস ও হেক্টর। প্রিয়ামস্ ট্রয়ের শেষ রাজা, ট্রোজান যুদ্ধের শেষ পর্বে নিহত হন।

প্রি-র্যাফেলাইট— উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (1848) দান্তে গাব্রিয়েল রসেটি, হোলম্যান-হান্ট, জে. ই. মিলেইস-র নেতৃত্বে সংগঠিত ইংল্যান্ডের চিত্রশিল্পী সম্প্রদায়, যারা তৎকালীন প্রচলিত চিত্ররীতি বর্জন করে, রাফায়েল (1483-1520)-পূর্ববর্তী ইতালীয় চিত্রকরদের অনুকরণে—প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সূক্ষ্ম প্রয়োগকৌশল অবলম্বনে—ছবি আঁকার প্রয়াস করেছিলেন।

প্রেকশাস— অকাল পরিণত ; অকাল পক্ক।

ফ

ফরাসিস মান্দারিন— ফরাসি অভিজাত সম্প্রদায়।

ফাবর (Fabre Jean Henri, 1823-1925) পতঙ্গের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও রচনা উল্লেখযোগ্য।

ফারপো— (Firpo) একসময়ের কলকাতার বনেদি হোটেল-রেস্তোরাঁ।

ফিরোজা— নীলাভ-সবুজ বর্ণ।

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা— (Federico Garcia Lorca, 1899-1936) বিখ্যাত স্পেনীয় কবি।

ফেব্রুয়ারি খুঁজে পায় নভেম্বরে সীমা— ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশবিপ্লব,—ফেব্রুয়ারিতে আরম্ভ হয়ে নভেম্বরে শেষ হয়।

ফেরগানা— (=ফরগানা) মুঘল সম্রাট বাবরের জন্মস্থান।

ফেরার পীত বোমা— যে জাপানি বোমা পড়ল না।

ফ্রানচেসকা— ইতালিয়ান কবি, দান্তের (Dante Alighieri, 1265-1321) দিভিনা কোম্মেদিয়া-র (Divina commedia) নারীচরিত্র। পঙ্গুস্বামীর ভ্রাতা পাওলোর জন্য প্রেম-ই তার করুণ পরিণতির কারণ হয়।

ফ্রানৎস শুবের্ট— (Franz Peter Schubert, 1797-1828) অস্ট্রিয়ান সংগীত রচয়িতা ; চেম্বার মিউজিক, পিয়ানোর জন্য সুর এবং নাটকের জন্য সংগীত রচনা করেছিলেন।

বঙ্কিম মুখুজ্জে— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ; মহেশতলা-বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাঁর সময়ে বিরোধী দলের নেতা ছিলেন।
বভ্রুকেশ— শিবের জটা ; পিঙ্গলবর্ণ কেশ।
বর্ট্রান্ড রাসেল— (Bertrand Arthur William Russel, 1872-1967) ইংরেজ দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও লেখক ; ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।
বতিচেল্লি— (Sandro Botticelli, 1444?-1510) ইতালীয় রেনেশাঁস-এর চিত্রশিল্পী।
বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ— কিশোর বয়সে।
বর্কলি— ১. জর্জ বার্কলি (1685-1753) ভাববাদী আইরিশ দার্শনিক ও লেখক। ২. সানফ্রান্সিসকোর নিকটবর্তী ক্যালিফোর্নিয়ার য়ুনিভার্সিটি-শহর।
বর্ণিকা— রং-বৈশিষ্ট্য।
বলভী— গৃহচূড়া, ছাদ বা ছাদের ওপরে ঘর (চিলেকোঠা) ; ছাদ বা চালের পাড়।
বলাই পাল— কবির প্রিয় পটচিত্রকর, পূর্ববঙ্গের লক্ষ্মীসরা এঁকে কবি বিষ্ণু দে-কে উপহার দেন।
বসন্তসেনা— শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের নায়িকা।
বহ্নর বাড়ব— 'বাড়ব' শব্দটির অর্থ সমুদ্রাগ্নি ; অন্যদিকে—'বড়বা' কথাটির একটি অর্থ বারাঙ্গনা ; এবং 'বাড়ব' কথাটি 'বড়বা' থেকে বিশ্লেষণ।
বহ্লীক— (=বাহ্লীক) ১. আধুনিক আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত প্রাচীন দেশ Bactria বা Balkh. ২. মহাভারতে-উক্ত পঞ্জাবের অন্তর্গত (কিন্তু সিন্ধু ও পঞ্চনদ বিধৌত দেশের বাইরে) বাল্‌খ্‌ নিবাসী কয়েকটি জাতির সাধারণ নাম ; বাহ্লিক দেশ অশ্ব ও হিঙ্গুর জন্য বিখ্যাত ছিল।
বাওবাব— (Atansonia digitata) পূর্ব আফ্রিকার সেনেগাল অঞ্চলের আদি বৃক্ষ। মোটা গুঁড়িওয়ালা বিশাল বৃক্ষ। ফল খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গাছের বাকল থেকে দড়ি ও কাগজ তৈরি হয়। ভারতেও দেখা যায়।
বাখ— (Johann Sebastian Bach, 1685-1750) জার্মান সংগীতস্রষ্টা। অর্গ্যান-বাদক এবং কনসার্ট-রচয়িতা। বাখ সাধারণভাবে গির্জার প্রার্থনাসংগীত রচয়িতা হিসাবে খ্যাতনামা।
বাটুম— সোভিয়েত জর্জিয়ার তৈল-নগরী।
বাদশা-নীরু— প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী নীরদ মজুমদার। লখনউ-এ তাঁর মাতুলালয় ছিল বলে কবি এই নাম দিয়েছেন।
বারগানডা— বিহারের গিরিডির একটি অঞ্চল যেখানে প্রধানত বাঙালি ব্রাহ্ম-রা একসময় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।
বারণাবত— গঙ্গা-যমুনার সংগমে প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী, বর্তমান প্রয়াগ। মহাভারত-এর কাহিনী অনুসারে এই নগরেই মন্ত্রী পুরোচনের সহায়তায় জতুগৃহ নির্মাণ করে, দুর্যোধন কুন্তীসহ পাণ্ডবদের তীর্থে প্রেরণের ছলে সেখানে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল পাণ্ডবদের নিদ্রিত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা। পিতৃব্য বিদুরের দূরদৃষ্টিতে পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহ থেকে পলায়নে সক্ষম হয়েছিলেন।
বালখাস— দক্ষিণ-পূব কাজাক-এ লবণ-জলের হ্রদ বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।
বালালোল— ক্রন্দনপর শিশু কোলে বসিয়ে দোল দিয়ে শান্ত করার গান।
বালাসরস্বতী— দক্ষিণের সুপ্রসিদ্ধ ভরতনাট্যম শিল্পী।
বাহেঙ্গা— রিখিয়ার একটি অঞ্চল।

বিম্ববতী— রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের (পরে 'শিশু' কাব্যেও সংকলিত) 'বিম্ববতী' কবিতায় উল্লিখিত কল্পকথার আত্মসৌন্দর্যদর্পময় হিংসুটে রানি। 'স্নো-হোয়াইট' কাহিনীর আদলে রচিত।

বিরহগুরুণা কান্তা—কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের পঙ্‌ক্তি 'কান্তার গুরুভার বিরহবশত'। ("কশ্চিৎকান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ")।

বিরিক্ত— বিরেচনকারী, বহুমলত্যাগী ; সম্পূর্ণ রিক্ত বা নিঃস্ব।

বিল আর্চর— (William Archer) ইংরেজ চিত্রকলা-সমালোচক ও লেখক। বিষ্ণু দে-র বন্ধু।

বিষঙ্গ— অনাসক্তি।

বীজকম্প্র— যে-বীজ অঙ্কুরোদ্গমের জন্য চঞ্চল।

বীলজেবব— (Beelzebub) খ্রিস্টিয় ও ইহুদি পুরাণে প্রধান শয়তান ; মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এ শয়তানের সর্বপ্রধান সহকারী।

বুওর— (বুয়োর, Boer) দক্ষিণ আফ্রিকার হুগনট বা ওলন্দাজ বংশজাত মানুষেরা। ১৮৯৯-১৯০২তে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট-এর বুওরগোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ; শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেও পরবর্তী কালের রাজনৈতিক আবহ দীর্ঘকাল বিক্ষুব্ধ ছিল।

বুখেনবাল্ড্— (Buchenwald) বুখেনবাল্ড্ অরণ্য-অঞ্চলে পূর্ব জার্মানির একটি গ্রাম। হিটলারের সময়ে ইহুদি-এর 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' হিসাবে কুখ্যাত।

বুদোয়ার— (Boudoir) রমণীর প্রসাধন বা আলাপচারিতার ব্যক্তিগত কক্ষ।

বুদ্‌দা ভাই— কবির দৌহিত্র আহিতাগ্নি চক্রবর্তী।

বুদ্ধদেব বসু— (1908-1974) বিষ্ণু দে-র সমসাময়িক প্রখ্যাত বাঙালি কবি। "কবিতা" পত্রিকার সম্পাদক।

বুর্জোয়া— (Bourgeois) পরশ্রমজীবী (মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে)। কখনো কখনো বস্তুতান্ত্রিক তথা সংস্কৃতি-বিহীন গোষ্ঠীকেও বোঝালেও প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের সময় থেকেই মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী বণিকশ্রেণী সমাজে বিশেষ শক্তিশালী ছিল। এই পৃথিবীর ইতিহাসে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরাই ঐশ্বরিক বিধানকে অস্বীকার করে, সংবিধানগত মানবিক অধিকারের দাবি তুলে ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে, অ্যামেরিকায় সামজিক বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বুরিদান— (Jean Buridan, 1328—?) চতুর্দশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর। 'বুরিদানের গাধা' হল সেই কাল্পনিক গাধা, যে দু'দিকে দুটি সমান খড়ের আঁটির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোন্‌টি আগে খাবে তা স্থির করতে না পেরে না খেয়ে মরে যায়।

বুলবুলি— 'ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়োল' ছড়ার বুলবুলির অনুষঙ্গ।

বৃক্ষ ইব স্তব্ধ— উপনিষদের উক্তি। বৃক্ষের মতো স্তব্ধ।

বেআত্রিচে— (Beatrice) মহাকবি দান্তের (1265-1321) প্রেমপাত্রী ; কিন্তু এঁকে দান্তে কেবল একবার মাত্র চোখের দেখা দেখেছিলেন বলে শোনা যায়। সম্ভবত ইনি ছিলেন ফ্লোরেন্সের বেআত্রিচে পোর্তিনারি (1266-1290)।

বেগানা— অজ্ঞাতকুলশীল ; অপরিচিত ; অজ্ঞাত।

বেগোনিয়া— (begonia) Michel Begon (1638-1710) নামক উদ্ভিদবিজ্ঞানীর নামে চিহ্নিত মরশুমি ফুল। সাধারণত টবের। স্বচ্ছ, রসভরা নরম ডালে, ভারি ধরনের বাহারি পাতায় এবং সাদা, গোলাপি, লাল ফুলে থোপালো এই, গাছটি নয়নরঞ্জন। ঠান্ডার দেশে বারোমাস

ফুটলেও সমতল ভূমিতে শীতকালেই এ ফুল ভালো ফোটে।

বেট্স— (Henny Walter Bates, 1825-1892) ইংরেজ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ; দক্ষিণ অ্যামেরিকায় উত্তর আমাজন নদীর অববাহিকায় বিজ্ঞানী ওয়ালেসের সঙ্গে অভিযান করেছিলেন (1859 খ্রিস্টাব্দে) এবং আট হাজার নতুন প্রজাতির জীবজন্তু আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেছিলেন। ইনিই প্রথম জীববিজ্ঞানে 'Mimicry' বা অনুকরণবাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

বেটোফেনি— (Ludwig Van Beethoven, 1770-1827) জার্মান মহাসংগীতকার লুডভিক বেটোফেন-রচিত সংগীত।

বেন লিন্‌সে— (Benjamin Barr Lindsey, 1869-1943) মার্কিনদেশের আইনজ্ঞ ও সমাজ-সংস্কারক। শিশু-অপরাধীদের বিচারের পৃথক আদালত স্থাপন করেন।

বেনেডেকটুস— গির্জায় সম্মিলিত প্রার্থনা (Mass)-এর সূচনায় ঈশ্বরের স্তুতিমূলক সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাসংগীত [Benedictus Qui venit in nomine Domini—Blessed is He that cometh in the name of the Lord]।

বেবেল-শিখর— [ব্যাবেল (Babel) হল ব্যাবিলন (আসিরীয়)= ঈশ্বর রাজ্যের দরজা।] বাইবেলের ওল্‌ড টেস্টামেন্টের কাহিনী অনুযায়ী নোয়ার বংশধর, ঈশ্বর-প্রতিস্পর্ধী রাজা নিমরোদ ব্যাবেলে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে, স্বর্গে পৌঁছে ঈশ্বরের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্তম্ভ-নির্মাণকারী মিস্ত্রি মজুরদের সকলের ভাষা ঈশ্বর একদিন আলাদা করে দেওয়ায়, তাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এইভাবে ব্যাবেল স্তম্ভ নির্মাণ অসম্পূর্ণ রইল, নিমরোদের ইচ্ছাও পূর্ণ হল না।

বেভিন— (Bevin, Ernest, 1881-1951) আর্নেস্ট বেভিন— ইংরেজ ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা। লেবার-পার্টি পরিচালিত সরকারের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন। রুশ-বিদ্বেষ ছিল তাঁর নীতির মূল স্তম্ভ।

বেলগ্রেড— প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী।

বেলিয়াল— (Balliol) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এই নামের কলেজ।

বোখারা— মধ্য উজবেকিস্তানের একটি বিভাগ।

বোলশয় বালে— বলশয় ব্যালে। মস্কোর বিখ্যাত বলশয় থিয়েটার-এর ব্যালে নৃত্যের গোষ্ঠী।

বোহিনিয়া— [Bauhinia purpuria; B. Vanegata; B. triandra] সাদা, লাল, বেগুনি-গোলাপি• নানারঙের কাঞ্চন ফুল (হিন্দি কচনার) বা ওই ফুলের গাছ।

বৌধায়ন— অর্থনীতিবিদ বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়।

ব্যাজরোষ— কৃত্রিম ক্রোধ।

ব্যাজহাস্য— নকল হাসি।

ব্যাসিলাস— রোগজীবাণু।

ব্রানক্যুসি— (Constantin, Brancuse, 1876-1957) রুমানিয়ার ভাস্কর, মূলত বিমূর্ত ও প্রতীকী শিল্প রচয়িতা।

ব্রুনহিল্ড— (Brumhild, Brunhilde) ১· জার্মান লোককথার প্রসিদ্ধ শক্তিমতী মহিলা যোদ্ধা। ২· ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় কবি রচিত Nibelungenlied নামে—বার্গেন্ডির রাজাদের সম্বন্ধে প্রচলিত দুটি লোককথা অবলম্বনে— একটি মহাকাব্য। ব্রুনহিল্ড এই মহাকাব্যে আইসল্যান্ডের রানি, যাকে বার্গেন্ডির রাজা সিগফ্রিডের ইন্দ্রজালের সাহায্যে লাভ করেন এবং বিবাহ করেন। ৩· রিচার্ড ইরাগনার রচিত Die Walkure অপেরার অন্যতমা অলৌকিক (Valkyrie) —ওডিন-কন্যা/ প্রধানা সেবিকা— যাকে সিগফ্রিড

মায়াজাল থেকে মুক্ত করেন।

ভ

ভদ্রা— সুভদ্রা ; শ্রীকৃষ্ণ-ভগ্নী, অর্জুন-প্রিয়া, অভিমন্যু-মাতা।

ভয়রোঁ— (=ভৈরব) ; প্রাতঃকালীন রাগ ; দিবা প্রথম প্রহরে গেয়।

ভার্গ— জ্যোতি, তেজ। অন্য অর্থে—ব্রহ্মা বা মহাদেব।

ভানৎসেত্তি/ ভাঞ্জাত্তি— (Vanzetti, Bartolomeo, 1888-1927) দ্রষ্টব্য— সাক্কো-ভাঞ্জাত্তি।

ভায়ালোর— কেরলে ১৯৪৮-এর কৃষকবিদ্রোহের কেন্দ্র।

ভার্গব— পরশুরাম ; শুক্রাচার্য।

ভালহালা— (Valhalla or Walhalla) নরওয়ে পুরাণে— যুদ্ধে নিহত বীরদের আশ্রয়কক্ষ (hall of the slain)। জার্মান লোকশ্রুতিতে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধীশ্বর-দেবতা Woden (=Odin। সমার্থক রোমান দেবতা মার্কারি)-এর কন্যারা (মতান্তরে—সেরিকারা) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের নির্বাচিত যোদ্ধাকে (মৃত অবস্থায়) এই ভালহালা-তে বহন করে আনতেন ও আশ্রয় দিতেন।

ভালেরি— (Valery, Paul Ambroise, 1871-1945) ফরাসি কবি-সমালোচক, প্রাবন্ধিক বুদ্ধিজীবীদের নেতা। সমসাময়িক কবিদের ওপরে এঁর চিন্তাধারার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল।

ভিৎমিন— (Viet Minh) ভিয়েতনামের মার্কিন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বাহিনী।

ভিদাল— (Vidal, Peire, 1180-1206) ফরাস ত্রুবাদুর কবি। তাঁর প্রেমের কবিতার তীব্র ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং ভাষাগত সারল্যের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ভিনাস (Venus)—রোমান পুরাণে শস্য ও সৌন্দর্যের দেবতা পরে গ্রিক দেবী আফ্রোদিতের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। ইনিই আবার 'এরস-মাতা'— অর্থাৎ প্রেমদেবতা এরস বা কিউপিডের মাতা— রূপে প্রেম, সৌন্দর্য ও কামনার দেবী রূপে পূজিতা।

ভিয়োলা— বেহালার থেকে আকারে বড়ো, চার তার বিশিষ্ট একই ধরনের তারযন্ত্র যা ধনুকের আকারে ছড় টেনে বাজানো হয়। বেহালা, ভিয়োলা, চেলো (সবচেয়ে বড়ো) ও ডবল-বাস এই চারটি তারযন্ত্র একযোগে কোয়ার্টেট বা সিমফনিতে বাজানো হয়। ভিয়োলা ভায়োলিনের মতোই কাঁধে রেখে, থুতনিতে ঠেকা দিয়ে বাজাতে হয়।

ভিলানেল— (Villanelle) ফরাসি দেশে প্রথম উৎসারিত উনিশ লাইনের সংক্ষিপ্ত কবিতা বিশেষ ; পাঁচটি ত্রিক, সর্বশেষে একটি চতুষ্ক— এই উনিশ লাইনে দুটি মাত্র মিল থাকে। যেমন : ক^{১} খ ক^{২}, কখক^{১}, কখক^{২}, কখক^{১}, কখক^{২},/ কখক^{১} ক^{২}।

ভূর্জ— বার্চ জাতীয় গাছের কোমল চামড়ার মতো ত্বক বা বল্কল বিশিষ্ট বৃক্ষ। প্রাচীনকালে এই ভূর্জ-বল্কল কাগজের বদলে ব্যবহৃত হত।

ভূর্ভুবস্ব— উপনিষদের গায়ত্রীমন্ত্রের প্রথম অংশ— 'ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ' ; অর্থ "পৃথিবী, অগ্নি-বায়ু-আদিত্য ও তিন বেদ" (—এদের শরণ নিই)। "পৃথিবী-অন্তরিক্ষ-স্বর্গ (বৃহদা.)

ভেড়োয়াটাঁড়— সাঁওতাল পরগনার স্থান বিশেষ।

ভেরেশচাগিন— (1842-1904) রুশ চিত্রকর ; সাধারণ মানুষের জীবনধারার ওপর ছবি এঁকেছেন।

মণীন্দ্র রায়— কবি বিষ্ণু দে-র অনুজস্থানীয় বাঙালি কবি, অকাদেমি পুরস্কার প্রাপক।

মণ্টাজ— (Montage) চলচ্চিত্রশিল্পে একই দৃশ্যে একাধিক ছোট ছোট ছবি যেগুলি সম্পর্কিত কোনো চিন্তাধারা বা মানসিক অবস্থার প্রতিফলন— পরপর দ্রুত দেখিয়ে যাওয়া ; আবার কোনো একটি বস্তুর ছবি— কেন্দ্রাতিগ বা কেন্দ্রাভিগ ভাবে— ঘুরতে ঘুরতে যখন ক্রমশ স্পষ্ট ও কেন্দ্রীভূত হয়— তাকেও 'মন্তাজ' বলা যায়।

মৎসর—পরশ্রীকাতর ; অসূয়াসম্পন্ন।

মটসার্ট— (Mozart, Wolfgang Amedeus, 1756-1791) অসাধারণ পাশ্চাত্ত্য সংগীতস্রষ্টা। অস্ট্রিয়ার [সলৎসবুর্গ] এই শিশু প্রতিভা (Child prodigy) সংগীতজ্ঞ পিতার সান্নিধ্যে অল্প বয়সেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। গির্জার 'মাস' থেকে শুরু করে প্রায় সবরকমের কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত —চেম্বার মিউজিক, সোনাটা, কনসার্টো, —রচনা করেছিলেন তবে 'অপেরা'-ই বোধহয় মটসার্টের বিশেষ উৎসাহের বিষয় ছিল। তিনি অনেকগুলি 'সিম্ফনি'ও রচনা করেছিলেন।

মথি—যিশুখ্রিস্টের দ্বাদশ অন্তরঙ্গ শিষ্য ও ধর্মপ্রচারকদের অন্যতম সেন্ট ম্যাথু (Mathew)। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম ভাগ—যিশুর জীবন ও মৃত্যু—ম্যাথু-র রচনা বলে স্বীকৃত।

মধুস্রবা— যা মধু ক্ষরণ করে ; মহুয়া গাছ।

মস্তি— মত্ততা ; অহংকার।

মহাশ্বেতা— ১· সর্ব শুক্লা সরস্বতী। ২· বাণভট্ট এবং তৎপুত্র ভূষণভট্টের যৌথ সৃষ্টি কাদম্বরী কাব্যের উপনায়িকা— পুণ্ডরীক-প্রিয়া।

মহীদাস— ছান্দোগ্য উপনিষদে ইতরার পুত্র মহীদাস যজ্ঞবিজ্ঞান আয়ত্ত করে দীর্ঘজীবী (১১৬ বছর) হয়েছিলেন। কবির কাছে তিনি দীর্ঘজীবিতার প্রতীক।

মাউমাউ— আফ্রিকার কেনিয়া অঞ্চলের কিকুয়ু উপজাতিভুক্ত গোপন সন্ত্রাসবাদী দলের নাম মাউমাউ— যারা আফ্রিকাকে ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিকতা মুক্ত করতে চেয়েছিল। ১৯৫২-১৯৫৫ এদের সন্ত্রাসবাদ চরমে ওঠে। বৃটিশ স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর চেষ্টায় ১৯৫৬ সালের মধ্যে তা সম্পূর্ণ দমন করা হয়। উগ্রপন্থীদের নেতা জোমো কেনিয়াট্টাকে বন্দি করা হয়।

মাউন্টব্যাটেন— (Louis Francis Albert Victor Nicholas) বৃটিশ অ্যাডমিরাল, রানি ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নরওয়ে ও ফ্রান্সে কমান্ডো-আক্রমণের এবং ১৯৪৩ খ্রিঃ মিত্রবাহিনীর অন্যতম সেনাধ্যক্ষরূপে বার্মায় জাপানিদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিচালক। ভারতে বৃটিশ শাসকদের শেষ ভাইসরয় (১৯৪৭)। ১৯৫৯ নৌ-বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ। পরে তাঁর নিজস্ব প্রমোদতরীতে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে নিহত হন।

মাকাড়া-মুগনী— সাঁওতালি বাদ্যযন্ত্র।

মাটিয়ারা— সাঁওতাল পরগনার রিখিয়া অঞ্চলে একটি ছোট নদী।

মাতারিশ্বা— পবন ; বায়ু।

মাৎস্য— অরাজকতা ; বলবান কর্তৃক দুর্বলকে নাশ করা বা গ্রাস করা।

মাতিস— (Henri Matisse, 1869-1954) অঁরি মাতিস— ফরাসি চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। Fauvism-এর অন্যতম প্রতিনিধি।

মাথুর— কৃষ্ণের মথুরাগমনের পর বৃন্দাবনবাসীদের বিরহ-ব্যাকুল মানসিক অবস্থা। চিরবিরহ।
মাস্তোভানি— স্ট্যালিন এই নামে পরিচিত ছিলেন।
মান্দারিন— চিনদেশের সামন্ত শাসনকালীন অভিজাত সম্প্রদায়।
মামল্লপুরম্, মামল্ল-সৈকত— তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরম সমুদ্রসৈকত।
মার্তাবান— বঙ্গোপসাগরের অংশবিশেষ, ব্রহ্মদেশের (বর্তমানে মায়ানমার) দক্ষিণবর্তী উপসাগর।
মালার্মে— (Stephane Mallarme, 1842-1898) উনিশ শতকের ফরাসি কবি ; প্রতীকবাদী (Symbolist)দের অন্যতম নেতা।
মিঞা কী দীপক— তানসেনের কণ্ঠে বিশিষ্ট রূপে রূপায়িত দীপক রাগ ; কথিত আছে এই রাগ গেয়ে গায়ক অগ্নি জ্বালাতে পারতেন। সাধারণত রাত্রিতে এই রাগ গাওয়া হত।
মিরান্ডা— শেক্‌সপিয়রের The Tempest নাটকের নায়িকা ; নির্বাসিত ডিউক প্রস্পেরোর কন্যা— নির্জনদ্বীপবাসিনী। পরে, ফার্দিনান্দ নামক ডিউক-পুত্রের প্রেমমুগ্ধ ও বিবাহিত স্ত্রী।
মিরিয়াম— (=হিব্রু Miryam) বাইবেলে (ওল্ড টেস্টমেন্ট) মিশরের রাজকন্যা, মোজেস ও অ্যারনের ভগ্নী।
মিলটন— (John Milton, 1608-1674) ইংরেজ কবি ; শেষবয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময়েরই রচনা দুটি মহাকাব্য— 'প্যারাডাইস লস্ট" (1667) এবং 'প্যারাডাইস রিগেইন্‌ড়' (1671)। ক্লাসিক গ্রিক আদর্শে রচিত 'স্যামসন অ্যাগোনিসটেস' নাটকও বিখ্যাত।
মুদ্রারাক্ষস— অষ্টম শতাব্দীর বিশাখদত্ত রচিত ব্যতিক্রমী সংস্কৃত নাটক। চন্দ্রগুপ্ত-গুরু চাণক্য এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র।
মুর— উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসী ও আরবদের সংমিশ্রণে গঠিত এক সংকর জাতি বা তাদের বংশধর। অষ্টম শতাব্দীতে এরা স্পেন আক্রমণ করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল।
মৃগতৃষ্ণিকা— মরীচিকা।
মেগালোম্যানিয়া— ১· একধরণের মানসিক বিকলতা— যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, জাঁকজমকের মনোবিকার বা বিভ্রান্তিতে ভোগে। ২· বড় কিছু করবার তীব্র বাসনা। ৩· বাড়িয়ে বলার প্রবণতা।
মেদিচি— রেনেশাঁসের সময়ে (১৪-১৬ শতকে) ফ্লোরেন্সের শিল্পোৎসাহী ক্ষমতাশালী, ধনাঢ্য ইতালীয় পরিবার। এই পরিবারের অন্যতম খ্যাতনামা ফ্লোরেন্সের যুবরাজ লরেঞ্জো দি মেদিচি (1449-1492)—রাজনীতিবিদ, কবি, পণ্ডিত এবং শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, যাকে 'Lorenzo the Magnifient' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।
মেলোডি-সিমফনি— নিঃসঙ্গ একের সুর আর সম্মিলিত বহুর বিচিত্র সুর। (Melody-Symphoney)
মৈহারি (=মাইহারি)— সংগীতগুরু আলাউদ্দীন খাঁ মৈহার-রাজ্যের (মধ্যপ্রদেশ) রাজবৃত্তিধারী শিল্পী ছিলেন, সেখানেই তাঁর জীবনের শেষভাগ কেটেছে। তাঁর সৃষ্ট সংগীত বা রাগিণীকে 'মৈহারি' বলা হয়েছে।
মোনালিসা— লিওনার্দো দা ভিঞ্চি অঙ্কিত রহস্যময় মৃদুহাস্যমণ্ডিত মুখের রমণীর প্রতিকৃতি— প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামে সংগৃহীত। প্রদর্শিত। দ্রষ্টব্য : জ্যোকন্দা।
মৌভোগ— খুলনার বাগেরহাট মহকুমার গ্রামের নাম। ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নবম সম্মেলনে, এখানেই তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল।
ম্যাকাডাম— (John. L. MacAdam, 1756-1836) স্কট এঞ্জিনীয়র ম্যাকাডাম যিনি পাথরকুচি

দিয়ে রাস্তা বাঁধানোর প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন— তার নাম থেকে রাস্তা-বাঁধানোর পাথরকুচির-ই ওই নাম হয়েছে।
ম্যাকেন্‌জি-লায়াল— কলকাতার অধুনালুপ্ত, ইংরেজ আমলের বিভাগীয় বিপণি।
ম্যামথ— বিশালকায় (প্রাগৈতিহাসিক) জন্তু।
ম্যামন— পশ্চিমি অর্থের দেবতা, লোভের দেবতা।

য

যযাতি— মহাভারতের 'আদিপর্বে' উল্লিখিত রাজা নহুষের পুত্র, যিনি পুত্র পুরু-র যৌবন আর নিজের বার্ধক্য বিনিময় করেছিলেন। পরে তাঁর ভোগ-তৃষ্ণা ত্যাগ করে পুত্রকে যৌবন প্রত্যর্পণ করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।
যযাতি-শিরা— বৃদ্ধের দুর্বল শিরা।
যুযুৎসু— ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র, সৌবলী নামে দাসীগর্ভে জন্ম। ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মনিষ্ঠ একমাত্র কৌরব ভ্রাতা যিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে ইনিই একমাত্র জীবিত ছিলেন।
যুলিসিস— গ্রিক পুরাণের বীর ওদেসসেউস। এটি তার রোমকনাম। দ্রষ্টব্য : ইথাকা।
যোগিয়া— প্রভাতী রাগিণী বিশেষ। দিবা প্রথম প্রহরে গেয়।

র

রংরেজিনী— যে (স্ত্রী) বৃত্তি হিসাবে কাপড় সুতো ইত্যাদিতে রং করে।
রথচাইল্ড— আন্তর্জাতিক খ্যাতিবিশিষ্ট ইউরোপীয়ান ব্যাঙ্কার-পরিবার। প্রতিষ্ঠাতা (Mayer Amschel Rothschild, 1743-1812) প্রথম জার্মানিতে পারিবারিক সৌভাগ্যের সূচনা করেন। পাঁচ পুত্রের সকলেই 'ব্যারন' উপাধি লাভ করেন এবং চারজন ভিয়েনা, লন্ডন, নেপল্‌স এবং প্যারিসে ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। লন্ডনে নিয়োজিত Nathen Meyer Rothschild (1777-1836) এবং তাঁর পুত্র ধনকুবের রূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।
রথীন্দ্র ভট্টাচার্য— কবির ছাত্র, পরবর্তীকালে ফরাসি ভাষাভিজ্ঞ পুলিস অফিসার।
রাজাস পেগ— পানীয়ের (বড়) মাপ।
রাত্রি স্তোমংন জিগুষে— রাত্রিসূক্ত ১৩/১২/৭৮ ; "হে আকাশের কন্যা রাত্রি, তোমার যাত্রাকালে এই স্তব"।
রিগান— শেক্‌সপিয়র রচিত 'কিং লিয়র' নাটকে রাজা লিয়রের দুষ্টপ্রকৃতির দ্বিতীয়া কন্যা, ডিউক অব কর্নওয়ালের স্ত্রী। দ্রষ্টব্য : গনেরিল।
রিফ্লেক্স— দ্রষ্টব্য : 'কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স্'।
রিষ্টি— অশুভ ; পাপ। অকল্যাণ ; দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট।
রুক্মিণী দেবী— দক্ষিণী নৃত্যসাধিকা, মাদ্রাজে 'কলাক্ষেত্রম্' নৃত্যশিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠাত্রী রুক্মিণী দেবী আরুণ্ডেল।
রুদন্ত— যে কাঁদছে, ক্রন্দনরত।
রুশতী— রাত্রিশেষে উষা, মূলে রুশৎ। শব্দশ্লেষে : রুশদেশ সম্পর্কিত।
রুশদ্বৎসা... চরিত আমিনানে— দীপ্তিমতী শুভ্রবর্ণা, সূর্যের মাতা উষা এসেছেন, কৃষ্ণবর্ণা রাত স্বীয়

স্থানে গিয়েছেন, 'রাত ও উষা উভয়েই সূর্যের বন্ধু এবং উভয়েই অমর। একে অন্যের পর আসেন এবং একে অন্যের বর্ণ বিকাশ করেন, এরূপে তারা দীপ্তিমান হয়ে বিচরণ করেন।
রূমের নীরো— নীরো। দ্র· সম্রাট নীরো।
রৌরব— ১· নরক ; ২· ভয়ংকর।

ল

লঙরখানা— দুর্ভিক্ষের সময় নিরন্নদের খিচুড়ি জাতীয় খাদ্য বিতরণের স্থান।
থার্ড আর্ল রাসেল— (Bertrand Russel) ইংরেজ দার্শনিক, গাণিতিক, সুলেখক ; 1950 খ্রিঃ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। কবি বর্ট্রান্ড রাসেলকেই বুঝিয়েছেন।
ললিতা— রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র।
লস এঞ্জেলেস— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমউপকূলে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ধনী শহর।
লাইম-ছায়ায়— লাইম বা লিনডেন জাতীয় গাছ উত্তর অ্যামেরিকার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বিশেষ সম্পদ। ঘন হৃদয়াকৃতি পাতা এবং সুগন্ধি হলদে-আভার ফুলে সজ্জিত 'বাসউড'-জাতীয় এই গাছের ঘন ছায়ার কথা বলা হয়েছে।
লাজারস— [Lazarus—আক্ষরিক অর্থ God has helped] বাইবেলের চরিত্র। একে যিশু পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।
লাটনি প্রাসাদ— লাটসাহেবের বাড়ি।
লাল ভল্লুক— ব্যঞ্জনার্থে সমাজতান্ত্রিক রুশ দেশ।
লিনসে— দ্রষ্টব্য : বেন লিনসে।
লিবিডো— ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে মানুষের যৌনতাকেন্দ্রিক অবচেতন চিত্ত।
লিমবো— ১· বিস্মৃতির জগৎ। খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে নরকের প্রান্তবর্তী স্থান— যেখানে খ্রিস্টানধর্মে অদীক্ষিত শিশু এবং জিশুর পূর্বে জাত ন্যায়বাদী লোকেদের জায়গা হত। ২· বন্দিশালা বা বন্দিত্ব ; অবহেলিত স্থান।
লিয়র— শেক্সপিয়রের 'কিং লিয়র' নাটকের প্রধান চরিত্র।
লুই আরাগঁ— (Louise Aragon) ফরাসি সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, কবি। বিষ্ণু দে মতাদর্শের বিবেচনায় এঁর রচনা অনুধাবন করেছেন।
লুসিফর— [Lucifer] ইহুদি ও খ্রিস্টান পুরাণে শয়তানের নামান্তর।
লুসিয়া— সমার্থক Lucy.
লেনা— পূর্বতন সোভিয়েট রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের পূর্ববাহিনী দীর্ঘতম নদী (২৬৫৪ মাইল) বৈকাল হ্রদের কাছাকাধছি অঞ্চলে জন্ম নিয়ে লাপটেভ সমুদ্র গিয়ে মিশেছে।
লেবার্হাম— (laburham) হলুদ রঙের ঝাড়ের মতো দেখতে ফুলের গাছ বা ফুল ; সং— কর্ণিকার। বাং— সোঁদাল, বাঁদরলাঠি, হি— অমলতাস।
ল্যাভেন্ডার— ইয়োরোপের 'মিন্ট' পরিবারভুক্ত একধরনের গুল্ম জাতীয় গাছ, যার ফুলের হালকা বেগুনি রঙ এবং ফুল ও পাতার সুগন্ধি বিখ্যাত।
শ'-অডেন'— [Shaw-Auden] আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ' (1856-1950) এবং অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজ কবি (Wystan Hugh) অডেন (1907-1973).
শচীশ— রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের চরিত্র।
শমী— শমীবৃক্ষ বা সাঁইবাবলা গাছ— যার কাঠ জ্বালিয়ে যজ্ঞকার্য করা হত।

শশবিশান— দ্রষ্টব্য : অলীক শশবিষাণ।
শাতো-কাসল— 'শাতো' (Chateau)-র ফরাসি ভাষায় অর্থ দুর্গ বা বৃহৎ গ্রামীণ আবাসগৃহ। 'কাস্‌ল্‌' ইংরেজি শব্দ— দুর্গ।
শিখিধ্বজ— ১· শিখী (ময়ূর) ধ্বজ (চিহ্ন) যার— দেবসেনাপতি কার্তিক। ২· শ্রীকৃষ্ণ।
শিব সদাগর— লোকসাহিত্যের অন্যতম চরিত্র। "এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর/ তারি মধ্যে বসে আছেন শিব (শিবু) সদাগর"।
শিবালিক— হিমালয়ের সর্বদক্ষিণস্থ পর্বতশ্রেণী।
শিরাস্ফোট— শিরের আন্দোলন ; মাথা নাড়া।
শীধু— [যা শয়ন করায়] মদ্য, মধু। ইক্ষুরসজাত মদিরা।
শীলভদ্র— নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ, জ্ঞানী শ্রমণ ও আচার্য [পাল যুগে]।
শুবের্ট— (Franz Peter Schubert, 1797-1828) অস্ট্রিয়ান সংগীত রচয়িতা। রোমান্টিক আন্দোলনের পুরোধা। পিয়ানো-সংগীত থেকে সিম্ফনি এবং গীত-রচনা ও সুরসৃজন— সর্বত্র প্রতিভাব স্পর্শ রেখেছেন।
শৃঙ্গেন চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষিং কৃষ্ণসার— কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের তৃতীয় সর্গে, শিব-তপোবনে অকাল-বসন্তের আবির্ভাবে প্রকৃতি-জগতে চাঞ্চল্যের বর্ণনা। অর্থ— কৃষ্ণসার হরিণ যখন প্রেমভরে শৃঙ্গদ্বারা হরিণীর গাত্র ঘর্ষণ করতে লাগল, সেই স্পর্শের আনন্দে হরিণীর দুটি চোখ বুজে এল।
শেরজঙ্গ— বাঘের মতো যোদ্ধা ; ওই নামে এক শিকারকাহিনীর লেখক ?
শোপ্যাঁ— (Frederic Francois Chopin, 1809-1849) ফরাসি পিয়ানোশিল্পী ও সুরস্রষ্টা।
শ্রোণিভারনিলীনবসনা— কালিদাসের 'মেঘদূতে'র শ্রোণীভারাদলসগমনা'র সাদৃশ্যে রচিত। —গুরু নিতম্বদেশ বস্ত্রাচ্ছাদিত।
শ্লেগেল— (August Wilhelm von Schlegel, 1767-1845) ভারতবত্ত্ববিদ জর্মন মণীষী সেদেশে রোমান্টিকতার অন্যতম প্রবক্তা। এঁর ভ্রাতা ফ্রেডরিশ ফন শ্লেগেল (1772-1829) মূলত ভারততত্ত্ববিদ দার্শনিক।
ষড়জে-রেখাবে— ভারতীয় সংগীতের সুর-সপ্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ঘাট বা স্বর। (সা-রে)।
সক্রাটিস— (Socrates, খ্রিস্টপূর্ব 469-399) প্রসিদ্ধ গ্রিক দার্শনিক। প্রশ্নের সাহায্যে উত্তর বা সত্যের সন্ধান-ই ছিল তার চিন্তার বৈশিষ্ট্য। এঁরই শিষ্য ছিলেন প্লেটো।
সদ্‌গময়— সৎ-এ (শাস্ত্রীয় কর্ম ও জ্ঞানে) নিয়ে যাও।
সন্তত— সতত, সবসময়।
সন্তভিক্তয়ার— পাহাড়,— যার অনেক ছবি এঁকেছিলেন ফরাসি চিত্রশিল্পী পল সেজান (স্যামতভিক্তোরা) (Cezanne, 1839-1906)। দ্রষ্টব্য : সেজান।
সন্নিপাতাতুর— বিনাসের ভয়ে কাতর।
সবিতুর্বরেণ্যম ধীমহি প্রচোদয়াৎ— (যে সূর্য) আমাদের (বুদ্ধির) প্রেরণা দেন, সেই বরেণ্য সবিতার ধ্যান করি। বেদের গায়ত্রীমন্ত্রের অংশ। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ'-এর উদ্ধৃতি।
সর জি· পি— কল্পিত শিল্পপতির নাম।
সর্বান কামান পরিত্যজ্য— সব কামনা পরিত্যাগ করে।
সাইনারা— উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ইংরেজ কবি আর্নেস্ট ডাওসন (Ernest Dowson, 1867-1900) রচিত "Non sum Qualis erambonae subregno Cynarae" নামক কবিতায় উদ্দিষ্ট রানি Cynara-র উল্লেখ। বারাঙ্গনা বাহুবন্ধে অনুতাপক্লিষ্ট নায়ক বারবার বলে

'I have been faithful to thee, Cynara, in my fashion.''
সাক্কো-ভাঞ্জাত্তি (ভানৎসেত্তি)— (Nicola Sacco, 1891-1927; Bartolomeo Vanzetti 1888-1927) অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে (টাকার বিনিময়ে) চুরি ও হত্যার (কল্পিত) দায়ে অভিযুক্ত দুই ইতালীয় কমিউনিস্ট। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এঁদের বিরুদ্ধে মামলা ও মৃত্যুদণ্ডকে পৃথিবীর অনেক দেশই পক্ষপাতদুষ্ট (কমিউনিস্টবিরোধী) রাজনৈতিক বিচার বলে মনে করেছিলেন। এঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ আন্তর্জাতিক-সমালোচনা ও প্রতিবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
সাংপো— তিব্বতে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের নাম।
সাফো— সাদ্‌ফো (Sappho) প্রাচীন গ্রিসের (খ্রিস্টপূর্ব 600) মহিলা কবি, প্রেম-সংগীত রচয়িত্রী।
সাবলিমেশন— ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে যৌনতাভিত্তিক অবচেতন চিত্ত বা 'লিবিডো'র নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তির উত্তরণ বা ঊর্ধ্বায়ন।
সাম্পরায়— সম্পরায় (যুদ্ধ)। সমরসম্বন্ধীয় ; পারলৌকিক।
সারি জহাঁসে— কবি (১৮৭৭-১৯৩৮) ইকবাল রচিত ভারতের অন্যতম জাতীয়সংগীত "সারে জহাঁসে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা"।
সালোম— [হিব্রু অর্থ 'শান্তি'] ১· বাইবেলে বর্ণিত হেরোডিয়াস কন্যা— যার নৃত্যে সন্তুষ্ট হয়ে, জন দ্য ব্যাপটিস্টের শিরোচ্ছেদের প্রার্থনা হেরোদ মঞ্জুর করেন। ২· ওই কাহিনীর ভিত্তিতে Oscar Wilde রচিত ফরাসি ভাষায় নাটক (1894)। ৩· Richard Strauss নির্মিত ওই নামের ওপেরা (1905).
সিদো-কাহ্নু— গত শতাব্দীর সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই নায়ক।
সিম্ফনি— নানা বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্রমুখী সুরের সমন্বিত বাদন।
সিমুম— [Simoon] মরুভূমির তীব্র ও উষ্ণ বালুর ঝড়।
সিরদরিয়া— সোবিয়েত তুর্কিস্তানের উত্তরাংশের ১৩০০ মাইলের মতো দীর্ঘ নদীবিশেষ। [Syr D. arya] উজবেক-এর ফরগণা উপত্যকায় উদ্ভূত হয়। তাজিখ ও কাজাখ হয়ে আরল সাগরে পড়েছে।
সিরিঙ্গা— (Syringa) ১· অলিভজাতীয় গাছের শ্রেণী বিশেষ— যাদের লাল, বেগুনি, গোলাপি, সাদা— বিচিত্র রঙের সুগন্ধি, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল হয় ; লাইলাক। ২· সাদা বা ক্রিমরঙের সুগন্ধি ফুলবিশিষ্ট গুল্ম ; মক-অরেঞ্জ (Mock-orange)
সিরোক্কো— লিবিয়ার মরু-অঞ্চল থেকে যে উষ্ণ, দুরন্ত বায়ুপ্রবাহ ভূমধ্যসাগর পার হয়ে দক্ষিণ ইয়োরোপে প্রবাহিত হয়, কখনো বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে আসে— তারই নাম। বিস্তারিত অর্থে— যে-কোনো উষ্ণ বায়ুস্রোত যা নিম্নচাপ সৃষ্টি করে।
সীগফ্রিড—(Siegfried) বা সিগুর্ড ; জার্মান লোকগাথা 'নিবেনলুংগেনলিড'-এর নায়ক। ভাগনার এঁকে নিয়ে ওপেরা রচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য : ব্রুনহিল্ড।
সুমন— রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের হারিয়ে-যাওয়া কিশোর।
সুরঙ্গমা— রবীন্দ্রনাথে 'রাজা' ও 'অরূপরতন' নাটকের দাসী চরিত্র।
সুলুপ— [ইং Sloop -এর অপভ্রংশ] ১· চট্টগ্রামে নির্মিত একরকম শালের জাহাজ। ২· এক মাস্তুল বিশিষ্ট ক্ষুদ্র রণপোত [Sloop of War].
সুশ্রুত— প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-গ্রন্থকার অথবা সুশ্রুত-রচিত চিকিৎসাগ্রন্থ ; বেদবিশারদ ; যা উত্তমরূপে শোনা হয়েছে।
সুষুম্না— ১· তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত ঈড়া-পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যবর্তী নাড়ী (কাল্পনিক) : ২· সূর্যরশ্মি।
সেজান— (Paul Cezanne, 1839-1906) ইমপ্রেশনিস্ট ভাবধারার ফরাসি চিত্রকর। 1874-এ

প্রথম ইম্‌প্রেশনিস্ট-প্রদর্শনীতে চিত্র প্রদর্শন করেন। 'স্টিল-লাইফ' ও নিসর্গচিত্রে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন।

সোঽ কামমঞ্চ দ্বিতীয়ো মে আত্মা জায়েতিতি— [বৃহদারণ্যক উপনিষদে] "সেই (হিরণ্যগর্ভ মৃত্যু) কামনা করলেন, দ্বিতীয় শরীর জাত হোক।"

সোঽবিভেতস্মাৎ স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ— [বৃহদারণ্যক উপনিষদ] "তিনি ভয় পেলেন, তিনি দ্বিতীয় হতে চাইলেন (সঙ্গী কামনা করলেন)।"

সোৎপ্রাশপাশে—উপহাসের বন্ধনে।

সোনাটা— ইয়োরোপীয় সংগীতে পিয়ানো বা অন্য কোনো একক বাদ্যযন্ত্রের জন্য নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের সুরবিহার।

স্তালিনগ্রাদ— রুশদেশের শহর ; পরবর্তী নাম ভলগোগ্রাদ।

স্তোম—স্তব, স্তোত্র, যজ্ঞ।

স্যন্দন— ১. গমন, গতি, বেগ। ২. ক্ষরণ।

স্যান্ডো— বিশ্বখ্যাত ব্যায়ামবীর ও সুদেহী ব্যায়ামতাত্ত্বিক।

স্যার্সি— গ্রিক কির্কে [Circe] ; মোহিনী, নিষ্ঠুরা এবং রক্তলোভাতুরা দেবী।

হগ মার্কেট— কলকাতার 'নিউ মার্কেট'-এর পুরোনো নাম ; পুলিশ কমিশনার Hogg-এর নাম থেকে।

হবিষ্মতী— কামধেনু।

হম্‌ফ্রি হাউস— (Humphrey House) ইংরেজ কবি-সমালোচক এবং এককালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। কবি বিষ্ণু দে-র সুহৃদ।

হরলাজুরি— রিখিয়ার শ্মশান।

হাইনরিখ মান— (Heincrich Mann, 1871-1950) জার্মান ঔপন্যাসিক।

হাইফঙ— এশিয়ার ভিয়েৎনামের একটি সমুদ্রবন্দর।

হাবসি-মেঘ— আফ্রিকা মহাদেশের উষ্ণাঞ্চল আবিসিনিয়ার কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি (হাবশি)-দের মতো ঘনকৃষ্ণ মেঘ।

হাকিম লিন্‌সে— লিণ্ডসে এণ্ডারসন ; ইংরেজ প্রশাসক।

হামাম—উষ্ণজলের স্নানাগার ; গোসলখানা।

হায়াসিন্‌থ্ (Hyacinth)— লম্বা সরু পাতাওয়ালা লিলি-পরিবারের গাছ ; নীল বা নীলচে বেগ্‌নি রঙের ফুল দণ্ডের গায়ে গোছায় গোছায় ফোটে। এই ফুল—গ্রিক পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী— শোকের প্রতীক।

হালানি— পবিত্রতা।

হাশিশ— গাঁজা গাছ থেকে তৈরি মাদক বিশেষ।

হাসানাবাদ— নোয়াখালির দাঙ্গার পটভূমিকায়, সাম্প্রতিক সম্প্রীতির অসামান্য নিদর্শন সৃষ্টি করেছিল এই গ্রাম।

হিপোলিটস— গ্রিক নাট্যকার ইউরিপিদেসের এই নামের নাটকের নায়ক। অপমানিতা প্রেমের দেবী আফ্রোদিতে বা ভেনাসের ষড়যন্ত্রে এর বিপর্যয় ঘটে।

হিম লাসা— শীতল লাসা নগরী (=তিব্বতের রাজধানী)।

হিরনা— রিখিয়ার একটি টিলার নাম।

হিলিঅম/হিলিয়ম— বর্ণহীন, গন্ধহীন, হালকা, অদাহ্য, নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় পদার্থ। বেলুন ইত্যাদিতে ভরবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

হীরেনবাবু/ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়— বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ।

হেক্টর— গ্রিক মহাকাব্য হোমারের 'ইলিয়াড'-এর মহাবীর ; রাজা প্রিয়াম এবং রানি হেকুবার পুত্র— ট্রয়ের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার ; প্যারিসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গ্রিক বীর আখিল্লেস এঁকে যুদ্ধে নিহত করেন।

হেগেল— (George Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831) জার্মানি দার্শনিক ; ভাববাদী দর্শনের এক মুখ্য প্রবক্তা।

হেডিস— গ্রিক পুরাণের পাতাল ও নরক রাজ্য— যার রাজা প্লুটো।

হেরডেরা— যিশুখ্রিস্টের সময় প্যালেস্টাইন বা জুডিয়ার শাসক রাজবংশ। আন্তিপতর-এর পুত্র Herod the great (খ্রিস্টপূর্ব 37-4) জুডিয়ার রাজা হন এবং এর নামানুসারে বংশের সূচনা হয়। যিশুর জন্মের পূর্বে ছোট শিশুদের হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন এই প্রথম হেরড। অন্যান্য হেরড বংশীয় রাজাদের নাম— হেরড এগ্রিপ্পা, হেরড ফিলিপ, হেরড আন্টিপাস। আন্টিপাস (39 খ্রিস্টাব্দ) জন দি ব্যাপটিস্টকে হত্যা করেন। শাসকবংশ হিসেবে হেরডেরা স্বেচ্ছাচারী ও অযোগ্য ছিলেন এবং প্রধানত রোমের শক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। জুডিয়া প্যালেস্টাইন অঞ্চলে অরাজকতার জন্য এঁরাই দায়ী।

হেলেন— ১· হোমার রচিত 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের নায়িকা— যাকে ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস গ্রিস থেকে হরণ করে নিয়ে যান। ২· গ্রিক জাতির আদিপুরুষ যার নামে 'হেলেনিজ' নামকরণ হয়।

হেলেনিস্ট— গ্রিক জাতির অনুকরণকারী ; গ্রিক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষার অনুরাগী।

হোয়লডেরলিন— (Johnn Christian Friedrich Hölderlin, 1770-1843) জার্মানি কবি ; 'ডিয়োটিমা' নাম্নী (ছদ্মনাম) প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছিলেন। মাঝে মাঝে উন্মাদ হয়ে যেতেন। মৃত্যুর ছায়ায় যে মানবিক অভিজ্ঞতা— তা তাঁর কবিতায় তীব্র রূপ ধারণ করেছে।

হোরেশিও— শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের চরিত্র, হ্যামলেটের বন্ধু।

হ্যারিয়েট— ইংরেজ কবি শেলির (Percy Bysahe Shelley, 1792-1822) এককালের প্রণয়িণী।

হ্বাখনার (Wagner)— (Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883) জার্মানি সুরস্রষ্টা, অপেরা বা গীতিনাট্য রচয়িতা। তাঁর রচিত 'কথা'-অংশ মূলত জার্মানি সাহিত্য ও উপকথা থেকে গৃহীত। পরবর্তীকালের অপেরা নাটক ও সংগীতধারায় এই আদি রচয়িতার বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

Cinna the Poet— শেক্সপিয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের চরিত্র।

Vera Incessupatuitdea— প্রকৃত ঈশ্বরীর মতো তার চলার ভঙ্গি [The true goddess was revealed by her gait]; রোমান কবি ভার্জিল (খ্রিঃ পূঃ 70-19)-এর 'ইনিড' (Aeneid) থেকে ল্যাটিন ভাষার উদ্ধৃতি।

১৯৩৭ স্পেন : স্পেনে ফ্রাঙ্কো ও সহায়ক জার্মানি ফাসিস্ট বাহিনী কর্তৃক গৃহযুদ্ধ আরম্ভ ও গণতন্ত্র ধ্বংসের কাল।

২৯শে জুলাই— ১৯৪৬ সালের এই দিনে ভারতীয় ডাকবিভাগের কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি সর্বাঙ্গীণ ও সফল ধর্মঘট হয়।

২৯শে নভেম্বর— ১৯৫৫ সালের এই দিনটিতে সোবিয়েত রাষ্ট্রনায়ক খ্রুশ্চেভ ও বুলগানিন কলকাতার এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দেন।

২২শে জুন, ১৯৪১— নাৎসি বাহিনীর সোবিয়েত রাশিয়া আক্রমণের তারিখ।

৭ই নভেম্বর— সোবিয়েত রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের তারিখ [নূতন ক্যালেন্ডার অনুসারে]।

কাব্যপরিচয়

সংবাদ মূলত কাব্য। সাহিত্যপত্রগ্রন্থ, কলকাতা-৬। প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৭৬, জুলাই ১৯৬৯। পৃ [৮]+১০২+[২]। মূল্য চার টাকা।

উৎসর্গ ॥শামসুর রাহ্‌মান,/আবুবকর সিদ্দিক/—পূর্ববঙ্গের সহকর্মীদের উপহার।

প্রচ্ছদ ॥পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।

'সংবাদ মূলত কাব্য-তে তারিখ অনুসারে কবিতা ছাপা যে সর্বত্র হয়নি, সেটা নেহাতই অনবধানতাবশত।

শ্রীমান অরুণ সেন এবং সাহিত্যপত্রী তরুণ বন্ধুদের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।'—ভূমিকা

৮৯ কবিতার সঙ্কলন।

ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে। সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬। প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৭৭। পৃ [৮]+৯৫। মূল্য পাঁচ টাকা।

উৎসর্গ ॥শ্রীমান সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কে/শ্রীমান মণীন্দ্র রায়-কে।

প্রচ্ছদ ॥প্রাণকৃষ্ণ পাল।

৭৭ কবিতার সঙ্কলন।

'তবু জলে ফলে ভালো' কবিতাটি 'চতুর্দশপদী' নামে পরে 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' কাব্যগ্রন্থে যুক্ত হয়। কেবল প্রথম ও অষ্টম পংক্তিতে দুটি শব্দের পাঠান্তর আছে : 'শূন্যে হাহাকার' স্থানে 'তীক্ষ্ণ হাহাকার' ; 'নদীনালা সর্পাহত' স্থানে 'নদীনালা মৃতপ্রায় সর্পাহত'।

ঈশাবাস্য দিবানিশা। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৮১। পৃ [৮]+১১৮। মূল্য ছ' টাকা।

প্রচ্ছদ ॥গৌতম রায়।

৯৯ কবিতার সঙ্কলন।

এই গ্রন্থে বাংলাদেশ থেকে পূর্বে প্রকাশিত 'রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশে' কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতা—ভোর, এবং প্রেম ও বর্বর—বাদে বাকি ৬৪টি কবিতা যুক্ত হয়।

চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮২। পৃ ৭২। মূল্য পাঁচ টাকা।

উৎসর্গ ॥শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়-কে/শ্রীহীরেন মিত্র-কে।

প্রচ্ছদ ॥মনোজ বিশ্বাস।
৫৪ কবিতার সঙ্কলন।

উত্তরে থাকো মৌন। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। প্রথম সংস্করণ, জুন ১৯৭৭। পৃ ৫৮। মূল্য ছ টাকা।
দ্বিতীয় মুদ্রণ—সেপ্টেম্বর ১৯৮১।
প্রচ্ছদ ॥পূর্ণেন্দু পত্রী।
উৎসর্গ ॥শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক/শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৩ কবিতার সঙ্কলন।

আমার হৃদয়ে বাঁচো। নাভানা, কলকাতা-৭২। প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮, জুন ১৯৮১। পৃ ৫৫। মূল্য সাত টাকা।
প্রচ্ছদ ॥শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী।
উৎসর্গ ॥ডাক্তার কালীপদ মিত্র/শ্রদ্ধাস্পদেষু/শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ, শ্রীপীযূষকুমার বসু, শ্রীমাধব দে, শ্রীসুধীর দে, শ্রীকনকেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরজতেন্দ্রনাথ মিত্র, ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত/স্নেহাস্পদেষু।

'এই বইতে মুদ্রিত কবিতাগুলির প্রকাশকাল মোটামুটি ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ সাল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে পাণ্ডুলিপি (পূর্বে প্রকাশিত বইয়ের দু-একটি কবিতার পরিমার্জিত পাঠ সহ) তৈরি করেছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী প্রণতি দে। তারিখ অনুসারে কবিতাগুলো সাজানো সম্ভব হয়নি নেহাতই অনবধানতাবশত। বইয়ের নামকরণ করেছেন কবি-বন্ধু শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী বন্ধু শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী।
'নাভানা'র তরুণ পরিচালক শ্রীকুনালকুমার রায় বইটি প্রকাশে উদ্যোগী হয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করলেন। এঁদের সকলকেই আমার ধন্যবাদ জানাই।'—ভূমিকা

৩৩ কবিতার সঙ্কলন। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা যেমন 'নিজেই অবাক হয়', 'তাও কি হয়' 'ইতিহাসে ট্র্যাজিক উল্লাসে' কাব্যগ্রন্থে ; 'তোমার অশ্রুর প্রান্তে' চতুর্মুখ নামে, 'দেহকে সাধে মনে' 'সংবাদ মূলত কাব্য' কাব্যগ্রন্থে এবং 'যেমন সংগীত পায়' 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' কাব্যগ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য এই কবিতাগুলি "আমার হৃদেয় বাঁচো" কাব্যগ্রন্থের অংশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 'চতুর্দশপদী' কবিতাটি 'তবু জলে ফলে ভালো' নামে 'ইতিহাসে ট্র্যাজিক উল্লাসে' কাব্যগ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। 'চতুর্দশপদী' কবিতায় প্রথম লাইনে 'শূন্যে' স্থানে 'তীক্ষ্ণ' এবং অষ্টম লাইনে 'সর্পাহিত' স্থানে 'মৃতপ্রায় সর্পাহিত' শব্দ বসেছে।

রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশে। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১। প্রথম প্রকাশ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০। পৃ [৮]+৯২। মূল্য পাঁচ টাকা।
উৎসর্গ ॥বাংলাদেশের নবলব্ধ বন্ধুদের।
এই কবিতা সঙ্কলনের দুটি কবিতা—ভোর, এবং প্রেম ও বর্বর—অন্য কোনও কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কবিতাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডে সংযোজন অংশে মুদ্রিত হল।
বাকি ৬৪টি কবিতা 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' কাব্যগ্রন্থে পরে যুক্ত হয়।

কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

(প্রথম পঙ্‌ক্তি, কবিতার নাম, পৃষ্ঠা)